রতনমণি রিয়াং

শক্তিপদ রাজগুরু

কলিকাতা-৭০০০৯

প্রকাশক :

শ্রীসুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :

মে ১৯৬২

প্রচ্ছদ :

শ্রীআশিস মুখার্জী

মুদ্রক :

শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

সুজাতা (গোপা) খান কল্যাণীয়াসু

আমার কথা

বনপর্ব্বতঘেরা ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের একটি মহৎ আন্দোলনের নেতা ছিলেন রতনমণি। মুখ্যতঃ আদিবাসী রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে রতনমণি গুরু বলে নন্দিত। তিনিই তৎকালীন ত্রিপুরায় অরণ্যপর্বতে সাধারণ মানুষের নবজাগরণের ঋত্বিকদের অন্যতম।

এই উপন্যাসের মূল উপাদান সংগ্রহের জন্য প্রধানতঃ আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত মহাশয়ের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। তার বাড়িতেও হানা দিয়ে তার বহুমূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীকৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য মশায় আমাকে বহু দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে যেখানে এই আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেইসব জায়গাতে যাবারও ব্যবস্থা করেছিলেন। আর সঙ্গী ছিলেন ত্রিপুরার আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগের পদস্থ কর্মী শ্রীগুরুপদ সাউ, তার প্রীতি অকৃত্রিম।

এছাড়া আমি অশেষ কৃতজ্ঞ আগরতলার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে, তাঁরা তাঁদের পুরানো সংবাদপত্রের বহু ফাইল কপি দেখার সুযোগ দিয়েছেন, সেগুলো না পেলে এর অনেক উপাদান অজানা থেকে যেতো। ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগের কাছেও আমি ঋণী, তাঁরা তাদের বহু পত্রপত্রিকা—গোমতীর কয়েকটি সংখ্যায় রচনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের নিষ্ঠাবান কর্মী নরেশ্বর চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে বহু আদিবাসী বসতিতে গেছেন—তাদের জীবনযাত্রা সংস্কৃতির কিছু নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছেন।

আমার ত্রিপুরার সঙ্গীদের মধ্যে বিশেষ করে মনোতোষ বাবু, সমীরণ বাবুদের নামও উল্লেখ করতে চাই। আর বিশেষ করে মনে পড়ে ত্রিপুরা ষ্টেট লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ বিমল গুপ্ত মশায়কে—তাঁর পাঠাগারের বহু অমূল্য সংগ্রহ দিয়ে তার ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সাহায্য করেছেন। আর পল্টু দত্তকেও স্মরণ করি এই প্রসঙ্গে।

সব মিলিয়ে আমি আমার সাধ্যমত রতনমণিকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের বিন্যাস করেছি। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এর আখ্যান, হয়তো কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্রচিত্রণে, যদি কোথাও ত্রুটি থেকে যায় তার জন্য দায়ী আমার অক্ষমতা। সেখানে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

রতনমণি, রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, তবু রিয়াংদের জন্যই তার জীবন অবধি বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাই এই উপন্যাসের নামকরণে 'রতনমণি রিয়াং' এই নামটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

বিনীত

শক্তিপদ রাজগুরু

বেলা দুপুর হয়ে গেছে, মাঝ দুপুর। ঘনবনের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে কিছুটা আলোর আভা বনের গভীরে ভিজে ভিজে মাটির উপর ঠাঁই ঠাঁই লুটিয়ে পড়েছে, বাতাসে পাতাপচার ভাপ্‌সা গন্ধ ওঠে। রোদ বেশীক্ষণ থাকবে না। সূর্য একটু ঢলে পড়লেই আঁধার ঘনিয়ে আসবে।

খুশীকৃষ্ণ তার সঙ্গী কান্ত রায়ের দিকে চাইল।

বলিষ্ঠ পেটা গড়ন কান্ত রায়ের হাতে একটা দা, তার মাথার দিকটা চওড়া, ধারালো ঝকঝকে রিয়াংদের ভাষায় বলে ওরা 'টাক্কাল' এই ওদের অস্ত্র, ফসল ফলাবার যন্ত্র, বাঁচার আশ্বাস। বনের বেত লতার কিছুটা টাক্কাল দিয়ে সাফ করে চালপথে ওরা এগিয়ে চলেছে।

খুশীকৃষ্ণ আসছে অনেক দূর থেকে। এমনি বনে বসতিতে ঘুরে বেড়ানো তার নেশা। গুনগুন করে সুর ভাঁজে, কখনও কোমরের কসির সঙ্গে গোঁজা ত্রিপুরী বাঁশীতে সুর তোলে। বাঁশ ওদের বনে পাহাড়ে প্রচুর, তাই বাঁশের বাঁশিটা ওদের কাছে প্রাণের সুরের স্পর্শ আনে।

অন্য সঙ্গী হান্দাই মুখবুজে আসছিল, ও বলে ওঠে,

—খাওয়া দাওয়া করবা নাই? বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল।

খুশীকৃষ্ণ সুর থামিয়ে এদিক ওদিকে চাইছে। ওদের পথ শেষ হবার কথা অনেক আগেই। কিন্তু বনের মধ্যে পথ না চেনার ফলে বোধহয় একটু বেশী ঘুরেছে, তবু খুশীকৃষ্ণ একটা টিলার উপর থেকে ওদিকে চেয়ে খুশীভাবে বলে—আর এসে গেছি হান্দাই, ওইতো রামচীরা।

ঠাকুরের পায়ের ধুলো না নিয়ে জল নাইবা খেলাম।

ব্যাকুল হয়ে ওঠে খুশীকৃষ্ণ। তাই ওর চলার বেগও যেন বেড়ে যায়। অবশ্য খুশীকৃষ্ণের মনের অবস্থা অন্যরকম। ও যেন একটা ব্রত নিয়েই এই বনপর্বত পার হয়ে সুদূর ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি এলাকার গহন পর্বতে এসেছে, ওর সারা মনে একটা আশার আলো।

…ছেলেবেলা থেকেই খুশীকৃষ্ণ ধর্ম ভীরু, পাহাড়ী রিয়াং এর ঘরে ও জন্মেছে কি এক প্রতিভা নিয়ে। নিজেই গুনগুন করে গান বাঁধে গান গায়। আর দূর পাহাড় বন ঘেরা ডমরু তীর্থের গোমতী নদীর ধারে বসে থাকে। লোকে বলে পাগল।

কিন্তু খুশীকৃষ্ণ শুনেছে অন্য এক সুর। কান্ত রায় বলিষ্ঠ জোয়ান ও এসব বোঝে না। তবু জানে খুশীকৃষ্ণ খাঁটি নির্ভেজাল একটা মানুষ। তাই ওর সঙ্গে কোথায় তার মনের মিল আছে। ওদের সারা চাকলায় এবার অজন্মা, পাহাড়ে ঢল নেমে ছড়া (ছোট নদীগুলো) ভেসে গেছে। আর জুম চাষও ভালো হয়নি।

সকলেই বলে কু লেগেছে। অনেক পাপ জমেছে।

ওরা এতকালের বাসস্থান এই অমরপুর ডমরু-নোতুন বাজার এলাকা ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে জানে না। বিপদে পড়েছে সকলে।

তাই খুশীকৃষ্ণ বলে এক সাধু আছেন মহাশক্তিমান, তাকে যদি এখানে আনা যায়, তাঁর পুণ্যে সব 'কু' চলে যাবে।

ওরা এসেছে সেই মহাপুরুষের কাছে অভয়ের আশায়।

রতনমণি ছেলেবেলা থেকে তার বাবা নীলকমল নোয়াতিয়ার কাছেই এমনি এক পথের নির্দেশ পেয়েছিল। তার বাবা সংসারী হয়েও সাধু সন্তের মতই থাকতেন। তাই লোকে তাকে বলতো লোকমান সাধু। রতনমণি ছেলেবেলা থেকেই বহুবার চন্দ্রনাথ তীর্থে গেছে। সেই পর্বতশিখরে মহাদেব মন্দির তার পরিবেশ রতনমণির

মনে একটা স্বতন্ত্র জগৎ রচনা করেছে, তাই সে বের হয়ে পড়েছে দেশ দেশান্তরে। দীর্ঘ বারো বৎসর ধরে বাংলা তথা ভারতের বহুতীর্থ পরিক্রমা করে দেখেছে বিচিত্র এই ভারতবর্ষ আর তার মানুষকে। ভারতের প্রাণের গভীরে নিহিত এক দিব্যজ্যোতির্ময় রূপকে সে অনুভব করছে তার ধ্যানে, ধারণায়।

পর্বতমেখলা এই সবুজ অরণ্য ঘেরা ছোট্ট রামচীরাতে এসে তন্ময় হয়েছে কোন সাধক।

একতারার সুরে যেন ঘর ছাড়ার সর্বত্যাগী কোন সাধনার সুর ফুটে ওঠে,

ওঁ ছে ব্রহ্মা, ওঁ ছে বিষ্ণু।
ওঁ ছে মহেশ্বর, ওঁ ছে নর ঈশ্বর।

...হঠাৎ তিনজনকে ছোট ঘরের আঙিনায় এসে প্রণাম করতে দেখে, বন্দনা গান থামিয়ে চাইল রতনমণি।

মূলীবাঁশের বেড়ার তৈরী ছনদিয়ে ছাওয়া ঘর, সামনে মাটির দাওয়া, সুন্দরভাবে নিকানো। উঠোনে কতকগুলো গাঁদা গাছে সবসময়েই অজস্র ফুল ফুটে থাকে। পিছনে কলাগাছ, পেঁপেগাছে ফলের কাঁদি। ঘন বাঁশবনের শ্যামছায়া পড়েছে উঠোনে।

খুশীকৃষ্ণ তন্ময় হয়ে দেখছে রতনমণিকে। কান্ত রায় একটু কঠিন প্রকৃতির মানুষ। ও দেখছে মানুষটিকে অন্তদৃষ্টিতে।

তাদের রিয়াং সমাজের রায়কাঞ্চন এর প্রতিভূ হয়ে এসেছে। কান্ত রায় জানে তার দায়িত্বের কথা। সারা রিয়াং সমাজের মাথা এককথায় তাদের সমাজের মনোনীত রাজা দেবী সিং ও তাকে পাঠিয়েছেন মানুষটিকে যাচাই করার জন্যে যাকে তারা বিশ্বাস করতে পারবে। গুরু বলে মানতে পারবে। তাই সে দেখছে রতনমণিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, মাঝারি গড়নের মানুষটি, গলায় রুদ্রাক্ষের দানা।

ডাগর দুচোখে কোমল বিনম্র স্নিগ্ধ চাহনিতে ফুটে উঠেছে দূর

আকাশের গভীর গহীন প্রশান্তি, সর্বদাই ও যেন কি আনন্দে মিশে আছে। হঠাৎ চমকে ওঠে কান্ত রায় রতনমণির মুখে শান্ত হাসি দেখে।

ও বলে—কি দেখছো কান্ত রায়? ভরসা হচ্ছে না বুঝি?

সবই গুরুর ইচ্ছা। জয় গুরু। জয় গুরু।

চমকে ওঠে কান্ত রায়। লোকটা তার মনের দ্বিধা সংশয় সব কিছুরই খবর পেয়েছে এমন কি তার নামটাও জেনে ফেলেছে যদিও এখনও তার পরিচয় দেয়নি খুশীকৃষ্ণ।

খুশীকৃষ্ণ যেন এমনি একটু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তাই বলে ওঠে—সবই, যদি জানো ঠাকুর, তবে এই বিপদ থেকে বাঁচাও। ত্রিপুরার অমরপুর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এসব অঞ্চলের গরীব রিয়াংদের দিকে চেয়ে দেখো।

রতনমণি জবাব দিল না। একটু মৃদু হেসে বলে:

—কাল থেকে পথে পথে আসছো, এখন পাক করার ব্যবস্থা করি, তারপর খেয়ে দেয়ে সুস্থ হলে কথাবার্তা হবে। কি বলো হান্দাই?

হান্দাই অবশ্য এইটাই চেয়েছিল। তার নজর খাবারের দিকে, আর বৈকালে একটু পাচুই মদও তার দরকার। আপাততঃ তার খিদেও লেগেছে। তাই হান্দাইও সায় দেয়—ঠিক বলেছো বাবা ঠাকুর।

সামান্য আয়োজন। ভাত আর বাগানের লাউ দিয়ে তরকারী, একটু কাঁচকলা সেদ্ধ। তাই যেন খিদের সময় অমৃত বলে বোধ হয়। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে, আশ্রমে বেশ কিছু লোকজন এসেছে, নামগান শুরু হয়েছে শান্ত সন্ধ্যার পরিবেশে।

খুশীকৃষ্ণ তার এখানে আসার উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সেও ওই কীর্তনের সঙ্গে সামিল হয়েছে।

জগ্যান গুরু সে সব
মানিয়া মুমুছে
রতন গুরু যে অ
মানে খা আমানুং ন অ

কান্ত রায় আজ কি একটা আশ্বাস পেয়েছে। মনে হয় এই বিচিত্র অনুভূতি মনের অতলে কি শক্তি আনে। তার দৃঢ় বিশ্বাস এই মানুষটি হয়তো তাদের এই সর্বনাশের মাঝে দিতে পারে নোতুন প্রাণের আশ্বাস।

কান্ত রায়, ভাবছে সেই কথা। যে ভাবে হোক একে নিয়ে যেতে হবে অমরপুর পরগণার পর্বত রাজ্যে!

পাখীগুলো কলরব করে ওঠে। বাঁশবনের বুকে শব্দ ওঠে। এক সঙ্গে টিলাটার ঘন বনে হানা দিয়েছে হাজারো মানুষ। টাকালের কোপ পড়ছে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে, এতদিনের কুমারী অরণ্যে হানা দিয়েছে জুমিয়া রিয়াং-এর দল। কয়েকটা টিলার ঘন বন তাদের দায়ের মুখে কাটা পড়ছে। ওই বাঁশবন জারুল, শাল সব গাছই ওরা কেটে ফেলছে। বগাফা, লক্ষ্মীছড়া হাজাছড়ার বিস্তীর্ণ অরণ্যে পর্বতে এবার জুমিয়া রিয়াংরা হানা দিয়েছে।

তৈন্দুলের বলিষ্ঠ হাতের দা রোদের আলোয় ঝল্‌সে ওঠে। ঘন বনকে ওরা শেষ করে সেই কাটা গাছ-পালা বাঁশের স্তূপ সব ফেলে রাখছে পাহাড়ে।

ওগুলো শুখিয়ে গেলে তারপর ওই সব কাটা গাছ পালায় আগুন দেবে। একদিকে কাটছে অন্য দিকের টিলায় ওরা তখনো গাছপাতা গুলোয় আগুণ দিচ্ছে।

শান্ত বনতল ওদের কলরবে ভরে ওঠে।

তৈন্দুল হাঁক পাড়ে—হুঁসিয়ার।...

মাঝে মাঝে এদিকের বনে বাঘ হাতীর পালও আসে। বনে

কিসের শব্দ শুনে তৈন্দুল সাবধানী হাঁক পাড়ে, ওদিকে পরণের পাছড়াটা হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিয়েছে নয়ন্তী, নিটোল উর্দ্ধাঙ্গে রয়েছে রঙ্গীণ হাতের তাঁতে বোনা একটু কাঁচুলী। অনাবৃত দেহের ভাজে ভাজে ঘামের চিক্‌চিকে ভাব ফুটে ওঠে।

মেয়েটাও চমকে ওঠে—কি রে।

তৈন্দুল কথা বলে না, কান পেতে শুনছে বনে বনে কিসের শব্দ। বাতাসে ওদিকের টিলা থেকে কচি পাতা পোড়ানোর গন্ধ আর ধোঁয়া মিশেছে। আগুণে পুড়ে যাবে ওই রাশিকৃত পাতা গাছ, টিলার ঘনবন সাফ হয়ে যাবে, মাটিতে জমবে ছাইয়ের স্তূপ, তারপর একটা ছুটো বৃষ্টি হলে ওই ছাই মিশে যাবে মাটিতে সারের তেজে; এতদিনের অনাবাদী মাটি ফসল দেবে। জুম চাষের মরসুম আসছে।

...ওই মাটিতে তারা টাক্কাল দিয়ে গর্ত করে ধান, কুমড়ো, কাপাস, সরষে, বাজরা গম সব পুঁতে দেবে। আর বৃষ্টির জলে ওই উর্বর টিলাগুলি সবুজ হয়ে উঠবে। টিলার এদিক ওদিকে তারা টং ঘর বানিয়ে ফসল পাহারা দেবে।

...গত ছু'বছর ধরে অজন্মা চলেছে। অমরপুর বিলোনিয়া নোতুনবাজার ডমরু অবধি পাহাড়বনে যেন হাহাকারের শব্দ ওঠে। এবার ওদের সর্দার রায়কাঞ্চন দেবী সিং বলেছে।

—এবার রকম ভালো। বসুমতী এবার শীতলা হবে। দেবতার আশীর্বাদ পাবে, মা গোমতী ওদের কৃপা করবে।

...নয়ন্তী এসব ভাবে না। ও-হাল্‌কা খুশির সুরে বনের প্রজাপতির মত উড়ে যেতে চায়। ওর রূপবতী ফর্সা দেহখানাকে ঘিরে তাই এত অভাবের মধ্যেও সাজের বাহার। চোখে মনসাপাতার কাজল দিয়ে যেন কি মোহময়ী হয়ে উঠেছে সে।

তৈন্দুলকে তার ভালো লাগে। হাজাছড়া বস্তীর আশেপাশে এমন সৎ আর বলিষ্ঠ কাজের ছেলে দেখা যায় না। বাকী অনেককে দেখেছে নয়ন্তী, ওরা ছাং দিশী মদ গিলে দিনভোর হল্লা করে, আর

রাতের বেলায় মাতলামি লুচ্চামিই ওদের সার। মিতুল রিয়াংকে তাই সেদিন নয়ন্তী টাক্কাল নিয়ে তাড়া করেছিল। বেহুস মাতাল একটা শয়তান, অমরপুর শহরে দিনকতক ইস্কুল গিয়ে যেন আরও ইতর হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে সেদিন ছড়ার ধারে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু নয়ন্তীও কম যায় না। ওই জানোয়ারকে সমুত করে দিয়েছিল।

জানে নয়ন্তী মিতুল এখনও তার পিছনে লেগে আছে, তৈন্দুলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাকে সে ভালো চোখে দেখে না।

নয়ন্তীও চমকে উঠে ওই শব্দে, বনের দিক থেকে শব্দটা উঠছে। গাছপালা মাড়ানোর শব্দ, নীচের অন্যান্য রিয়াংরাও সাবধান হয়ে যাচ্ছে। ওরা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

হঠাৎ দেখা যায় হাতিটাকে। টিলার এই দিকেই আসছে। শুবিত রিয়াং বলে ওঠে—বুনো হাতি না ছে। উ কুন আসতিছে?

মনে লয় খগেন রায়।

...তৈন্দুল চুপ করে দেখছে। ওই লোকটাকে তারা দেখতে পারে না। বগাফা বসতির খগেন রায় রিয়াং হলেও সে এখন অন্য জাতের মানুষ। এদিকের বহু টিলা আর তার নীচেকার লুঙ্গা উর্বরা জমির মালিক সে, ওর লুঙ্গা জমিতে কখনও জলের অভাব হয় না। বিস্তীর্ণ সেই সব জমিতে ও খরচ করে টিউব ওয়েলের পাইপ বসিয়েছে উদয়পুর শহর থেকে মিস্ত্রী আনিয়ে। একবার পাইপ বসানোর পর আর জলের ভাবনা নেই।

জল আপনা হতেই চব্বিশ ঘণ্টা ধরে পড়তে থাকে। ফলে খগেন রায়ের ওই বিরাট এলাকায় কখনও ফসলের অভাব হয় না। ওর টিলাগুলোয় প্রচুর আনারস, সরেসজাতের সবরীকলা, কাঁটালের বাগান, লিচু বাগান। নীচের জমিতে ধান, গম, আখ সরষে, তামাক জন্মে রাশি রাশি।

তাই খগেন রায় উদয়পুরেও বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছে গোমতী নদীর ধারে, আর খগেন রায় এখন ধাপে ধাপে অনেক উপরে উঠেছে।

খাস আগরতলায় ত্রিপুরার মহামান্য রাজদরবারেও তার যাতায়াত আছে। হাতির পিঠে চড়ে সে যাতায়াত করে।

তৈন্দুল জানে লোকটাকে, ওর দলবলকেও। খগেন রায় ওকে দেখে বলে—

কি রে! কেমন আছিস তৈন্দুল? এখন তো তুই শুনছি এসব টিলায় জুম চাষ করাচ্ছিস! তা সদরে জানাবি না?

তৈন্দুল চাইল ওর দিকে।

হাতিতে চেপে খগেন রায় এদিকে ঘোরাফেরা করে, পরণে সফেদ পাঞ্জাবী, ধুতি, হাতে ঘড়ি বাঁধা বাবুদের মত। সঙ্গে হাওদায় বসে ছিল কালিপ্রসাদ রিয়াং। ও যেন এঠুলির মত লেগে থাকে খগেন রায়ের সঙ্গে আর পিছনে রয়েছে মৈতুল। মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধা, পরণে পুরানো একটা জামা। খগেন রায় বোধহয় দয়া করে ওকে দিয়েছে সেটা। সাইজে বড় আর ঢলঢলে।

নয়ন্তী ওই বিজাতীয় সাজে মৈতুলকে দেখে একগাদা থুতু জোর করে ফেললো ছনবনের উপর। খগেন রায়ও সেই শুনে তেজী মেয়েটার দিকে চেয়ে একটু অবাক হয়।

খগেন রায় দেখছে কালিপ্রসাদকে, কালিপ্রসাদের চোখের দৃষ্টি পড়েছে ওই তাজা ফুলের মত টসটসে মেয়েটার দিকে। খগেন রায় জানে কালিপ্রসাদ করিতকর্মা লোক, তার যোগ্য সঙ্গী।

আর মেয়েটাও তেমনি অপরূপ, ওর তেজদৃপ্ত ভঙ্গীটা ওকে আরও রূপবতী করে তুলেছে। খগেন রায় শুধায়।

—ও কে রে?

জবাবটা দেয় মৈতুল—আজ্ঞে কান্ত রায়ের মেয়ে। দক্ষিণ মহারাণী বসতির কান্ত রায়।

খগেন রায় দেখছে মেয়েটাকে, কান্ত রায়কে চেনে সে। লোকটা বেশ বেয়াড়া আর তাগদদার।

—কালিপ্রসাদ! এদের ব্যাপারটা বলো! দেরী হয়ে যাচ্ছে।

খগেন রায় ইচ্ছে করেই কালিপ্রসাদের ধ্যা

কালিপ্রসাদ একটু চমকে গিয়ে সাড়া দেয়—ও হ্যাঁ। বলছি।

…তৈন্দুলের আশপাশে এসে হাজির হয়েছে মাঝবয়সী গাঁও নেতা সর্পজয় রিয়াং, তুইছার বুহার প্রধান রামপ্রসাদও। ওরা বিভিন্ন বসতি থেকে এই টিলাগুলোয় জুম চাষ করবার কাজে নেমেছে।

কালিপ্রসাদ বলে—মহারাজার হাতি খেদা হচ্ছে গণ্ডাছড়ার পাহাড়ে। তোদের একশো জন মরদকে যেতে হবে। অবশ্য খোরাকী পাবি। আর খেদার কাজ ভাল হলে, আরও বেশী হাতি খেদায় পড়লে মোটা বকশিষও মিলবে।

তৈন্দুল চমকে ওঠে ওর কথায়। তার বাবাও গেছল গতবার শীত শেষে অমনি এক বুনো হাতির খেদায়। ওই খগেন রায়ই তার বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল খেতে দেবে আর দশটাকা বকশিষ দেবে বলে।

…সর্পজয় রিয়াংও ছিল সেই দলে। কঠিন বিপদের কাজ। বনের গভীরে দল বেঁধে থাকে বুনো হাতিগুলো, যেন ছোটখাটো কালো পাহাড় এক একটা। টিনের শব্দ, টিকারার আওয়াজ করে তাদের তাড়াতে হয় সেই বুনো হাতির পালকে, মশালের আগুণ জ্বলে, পটকার আওয়াজে বন পাহাড় কেঁপে ওঠে। আর সব ছাপিয়ে ওঠে ওই বিতাড়িত হাতিগুলোর ক্রুদ্ধ হুঙ্কার।

ওরাও টের পেয়ে গেছে বিপদের অস্তিত্ব, তাই কখনও সামনের বনে বিরাট কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী খেদার দিকে না গিয়ে হাতি-গুলো রুখে দাঁড়িয়ে ওই বন পিটিয়েদের ব্যূহ ভেদ করে জোর করে বের হয়ে আসতে চায়। বনের গভীরে ফিরে যাবে ওই ক্রুদ্ধ বুনো হাতির দল, তারাও মরীয়া হয়ে উঠেছে।

সর্পজয় রিয়াং দেখেছে সেই মত্ত হাতির দলের তাণ্ডব। তৈন্দুলের বাবাও ছিল সামনে। বুনো হাতি একটা এসে ওকেই শুড়ে জড়িয়ে

ধরে তুলে ফেলেছে—ওদিকে কে অন্য একটা হাতির পায়ের তলে পড়েছে। একবার মাত্র নিস্ফল আর্তনাদ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল সে, ওর রক্তাক্ত দেহটাকে দলে পিষে চট্‌কে চলেছে হাতির পাল। তৈন্দুলের বাবাকে শুঁড়ে জড়িয়ে উপরে তুলেছে, চীৎকার করছে লোকটা। কিন্তু সব আর্তনাদ তার স্তব্ধ হয়ে যায়, একটা গর্জন গাছের বিরাট কাণ্ডে তাকে বার কতক আছাড় মেরে প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটাকে ছিটকে ফেলে দিল বনের গভীরে।

নিমেষের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। সব বূহ্য তছনছ করে বুনো হাতির দল চলে গেছে বনের গভীরে। খেদার দিকে কোন হাতিই যায় নি।

দলের ম্যানেজার গর্জন করছে। খগেন রায়ও হুঙ্কার ছাড়ে। —কোন কামের না তোরা, শুধু খাইতে পারস্! একখান হাতিও খেদায় যাইল না। অকামার দল! এতগুলান টাকা জলে দিলাম।

ওদের মৃত্যুর কোন দামই নেই। ওদের লোকসানই বড় কথা। ওরা আর ফিরে আসেনি। তৈন্দুল মাকে নিয়ে গণ্ডাছড়ায় গিয়ে দেখেছিল সেই বীভৎস বিকৃত দেহটাকে। ওই খগেন রায়ই রাজা মহারাজাদের হাতি খেদার জন্য বেগার ধরে নিয়ে যায়, আর তাদের প্রাণের দাম খগেন রায়দের কাছে কানাকড়িও নয়।

খগেন রায় দেখছে ওদের। চুপ করে থাকতে দেখে খগেন রায় বলে—কি হ'ল রে? দক্ষিণ মহারানী থেকে ওরা আসবে, ডমরু থেকে আসবে, তোরাও যাবি—পরশু সকালে খোরাকির চাল দিয়ে যাবে। সোজা গণ্ডাছড়ায় চলে যাবি, আমি থাকবো।

সর্পজয় বলে ওঠে—যাবো নাই আমরা!

তৈন্দুল এতক্ষণ মনের সেই জ্বালাটা চেপেছিল এইবার সেটা ফেটে পড়ে।

কেন যাবো? মরতে? কামের জন্য জান দিতেও রাজী আছি খগেনবাবু, অকামের জন্য সাড়া দিতেও রাজী নই। আমরা যামু নাই।

সর্পজয় এর কথার খেই ধরে ওরা সকলেই এবার প্রতিবাদ করে ওঠে।

আর কখনও যাবো নাই। মাগনা নিয়ে যাবা? তুমি পাও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, আর আমাদের লোকজন এমনিই মরতে যায়। আর যাবো নাই।

কালিপ্রসাদ বলে—কি সব বলছিস? রায়মশায় নিজে এসেছেন তোদের কাছে। তাঁর মানখাতিরেও যাবি না?

সর্পজয় চাইল ওর দিকে। মিতুলও ফোঁড়ন কাটে।

—রায়মশায়ের হুকুম রিয়াংরা মানবে নাই? কি বলছো হে?

রিয়াং সমাজের প্রতিষ্ঠা বহু কালের। পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অবধি ছিল তাদের রাজ্য, সেই রাজ্যে রাজা একজন থাকতেন কিন্তু সেই রাজা নির্বাচন হোত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সমাজের সকলের মত নিয়ে তার নির্বাচন হোত। সেই রাজত্ব চলে গেছে, আজ তারা বনে পাহাড়ে বাস করে, অনেক কিছু হারিয়ে গেছে তাদের। তবু আজও তারা মানে তাদের সমাজের রায়কাঞ্চনকে। রাজার মতই মান্য করে।

খগেন রিয়াং ক্রমশঃ ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। ও জানে সমাজের কর্তৃত্ব হাতে পেতে গেলে তাকে ওই রায়কাঞ্চন হতেই হবে, আর পয়সা কড়ি সে অনেকই পেয়েছে আরও অর্থ প্রতিষ্ঠা তাকে পেতে হবে। তার দলের কিছু অনুগৃহীত ব্যক্তি তাকে এরমধ্যে রায় পদবীতে ভূষিত করেছে। খগেন রিয়াং জানে তাদের সমাজের রায়কাঞ্চন দেবী সিং এখন বৃদ্ধ স্থবির প্রায়। তাকে এইবার চেষ্টা করতে হবে রায়কাঞ্চন হতে, তাই দেবীসিং এর ভালোমানুষী আর ঠিক নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সে এবার নিজেকে ওই আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে এগিয়ে চলেছে তারই এক ধাপ উঠেছে, তাই নিজেই রায় উপাধি নিয়ে বসে আছে সে।

মিতুলের মত একটা বাজে ছেলে, কালিপ্রসাদের মত পা চাটা

খোসামুদের দলের কাছে আজ খগেন রিয়াংকে রায় পদবীতে ভূষিত করতে দেখে সর্পজয় চটে উঠে বলে,

রায়কাঞ্চন তো দেবী সিং, কই খগেনবাবু আবার রায়কাঞ্চন হইল কোনদিন ?

খগেন রায় হাতীর পিঠে বসেছিল ওর গালে কে যেন আচমকা একটা চড় মেরেছে, ওই কথাগুলো খগেন রায় এর সারা মনে ঝড় ওঠে। জানে খগেন রায় এরা তার উপর চটা, আর তাদের পিছনেও অনেক বসতির রিয়াং আছে, যারা খগেন রায়কে আমল দিতে চায় না। ওর প্রতিষ্ঠার পথে বাধা দেবে সবরকমেই।

খগেন রায় ধূর্ত কৌশলী লোক। রাগ হলেও সেটা প্রকাশ করে না সহজে। আর সে বুঝে নিয়েছে এরা হাতি খেদাতে বেগার দিতে যাবে না। খগেন রায় জানে এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হয় কিভাবে। তবু মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বলে,

—আরে সর্পজয়, রায় ওরা ভালোবেসে বলে। আমি কি তার যুগ্যি বাপু। তা যাক্ গে তোমাদের ভালোর জন্যই বলছিলাম কথাটা। খগেন রায় একটা মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ে। সহজ ভাবেই বলে সে,—

মানে এতগুলো টিলা নিয়ে নতুন জুম চাষ করছো রাজদরবারে খবরটা ঠিক কাকপক্ষীতেও পৌঁছে দেবে, তখন ট্যাক্স দাও, চৌকিদারী দাও, এসব বখেয়া উঠবে। তাই ওসব যাতে না ওঠে—তাই বলেছিলাম কথাটা। ছাখো, ভেবে দেখে জানিও অমরপুরে নাহয় আমার উদয়পুরের বাড়িতেই। এত তাড়ার কিছু নাই। চলো হে কালিপ্রসাদ।

কালিপ্রসাদের চোখ তখন নয়ন্তীর আদুড় গায়ের দিকে। পরনে রঙ্গীন কাঁচুলির আশপাশে ওর উন্মুক্ত নিটোল দেহটার রেখায় কিসের আমন্ত্রণ।

কালিপ্রসাদ ওর জামার পকেট থেকে সস্তা সিগারেটের প্যাকেটটা নয়ন্তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—নে।

এমন সময় হঠাৎ খগেন রায় এর ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়লো, হাতির হাওদার পিছনের রসি ধরে গিয়ে ঝুলে উঠছে উপরে, আর মিতুলও হুজুরের কাছছাড়া হতে চায় না—তাই সেও অন্যদিকের রসি ধরে ঝুলছে। সেই ঝুলন্ত অবস্থাতেই হাতিটা ওদের নিয়ে টিলা থেকে নেমে চলেছে।

গজরায় তৈন্দুল—খচ্চরটা কোথাকার।

নয়ন্তীর হাতে সেই সিগ্রেটের বাক্স, হঠাৎ খেয়াল হতে নয়ন্তী ওটা হাতির হাওদার দিকে ছুড়ে দিল, সেটা ছিটকে পড়েছে খগেন রায় এর ঘাড়েই।

রায়মশায় ওই মেয়েটার তেজ আর ওই আধ নেংটো-জুমিয়া মানুষগুলোর দুঃসাহস দেখে মনে মনে জ্বলে উঠেছে। এর জবাব তাকে দিতেই হবে। আর এদের এই প্রতিবাদের সাহসটা বাড়তে দিতে চায় না খগেন রিয়াং।

ওরা চলেছে বনপর্বতের পথ ধরে উদয়পুরের দিকে।

সর্পজয় চুপ করে কি ভাবছে। খগেন রায়কে এসব কথা সে বলতে চায় নি, কিন্তু লোকটা যেন তাকে বাধ্য করেছিল এসব কথা বলতে।

সর্পজয় সেবার মালপত্র কিনতে উদয়পুরে গিয়েছিল, সেখানের স্কুলের মাষ্টার ভ্রমর বাবুই বলেছিলেন ওকে এড়িয়ে চলতে। কারণ খগেন বাবু নাকি সাংঘাতিক লোক।

...হঠাৎ ওদিকের টিলার দিকে গাছ কাটার শব্দে তার চমক ভাঙ্গে, রিয়াং লোকজনেরা অবশ্য ব্যাপারটার এত গুরুত্ব দেয় নি। ওরা আবার কাজে মন দিয়েছে। সময় বেশী নেই, ওরা এর মধ্যে টিলার সব বন কেটে ফেলবে।

একটা বিরাট গর্জন গাছ সশব্দে আছড়ে পড়ল ওদের টাক্কালের সমবেত আঘাতে, গাছটা যেন কি আর্তনাদ করে পড়েছে।...সর্পজয় চমকে ওঠে।

তৈন্দুল শুধায়—কি হ'ল গো কাকা ?

সর্পজয়ের খেয়াল হয় কি সব আজে বাজে কথা ভাবছিল সে। সর্পজয় বলে—কই কিছুই না। হাত চালা তোরা—এখনও অনেক কাটাই বাকী রইছে।

ধারালো দায়ের কোপ পড়ছে কুমারী অরণ্যের বুকে।

…অন্ধকারে লালাভ আগুনের আভা ওঠে, পাহাড়ী টিলাগুলোর বুকে ওরা আগুণ লাগিয়ে দিয়েছে। শুক্‌নো পাতা বাঁশবন, বেতবন, উলু, শালবন সবকিছু পুড়ে পুড়ে ছাই আর আংরা হয়ে যাচ্ছে।

বাঁশগুলোর গিট ফাটছে সশব্দে, পুঞ্জীভূত আগুণের ফিন্‌কি ছিট্‌কে পড়ে ওই বিস্ফোরণে। ওই রাশিকৃত ছাই জমবে টিলার বুকে—এবার দরকার ছ'একপশলা বৃষ্টির। বৃষ্টির জলে পাহাড়ি বেলে-মাটির সঙ্গে ছাই মিশে সার হবে।

ওরা জুম চাষের আগে তাই জমি তৈরী করছে।

…রাত নামে দূর পাহাড়ের বুকে, মাঝে মাঝে দেখা যায় লাল আগুণের মালা পরানো পাহাড়, পাহাড়ী জুমিয়া রিয়াংরা এখানে ওখানে জমি তৈরী করছে, তাদের বাঁচার ওই একমাত্র উপায়, সামান্য কিছু চাষ-আবাদ করতে হয় এই ভাবেই।

ওদিকে উঁচু বাঁশ-শাল খুটির উপর টং ঘর তৈরী হয়েছে, নয়ন্তী তখনও চুপ করে বসে আছে। গাঁও বসতিতে আজ ফেরা হয় নি। জানে না বাবা এখনও এসেছে কিনা।

বাতাসে ধোঁয়ার ভারি দমবন্ধকরা গুমোট ভাব। তৈন্দুলদের টংগুলো ওদিকে। জুমে এসে মেয়েরা আলাদা টংঘরের আশ্রয়ে থাকে। পৈরী, ছনিয়া আর কয়েকজন মেয়ে দিনভোর পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমুচ্ছে, তাছাড়া ওরা ছ্যাংও এক আধটু খেয়েছে। নয়ন্তীর ঘুম আসেনি।

আবছা চাঁদের ঘসা ঘসা আলোর আভায় বন পাহাড়কে কি এক রহস্যময় আবেশে ভরে তুলেছে। নয়ন্তী নীচে নেমে এল।

একটা ছড়া বের হয়ে এসেছে বনের গভীর থেকে, কোন ঝরণার অফুরান জলপ্রবাহ বয়ে চলেছে তাতে। চাঁদের আলোয় ওর বুকে ঝকমকানি ভাব জাগে রূপালী আভায়।

...এমনি রাতে নয়ন্তীর ঘুম আসে না। কার পায়ের শব্দে চাইল সে।

...তুই। অবাক হয়েছে নয়ন্তী তৈন্দুলকে দেখে।

তৈন্দুল বলে—দেখলাম তোকে টংঘর থেকে নামতে, জায়গাটা ভাল লাগছে না, ভালুক একটা দেখেছিলাম, তাই ভাবলাম তোকে বলে দিই।

হাসল নয়ন্তী—এতো ভাবনা তোর আমার জন্যে ?

তৈন্দুল জবাব দিলনা। দেখছে সে নয়ন্তীকে। ওর যৌবন জাগা দেহটা যেন বর্ষার গোমতীর মত উপছে উঠেছে। তৈন্দুল হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু নয়ন্তীর কাছে এলে ওর সব কথা কেমন গুলিয়ে যায়।

নয়ন্তী বলে—খগেন বাবু আজ রেগে গেছে খুব।

তৈন্দুল জানায়—বয়ে গেছে। তাই বলে ওই বাচ্ছা কুকুরটাকে রায়কাঞ্চন বলে মানতে হবে ? ওই জানোয়ারগুলো যা চাইবে তাই হবে ?

নয়ন্তী ভাবছে কথাগুলো। সেই কালীপ্রসাদের চাহনিটা এখনও কেমন বিশ্রী লাগে। ভয় হয় নয়ন্তীর।

তাই বলে সে—ওদের তাগদ অনেক বেশী।

...তৈন্দুলের পুরুষত্বে লাগে ওই কথাটা। তাই সে চাপা স্বরে গর্জে ওঠে।

—ভারি মরদ ওরা। দেখা আছে। তোর যতো বাজে. ভয় নয়ন্তী

নয়ন্তী ওর দিকে চাইল। তৈন্দুলের বলিষ্ঠ হাতটা ওর হাতে, ওই কবোষ্ণ ছোঁয়ায় মেয়েটা যেন কি আশ্বাস পেতে চায়।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে কয়েকটা মশালের আলো দেখা যায় দূর সীমান্তে। তৈন্দুল ও দেখেছে ওই আলো ক'টা। ওগুলো নড়ছে। কখনও উপরে কখনও নীচে, কখন বায়ে কখনও ডাইনে। তৈন্দুল চাপা স্বরে বলে—নয়ন্তী। নিশানা বটে নাকি রে?

নয়ন্তীও দেখেছে আলোগুলো।

ওদের মাঝে দূর টিলা পর্বত থেকে অন্যত্র জরুরী সংবাদ পাঠাবার জন্য এমনি মশালের সংকেত ব্যবহার করা হয়। ...ওই বিভিন্ন রীতিতে আলো নাড়া চাড়া করে ওরা জরুরী খবর জানাতে পারে।

—কাকা।

তৈন্দুলের ডাকে টংঘর থেকে সর্পজয়ও চাইল।

ওই আলোর ভাষা সে জানে। ওরাও সচকিত হয়ে ওঠে।

টিলার এদিক ওদিকে টংঘর থেকে কে মশাল জ্বেলে নাড়ছে দূরের ওই সংকেতকারীর উদ্দেশ্যে। আর টিলার নীচে আবছা আধারে ক'জন জোয়ান টাক্কাল বল্লম হাতে তৈরী হয়েছে রাতের অন্ধকারে ওই দুর্গম বন পার হয়ে ওদিকে যাবার জন্য।

ওদের যেতে হবে, জরুরী দরকার।

...ক'জন বের হয়ে গেল। নয়ন্তী অবাক হয়।

তুইও চলছিস?

তৈন্দুল চাইল নয়ন্তীর দিকে। বলিষ্ঠ জোয়ান ছেলেটা বলে —আসছি নয়ন্তী। এত বড় ব্যাপারটা নিজে দেখে আসবো। কাল সকালবেলাতেই ফিরবো সবাই ওদের নিয়ে।

অন্ধকারে ওরা বের হয়ে গেল। জরুরী সংকেত এসেছে। বিশেষ খবর আছে—ডাক আছে। তাই বনপাহাড়ের বিভিন্ন টিলা বসতি থেকে অনেকেই চলেছে একছড়ি মৌজার তাওকম বসতির দিকে।

রাতের অন্ধকারে শান্ত বনপাহাড় গুরু গুরু শব্দে কেঁপে ওঠে। ...কি যেন একটা শব্দ আকাশবাতাস কাঁপিয়ে চলেছে। ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধু বন আর পাহাড়। হিমালয়ের শেষপ্রান্ত এখানে নেমে এসেছে, কাছাড় এর সীমানা হয়ে হিমালয়ের শেষ বংশধররা যেন সমতলের দিকে এসে হারিয়ে গেছে।

...দেওতামুড়া, বড়মুড়া, আঠারোমুড়া লংতরাই জম্পুই নানা নামে পাহাড়গুলো ছড়ানো, ওদের কিছুটা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়িয়ে বার্মার দিকে চলে গেছে।

ওই গহন অরণ্য পর্বতসীমা পার হয়ে হাওয়ায় ভেসে আসে একটা খবর। শক্তি রায় রিয়াং লংতরাই এর পর্বত রাজ্যের একটি বিচিত্র মানুষ। তরতাজা একটা জোয়ান—ওই এলাকার কেন সীমান্ত পার হয়েও যাতায়াত ওদের।

এতকাল পাহাড়ে তামাক, কলা, অনেক ফসল করেছে, পাহাড়ের ওদিকের সমতলে কুমিল্লা ওদিকে মৈমনসিং-এর হাটে গিয়ে ওই সব মালপত্র, নাহয় বনের শিকার করা হাতির দাঁত বিক্রী করে আসতো।

হঠাৎ তাদের এই কাজে এসে বাধা দিয়েছে অমরপুর—উদয়পুরের তীর্থহরি চৌধুরী, রাজারাম চৌধুরী।

খগেন রায় এর বন্ধু লোক এই তীর্থহরি চৌধুরী। তেলিয়ামুড়া থেকে দারোগাসাহেব নিজে এসেছেন তারই তদন্ত করতে।

...লংতরাই এর পাহাড় তলিতে ওদের ডাকা হয়েছে। শক্তি রায় এ অঞ্চলের গ্রাম প্রধান, দোষটা যেন তারই বেশী।

রাতের অন্ধকারে এখানে ওখানে কয়েকটা মশাল জ্বলছে। সমবেত বুভুক্ষু রিয়াংদের চোখেমুখে অসহায় ত্রস্তভাব ফুটে উঠেছে।

রাজারাম বলে—তোরা আগরতলার রাজদরবারকে ফাঁকি দিয়ে এ রাজ্যের সব জিনিষপত্র পাচার করছিস ভিন দেশে। তার জন্য দরবারে কোন ট্যাক্স পয়সা তোরা দিস না।

একজন বুড়ো রিয়াং কাতর স্বরে কি বলার চেষ্টা করতে

দারোগাবাবু ধমকে ওঠে—থাম তুই! এবার সবকটাকে ধরে উদয়পুরে চালান দোব, আলং ঘরে ঢুকিয়ে রাখবে তবে বুঝবি মজা।

শক্তি রায় এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল ওদের কথাগুলো। ও বলে ওঠে,

আলং ঘরে ঢুকতে গেলে তোমাদেরও আগে ঢুকতে হবে চৌধুরী। তোমার লোকজনও মালপত্র অনেক বেশী নিয়ে যায় দেশের বাইরের হাটে। তার মুনাফা লোটো তুমি আর ওই খগেন রিয়াং।

দারোগাবাবু জানে ওই গোঁয়ার ছেলেটাকে। ওর দুঃসাহসী প্রকৃতিকে সে চেনে। সেবার রাজারামের একজন লোককে কি কথা বলার জন্য মাথা ফাটিয়ে দিয়ে থানায় এসেছিল।

দারোগাবাবু জানে খগেনবাবু, রাজারাম, তীর্থহরির দলকে তার খুশী রাখতেই হবে। তাই শক্তি রিয়াং এর কথায় শাসায়—একবার ফাটকে থেকে শিক্ষা হয়নি, আবার ফাটকে পুরবো তোকে।

শক্তি রিয়াং গর্জে ওঠে, তাতে তোমাদের সুবিধা হবে নয়? মালপত্র লুটে নিয়ে নিজেরাই সব চালান করবে, আর তিনগুণ টাকা লুটবে?

রাজারাম, তীর্থহরি চৌধুরী দুজনের মধ্যে চাহনির বিনিময় হয়, ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। খগেন রায়ও তাদের এমনি মতলবই দিয়েছে। আর ওই গোয়ার ছেলেটাকে সেই কথা বলতে দেখে ওরাও অবাক হয়েছে।

অবশ্য দারোগাবাবু অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সেই-ই ব্যাপারটা অন্যদিকে গড়াতে দেখে বলে,

সরকার এসব কথা শুনবেন না। তোমাদের উপর হুকুম হয়েছে সব রিয়াংকে ঘর পিছু ন টাকা করে চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে হবে।

চমকে ওঠে সমবেত জনতা।

—ন'টাকা করে ঘরপিছু ট্যাক্সো দিতে হবে?

শক্তি রায় দেখেছে এদের অনেক দাপট, ক্রমশঃ তাদের কোনঠাসা করে এনেছে ওই চৌধুরীর দল। তার এতকালের লুঙ্গা জমিটা ওই তীর্থহরি দখল করে নিল। সব রিয়াংকেই তারা যেন এবার উৎখাত

করতে চায়। শক্তি রায় বলে ওঠে—কতো টাকা দিব আমরা? কুথায় পাবো?

তীর্থহরি গম্ভীরভাবে জানায়—সরকারের হুকুম! যদি দরবার করার থাকে রাজধানী আগরতলায় যা!

পরক্ষণেই তীর্থহরি এবার দারোগাবাবুকে বলে

—চলুন দারোগাবাবু, ওদের অন্য হাটেও কথাটা জানিয়ে দিতে হবে। তারপর আদায় না দেয়—তখন দেখা যাবে।

ওরা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শক্তি রায় গর্জে ওঠে—চুপ করে রইলে যে মুকুন্দ?

মুকুন্দ রিয়াং একটু ঠাণ্ডা মাথার লোক। ও জানে এখানে চীৎকার করলেই প্রতিবাদ করা সফল হবে না। এর জন্য অন্য পথ নিতে হবে। তাই মুকুন্দ বলে।

—এ হুকুম যেখান থেকে এসেছে সেখানেই যাবো। এখানে এর কোন প্রতিকার হবে নাই।

শক্তি রায় গর্জে ওঠে, ওর তাজা তরুণ রক্তে মাতন লেগেছে। ও বলে,—ওসব আমি বুঝি না, আমি জানি ওই রাজারাম, তীর্থহরি-দের জবাব দিতে গেলে এই টাকাল দিয়েই দিতে হবে। সদরে যেতে হয় তোমরা যাও। আমি ওতে নাই।

বলিষ্ঠ ছেলেটা যেন আগুণের ফুলকির মত জ্বলে উঠতে চায় প্রতিবাদের কাঠিন্যে। ওর সবকিছু হারিয়ে গেছে! টিলার নীচে লুঙ্গা জমিতে ওর সোনা ফলতো। কিন্তু সেই সব জমি নাকি মিথ্যা অনাদায়ী করে অমরপুর থেকে হুকুম এনে তীর্থহরি চৌধুরি দখল করে বসেছে। আজ শক্তি রায়ের কোন ঠাঁই নেই। এর ওর জুমে কাজ করে মাত্র।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বনের পথে ফিরছে শক্তি রা..। পাকদণ্ডী থেকে ওদের বস্তির দিকে চেয়ে অবাক হয়। বাঁশবন ঘিরে আগুণ জ্বলছে। ওই আগুণের আভায় তাদের টিলার উপরই কিছু

লোকজনকে দেখা যায় কালো ছায়ার মত। চমকে ওঠে শক্তি রায়, তারই বাড়িতে আগুণ জ্বলছে।

দৌড়তে থাকে সে বাড়ির দিকে।

কয়েকজন লোক জমে গেছে, ওদেরই একজন বলে—হঠাৎ আগুণ জ্বলে উঠতে দেখে এলাম। কিন্তু কিছু করা গেল না হে।

...শক্তি রায়ের বুড়ি মা কাঁদছে আর ছেলেকেই শাসাচ্ছে। —উদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাবি তুই? তোর জমি জারাত সব নিয়েছে, এবার ঘরটুকু ছিল তাও পুড়িয়ে ছাই করে দিল, এবার তোর জানটাই ওরা নেবে। মরবি তবু থামবি না তুই?

শক্তি রায় চুপ করে চেয়ে দেখছে তার পোড়া ঘরখানার দিকে। বাঁশের খুঁটি জাফরি মুলিবাঁশের বেড়ার স্নুন্দর নিকোনো ছোট একটি ঘর ওদের লালসার আগুণে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ওই আগুণের গনগনে আংরার তাপ তার সারা মনে। জানে শক্তি রিয়াং এই সর্বনাশা আগুণ কারা ধরিয়েছে। এক নজর দেখেছিল সে চৌধুরীর সহচরটিকে ওই বনের মধ্যে। লোকটা ওকে দেখে ভয়ে বেত বনের আড়ালে সরে গেছল, তখন ঠিক বোঝেনি শক্তি রায়, না হলে রাজারাম চৌধুরী আর তার সহচর দুজনকেই ধরে এনে ওই আগুণে পুড়িয়ে মারতো।

অসহ্য রাগে শক্তি রিয়াং এর বলিষ্ঠ দেহটা যেন ফুলে ওঠে, তাই মায়ের কথায় বলে—চুপ দে মা। ঘর গেছে যাক্—অনেক ঘরই এবার যাবে। তখন ওরা বুঝবে ঘর পোড়ানোর দুঃখ কি! এর শোধ আমি নোবই।

শুধু শক্তি রায় নয়, বহু রিয়াং এর চোখের চাহনিতে ফুটে উঠছে এমনি প্রতিবাদের জ্বালা।

তাই অমরপুর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এলাকার বহু রিয়াং আজ এসেছে দল বেঁধে তাদের রায় কাঞ্চন দেবী সিং এর কাছে। দেবী

সিং প্রবীন গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। বয়স তার প্রায় ষাটের কোঠায়, শরীরটা পাহাড় বনের ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের ফলে ভেঙ্গে পড়েছে। দেবী সিং এর দেহ মনের জোরও কমে গেছে।

এককালে রিয়াংদের নিজেদের এলাকা ছিল এ অঞ্চলে তখন থেকেই ওরা স্বাধীনভাবে নিজেদের ব্যাপার পরিচালনা করতো। আর রায়কাঞ্চন ছিল তাদের প্রধান নেতা। সামাজিক ধর্মীয় সব ব্যাপারে তার নির্দেশই ছিল সবচেয়ে বড়।

এখন রিয়াং এর এলাকা চলে গেছে ত্রিপুরার মহারাজার অধীনে, তাই রায়কাঞ্চনকেও মনোনীত করা হয় মহারাজার অনুমতি নিয়ে। আর এখনও রিয়াংদের মধ্যে নিয়ম রয়েছে একজন রায়কাঞ্চন বেঁচে থাকতে অন্য রায়কাঞ্চন মনোনীত করা যাবে না। সেই সুবাদে দেবীসিংহ রায়কাঞ্চন রয়ে গেছে।

কিন্তু দেবীসিং দেখছে হঠাৎ যুগটা কেমন বদলে গেছে। দুর্গম পাহাড় অরণ্যের সেই শান্ত সহজ জীবনযাত্রায় এসেছে একটা কঠিন আঘাত। দেশজোড়া এক সর্বনাশের সংকেত এসেছে। তারই লক্ষণ যেন আকাশের ওই গুরু গুরু শব্দটা ফুটে উঠেছে। দিনের বেলায় দেখা যায়, তাদের বনপাহাড়ের মাথায় পাক দিচ্ছে রোদের আভায় ঝকঝকে উড়োজাহাজগুলো।

...ওদের বুকে নাকি বোমা আছে। একটা বোমার আঘাতে এমন এক একটা টিলা উড়ে যেতে পারে। দেবীসিংও শুনেছে উদয়পুরের কাছারিতে, বিরাট যুদ্ধ বেধেছে ইংরেজ আর জাপানীদের মধ্যে। জাপানীরা বার্মার এদিকে এসে গেছে, মনিপুরে নাকি ঢুকে পড়বে এইবার। ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে তারা।

...তারই জের এসেছে এখানের বাজারেও। কাপড় এর দাম বেড়েছে তিনগুণ, শীতে কাঁপছে তারা—একটা তুলোর কম্বল কেনার সামর্থ্য নেই। অনেক দাম। যুদ্ধের ভয়ে যেন অনেকে চুপ করে গেছে সহরে।

…দেবীসিং জানে না এই সর্বনাশের হাত থেকে কি করে বাঁচবে তারা। আজ তারা নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ হয়।

তাই যেন এমনি একটা অবলম্বন খুঁজছিল সে।

শুনেছে তারা রতনমণির কথা। বেশ কয়েক বৎসর আগে দেখেছিল দেবীসিং রতনমণিকে, খুশীকৃষ্ণের সঙ্গে তখন সবে তাওকম্ বসতিতে এসে একটা ছোট আশ্রম গড়েছে। সহজ সরল সাদাসিধে একটি লোক। মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে।

ক্রমশঃ দেখছে সেই মানুষটিকে বিভিন্ন হাটে-বাজারে যায়। রিয়াংদের সঙ্গে মেশে, তাদের বসতিতে যায় কোন অসুখের খবর পেলে, নিজে থেকে ওষুধপত্র দেয়।

আর সন্ধ্যার পর যেখানে থাকে সেখানেই কিছু ভক্ত সহচর নিয়ে নাম গান সুরু করে।

ওই জিনিষটা তাদের কাছে নোতুন। এতকাল এই অসহায় মানুষগুলো জানতো না যে মানুষের পরিচয়ে তারাও বাঁচতে পারে। শুধুমাত্র কষ্টেসৃষ্টে খেটেখুটে একবেলা ভাত-সুটকি খেতে পাওয়া আর ছ্যাং খেয়ে বেহুস হয়ে পড়ে পড়ে জীবন কাটানো ছাড়া আর কিছুই জানতো না তারা। এখন তারা যেন নোতুন এক অস্তিত্বের স্বাদ পেয়েছে। তারাও মানুষের মত বাঁচতে চায়, তাদের মানবিক অধিকার কিছু আছে!

রতনমণি সেই ধর্মচেতনা—ঈশ্বর চেতনার মধ্য দিয়ে ওদের মনের অতলে নোতুন একটা অস্তিত্বকে তুলে ধরেছে। সন্ধ্যার পর আশ্রম—কোন গাছের নীচে একতারা বাজিয়ে ওদের নামগানের সুর ওঠে।

কখনও হাটে গঞ্জে ওদের দেখা যায় রতনমণি খুশীকৃষ্ণ, গেলাকৃষ্ণ হান্দাই ওদের নিয়ে কীর্তনে বের হয়েছে, আর সেই বিচিত্র নামগানের সুরে সমবেত হয়েছে হাটের জনবসতির রিয়াং ছেলেমেয়ে-বৃদ্ধ-তরুণ সকলে।

রতনমণির সুরেলা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

ওঁছে ব্রহ্মা ওঁছে বিষ্ণু।

ওঁছে মহেশ্বর ওঁছে নরঈশ্বর।

ওর সেই মূর্তি ওই নামগানের বিচিত্র সুর আর সহজ সরল ব্যবহার বুকভরা ভালবাসা হতভাগ্য রিয়াংদের মনে একটা সাড়া এনেছে।

রতনমণিও জানে সেটা।

ও এখানে এসে দেখেছে এই সহজ সরল বঞ্চিত মানুষগুলোকে। তাদের ভালোবেসে ফেলেছে, তাই যেন রয়ে গেছে ওদের জন্যই এই অঞ্চলে।

সামখুম্‌ছড়া—উদয়পুরের ওদিকে দক্ষিণ মহারাণীতেও অনেকে তার কাছে আসে, শিষ্যত্ব নিয়ে নিজেরাই আশ্রম গড়ে দিয়েছে।

রতনমণি বলে—এসব কার জন্য করছো তোমরা?

দক্ষিণ মহারাণীর কান্ত রায় বলে—গুরুর জন্যে।

রতনমণি হাসেন—বলো সকলের জন্য, মানুষের জন্যে। শুধু আশ্রম আর মন্দির করলেই হবে না কান্ত, মানুষ চাই।

কান্ত রায় বলে এরা মানুষ যে নয় গো।

রতনমণির দুচোখে প্রীতির ঐশ্বর্য, তিনি বলেন।

—ভালোবাসা দিয়ে, প্রেম দিয়ে এদের চেতনা জাগাতে হবে। চৈতন্যপ্রভুর পূর্বপুরুষ ছিলেন সিলেটের লোক, তিনি বলেন—প্রেমই সবচেয়ে বড় ধর্ম গো। প্রেম দিয়ে ওদের জাগিয়ে তোল।

খুশীকৃষ্ণ জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে- জয় গুরু

...সামান্য মানুষ। তবু কোথায় যেন অসামান্য।

বস্তির গরীব রিয়াংদের মধ্যে সুরু হয়েছে মহামারী। ভেদবমি হয়ে দুচারজন মরছে। ওদের মৃত্যুর কোন হিসাব পৌছে না উদয়পুর তহশীলদারের কাছে, সদর শহরের দপ্তরে। তবু অরণ্যের গহণে কাদের কান্নার সুর ওঠে। অরণ্যে রোদনের মতই তা নিষ্ফল।

তৈন্দুল রিয়াং এর মায়ের অসুখ। ওদের বসতির চার-পাঁচজন মারা গেছে বিনা চিকিৎসায়। রোজা এসে ঝাড় ফুঁক করেছে। দেহবন্ধন করেছে। কিন্তু কিছুই হয় না।

তৈন্দুলের দুচোখে জল নামে। তার ওই মা ছাড়া আর কেউ নেই। মায়ের দুচোখে নেমেছে মৃত্যুর কালো ছায়া।

হঠাৎ কাকে এসে হাজির হতে দেখে চাইল। ছোট খাটো মানুষটি, মাথায় জটা, পরণে গৈরিক হাতে চিমটে আর একটা থলি

লোকের মুখে শুনেছে রতনমণির নাম। হঠাৎ তাকে এত দূর পাহাড় বসতিতে আসতে দেখে একটু অবাক হয়।

—ঠাকুর আপনি ?

রতনমণি ওর মায়ের নাড়িটা দেখছেন। বলেন তিনি।

—কেন রে ? আসতে নেই ?

দুটো পাতায় মোড়া পুরিয়া দিয়ে বলেন—মাকে খাইয়ে দে। ভয় কি ? ভালো হয়ে যাবে।

...বসতির অনেকেই এসেছে। নয়ন্তীও এসে হাজির হয়েছে। ও নিজে ওষুধটা নিয়ে একটা পুরিয়া তৈন্দুলের মাকে দেয়।

...মন্ত্রের মতই কাজ করে ওষুধটা। ...বুড়ির জ্ঞান ফিরে আসছে। ওরাও অবাক হয়।

অবশ্য রতনমণি সেখানে তখন নেই। উনি চলে গেছেন অন্য বসতিতে।

...ওই বছরেই এই রতনমণি একটি পরিচিত প্রিয় নামে পরিণত হয়েছেন। সারা এলাকার লোক চেয়ে থাকে ওর দিকে। মৃতপ্রায় রিয়াংদের মনে একটা নোতুন সাড়া জেগেছে। ওই মন্ত্র তারা জপ করে চলেছে।

রতনমণি নিভৃতে নিজের সাধনভজন করতে চান, তাই চলে যান ডমরুর পর্বতশীর্ষে। ওই ঘনবনসমাবৃত পর্বত অঞ্চল থেকেই বের হয়েছে ত্রিপুরার পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী গোমতী। ওই নদীর দুর্গম

পাহাড়ের মধ্যে ওই নদীর উৎসমুখে রয়েছে একটি কুন্ড। তারই ধারে নিভৃত ছায়ারাজ্য গড়ে তুলেছেন প্রেমবল আশ্রম। এখানে প্রত্যুষে-প্রদোষে ওঠে নির্জন শুদ্ধতার বুকে কি প্রেমের মন্ত্র।

…ডমরু তীর্থ যেন এক নোতুন রূপে জাগ্রত হয়ে উঠেছে শুধু রিয়াং কেন এখানের সব মানুষের কাছে।

রামজয় রিয়াং বগাফা বসতির বেশ সঙ্গতিপন্ন চাষী, রিয়াং সম্প্রদায়ের লোক তবু ওই বগাফা তুইছার বুহা অঞ্চলের অনেক উর্বরা লুঙ্গা সবুজ উপত্যকার মালিক সে। কিছু বাঁশবন আছে টিলার গা জুড়ে। তাছাড়া হাটগঞ্জের সে একজন বড় ব্যবসায়ী।

তার মালপত্র ও ত্রিপুরার বাইরে কসবা' কমলপুর, বিলোনিয়ার হাটে যায়।

খগেন রায় এর বাসও এই অঞ্চলে।

খগেন রায় সেদিন তুইছার বুহা লক্ষ্মীছড়া হাজাছড়া অঞ্চল থেকে ফিরেছে, হাতিখেদার লোকজন অবশ্য জুটেছে। সে কায আটকায় নি। আর এবার গণ্ডাছড়া বনের অনেক হাতিই ধরা পড়েছে। ফলে মহারাজার দরবারে খগেন রায়ের একটু নাম ডাকও হয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম নাকি তাকে এবার এত্তেলা পাঠিয়েছেন, আর কাজটা কি করতে হবে তা কানাঘুসোয় উদয়পুর সদর থানার দারোগা মিহিরবাবুর কাছেও শুনেছে খগেন রায়।

খগেন রায় অবশ্য খবরটা কাগজেও পড়েছে। সিঙ্গারবিল ময়নামতীর ওদিকে গিয়ে নিজেও দেখেছে বিরাট হাওয়াই জাহাজের আস্তানা, বড় বড় বাদামী রং সবুজ জলপাই রংএর ট্রাকে করে, আখাউড়া থেকে ট্রেনের পর ট্রেনে চলেছে চট্টগ্রামের দিকে, কিছু বা আসামের দিকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঁধেছে, আর জাপান এসে পড়েছে সারা বার্মা মুলুকে, তারা এবার ভারতের দিকে এগোচ্ছে। তাদের বাধা দিতে

হবে, তাই এই সৈন্য সমাবেশ। এরোপ্লেনের জমায়েত—রাতের আঁধার ফুড়ে তাদের গর্জন ওঠে। একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। তাই সৈন্য সামন্তের দরকার।

এবার হাতি খেদায় ফেলে বন্দী করার কাযের চেয়েও বড় কাযে হাত দিতে হবে তাকে। মহারাজা চান এই এলাকার বনপর্বতের রিয়াং, চাকলা, কুকি, মগ, নেয়াতিয়া সব বাসিন্দাদের থেকে বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে, তারাই বাধা দেবে এই বনপাহাড়ে জাপানী সৈন্যদের।

তাই লোকজনের দরকার। আর সেই লোকসংগ্রহের জন্য খগেন রায়কেই এত্তেলা পাঠানো হবে সদর রাজধানী আগরতলার খাস উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ থেকে।

...খগেন রায় এবার তৈরী হচ্ছে। জানে বেশ কিছু এলাকার মানুষ মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে আর তাদের এবার সযুত করে দেবে খগেন রায়ের দল।

মিতুল হাজাছড়া বস্তির অরণ্য থেকে এসে আশ্রয় পেয়েছে খগেন রায়ের এখানে। খাওয়া দাওয়ার অভাব নেই, আর আছে মদের যোগান।

তবু মিতুলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের বস্তির পৈরী, খাদিয়া, নয়ন্তী আরও অনেক মেয়ের অনাবৃত দেহের সোচ্চার রেখাগুলো। নয়ন্তী তাকে সেদিন হটিয়ে দিয়েছিল। মিতুল জানে এর পিছনে রয়েছে ওই তৈন্দুল রিয়াং, মৌকা খুঁজছে মিতুল এর জবাব সে দেবেই একদিন। টাকা-- এখন কিছু টাকা সে পায় এখানে। আর জানে কি করে গরীব রিয়াংদের কাছ থেকে টাকা রোজকার করতে হয় তাদের দাবড়ানি দিয়ে।

হঠাৎ কাদের আসতে দেখে দেউড়ির রক থেকে চেয়ে দেখল মিতুল।—এর মধ্যে সে কায়দাকানুনও শিখে গেছে।

রাজপ্রসাদ চৌধুরী বিজয় চৌধুরীদের সে চিনেছে এর মধ্যে। খগেন রায়ের বন্ধুলোক। ওদের ঘোড়া থেকে নামতে দেখে মিতুল চাকরটাকে ধমকে ওঠে,—হুজুরদের ঘোড়াগুলো নিয়ে যা।

নিজে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুই মাতব্বরকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মিতুল।

রাজপ্রসাদ চৌধুরীরা আসছে সোজা লংতরাই থেকে, সেখানের মানুষদের উপর নোতুন চৌকিদারী ট্যাক্স চাপানোর পর দেখেছে ওদের মুখচোখে প্রতিবাদের কাঠিন্য।

রায়কাঞ্চন বলে তারা খগেনবাবুকে মানতে রাজী নয়। কারণ দেবী সিং তাদের পুরোনো রায়কাঞ্চন। আর দেখেছে শক্তি রায় আরও কিছু রিয়াং যুবকদের মনে বিদ্রোহের আগুন। তাই রাজপ্রসাদবাবু ওর ঘরেই আগুন দেবার ব্যবস্থা করে এসেছে এখানে খবরটা দিতে।

—খগেনবাবু আছেন? বিজয় চৌধুরী শুধালো।

মিতুল সাগ্রহে নিয়ে চলে ওদের ভিতর বাড়িতে।

দোমহলা বিরাট এলাকা জুড়ে খগেন রায়ের ছোটখাটো প্রাসাদই বলা চলে। বেশ সুরক্ষিত। আর কিছু লোকজনও তার আছে। কোতোয়ালী থানা—তার হাতে। সরকারেও তার নাম ডাক আছে। তাই ওকে গণ্যমাণ্য ভাবে সকলেই।

...ঘরের ভিতর ফরাস পাতা। দেওয়ালে একজোড়া হাতির দাঁত টাঙ্গানো। কালেশ্বর হরিণের শিংওয়ালা মাথা ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

খগেন রায় রাজপ্রসাদ, বিজয় চৌধুরীদের দেখে চাইল।

—এসো। এসো। চৌধুরী। বসো। কইরে মিতুল।

মিতুল জানে এরপর কি দ্রব্য আনতে হবে। এসব তাদের বস্তির ছ্যাং নয়, উদয়পুর খাস আগরতলা থেকে আমদানি করা পেটি বন্দী বিলাতি মদ থাকে খগেনবাবুর ভাঁড়ারে। আর মুরগীর মাংস, ডিমের

অভাব নেই। কখনও বস্তির নীচে গোমতী নদীর থেকে ধরা হয় টাটকা পাবদা মাছ, ট্যাংরা মাছ। তাজমাছভাজা ও পরিবেশন করা হয়।

মিতুল বলে ওঠে—আমি আনছি হুজুর।

‥খগেন রায় দেখছে চৌধুরীদের। ওরাও সঙ্গতিসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত লোক। ওরা জানে খগেনবাবুকে তাদের দরকার।

খগেনবাবু শুধোয়, ওদিকের খবর সব ভালো?

…বিজয় চৌধুরীই জানায় ঘটনাগুলো। খগেন রায় সব শুনে অবাক হয়, রেগেও উঠেছে। চারিদিকে যেন একটা ষড়যন্ত্রের আভাষ পাচ্ছে খগেন রায়। তাই শুধোয়—ওদের মধ্যে শক্তি রায়ই বেশী শয়তান না?

রাজারাম বলে—একা ও নয়, সবাই। আপনাকেও তারা মানতে রাজী নয়। এবার গঙ্গাপূজায় একটা গোলমাল না বাধায় ওরা। আমরাতো সেই ভয় করছি। তাছাড়া গঙ্গাপূজার চাঁদাও বোধহয় তারা দেবে না।

খগেন রায় এর মধ্যে নিজেই রায়কাঞ্চন নাম নিয়ে ওদের সমাজের মধ্যে কর্তৃত্ব করে চলেছে। রিয়াং সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে, তার সংখ্যা প্রায় চৌদ্দটি। মেচকাদফা, তুঈমাইফাদফা, রাইকচাদফা, চড়কীদফা ইত্যাদি। বর্তমান রায়কাঞ্চন দেবী সিং ওই চড়কীদফার লোক। আর রিয়াংদের পবিত্র সমস্ত চিহ্ন, প্রতীক যা তাদের কাছে পরম সম্মানের সেই সব জিনিষগুলো থাকে রায়কাঞ্চনের কাছে। তাদের মুনছা, চন্দ্রবাণ, ফি ধাং অর্থাৎ সনন্দপাত্র, দাংলামা রিয়াংদের রাজচিহ্ন সবকিছুর রক্ষক ওই রায়কাঞ্চন, সেদিন ওরা ঠিকই বলেছে। খগেন রায়ের ওসব কিছুই নেই। তাই ভাবছে খগেন রায়, ওইসব কিছু পেতে হবে তাকে, দরকার হলে ছলে বলে কৌশলে সে দখল করবে সব কিছু, আর রাজদরবারেও তার স্বীকৃতি আদায় করবে।

খগেন রায়ের মাথায় হঠাৎ বুদ্ধিটা আসে। চতুর সাবধানী লোক

তাই তার মতলবের সবটা সে প্রকাশ করে না। বলে ওঠে খগেন রায়—রায়কাঞ্চন আমিই। অর্দ্ধেকের উপর রিয়াং আমাকে মানে। আর ওদেরও এবার সযুত করে দেব। এইবার গঙ্গাপুজোর চাঁদা—বাসীপুজোর চাঁদা আদায় হবে দু'টাকা করে নয়, ঘরপিছু চার টাকা করে।

বিজয় চৌধুরী বলে ওঠে—চৌকিদারী ট্যাক্স বসালাম ন'টাকা করে, আবার পুজোর চাঁদা বাড়বে, দেবে ওরা?

খগেন রায় বলে—রায়কাঞ্চনের হুকুম চার টাকা করে দিতে হবে। না পারে ঘটি বাটি, জমির ফসল ক্রোক হবে। জরিমানা করা হবে। আর রায়কাঞ্চন কে তখনই বুঝবে তারা।

কালিপ্রসাদও এসে জুটেছে। ধূর্ত লোভী মানুষটা এমনি গোলমালই বাধাতে চায়, তাতে ওরই সুবিধে। কালিপ্রসাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের হাজাছড়ায় দেখা সেই তরতাজা মেয়েটাকে, যেন বুনো গোলাপফুল। কালিপ্রসাদ ওদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায়। তাই বলে,

—ঠিক কথা বড় রায়, ব্যাটাদের বড় বাড়। এই বগাফাতে হুজুরের এলাকায় বসে তাইন্দা রায় কিনা বলে—ওসব হুকুম মানি না। রামজয় রিয়াং হাজার হাজার টাকা কামিয়ে এখন নাকি নেতা হতে চাইছে হুজুরের সঙ্গে টক্কর দিয়ে।

খগেন রায় হঠাৎ বিনয়ে গদগদ হয়ে বলে,—

মাথা গরম করিস না কালিপ্রসাদ, ওসব নানা জনে নানা কথা বলবে, তাই বলে রাগলে চলে? যা করছি রিয়াংদের ভালোর জন্যই করছি। ওরা জানে না তাই আজেবাজে লোকের কথায় যা তা বলছে। ওদের বুঝিয়ে রাজী করাতে হবে। না দেয়—মাথা তোলে, তখন অবশ্যি মাথাটা গুড়িয়ে দিতে হবে। আগে থেকে ওসব কিছু করিস না।

বিজয় চৌধুরী ভাবছে কথাটা। ডমরুর তীর্থমুখে তাদের বেশকিছু

আমদানী হয় পুজো উৎসবে। সেখানেই যেন একটা গোলমাল না বাধায়। অবশ্য খগেনবাবু বলে—ঘাবড়াবার কিছু নাই চৌধুরীর পো, গোলমাল হলে মোকাবিলা করার জন্য লোকজন নিয়ে আমি থাকবো। একটা ফয়সালা করা দরকার।

হাটে গঞ্জে আবার নোতুন চাঁদার জুলুমের কথা রটে যায়। রামজয়ও কথাটা শুনেছে।

…তার কারবার এখন বেশ চালু। এই এলাকার সমস্ত রিয়াং চাষীই তার কাছে ধান, গম, তুলো, সরষে, তামাক বেঁচে। রামজয় এমনিতে ধর্মভীরু লোক, ওজনও দেয় ঠিকমত।

ওর একমাত্র ছেলে সুবল রিয়াংও বাবার কাছে ব্যবসার এই মন্ত্র শিখেছে।

কাঁটাপাল্লায় ধান ওজন হচ্ছে। রামজয় বলে সুবলকে।

—ওজনে ঠিক দিবি বাবা। ধর্মের দাঁড়ি ওখানে হেরফের রাখবি না।

সুবলও জানে সেটা।

রামজয় ক'দিন ধরে বিপদে পড়েছে। সুবলের জ্বর আর কয়েকদিনেই জ্বরও যেন বিকারে পরিণত হয়েছে। তাজা ছেলেটা বিছানায় মিশিয়ে গেছে।

রোজা-বদ্যি এসব হয়েছে অনেক। মনটা ভালো নেই তার।

হঠাৎ সেদিন খগেন রায়কে আসতে দেখে চাইল।

মাল ওজন হচ্ছে কাঁটায়, ওদিকে তুলোর গাঁট, তামাকের বস্তা পড়ে আছে।

আশপাশের চত্বরে অনেক আদিবাসীরাও এসেছে। বগাফার হাটে জোর মরসুম চলেছে কেনাবেচার।

গঙ্গাপূজার আর দেরী নেই। তাই সকলেই ঘরের ধান, ফসল যা ছিল বেচে উৎসবের আয়োজন করছে। হাটে এসেছে তারা।

খগেন রায়কে ঢুকতে দেখে চাইল রামজয়।

ওদিকের টিনের টানা বারান্দায় তক্তপোষে বসেছিল রামজয়।

খগেন রায় আর সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকা কালীপ্রসাদকে দেখে চাইল।

…একটু অবাক হয় সে, একা সেই-ই অবাক হয়নি। সমবেত আদিবাসীরা অনেকেই দেখছে খগেনবাবুকে।

খগেন রায়ের হুকুম এর মধ্যে শুনেছে তারা। এসব তাদের কাছে জুলুম বলেই বোধ হয়েছে। রামজয় রিয়াংও মনে মনে তাই খুশী নয়। তবু আপ্যায়ন করতে হয় খগেন রায়কে।

আসুন, আসুন রায়মশায়।

খগেনবাবু দেখছে রামজয়কে। এমনিতে বিনয়ী। তবু জানে খগেন রায় এই লোকটির এও একটা বাইরের মুখোস। টাকা অনেক করেছে আর এই বিনয়ই তার মূলধন।

খগেনবাবুও প্রকাশ্যে ওকে চটাতে চায় না। তাই বলে।

—এলাম রামজয়, শুনলাম তোদের ছেলের অসুখ। তা বাপু ওই রোজা ঝাড়ফুঁক—এই ভণ্ড রতনমণির জলপড়া দিয়ে কাম হবে না। তাজা ওষুধপত্র নিয়ে আসবি!

রামজয় বলে—অমরপুরের ডাক্তারবাবুই দেখছেন এখন।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয় খগেন রায়। তাকে না জানিয়ে তার কোনরকম সাহায্য না নিয়েই রামজয় চলতে পারে এটা জেনেছে সে। রামজয় বলে—আর রতনমণি জলপড়া দেননি রায়মশায়, তিনিই বল্লেন ডাক্তারবাবুকে আনো। রোগের চিকিৎসা হওয়া দরকার।

খগেন রায় এর মুখখানা বোদা হয়ে যায়। রতনমণির আশ্রমে রামজয় যাতায়াত করে তা জানে খগেন রায়। আর রতনমণিকে যে রামজয় এতটা মানেগণে সেটা তার জানা ছিল না।

খগেনবাবু সহজভাবে বলে—তা ভালো। দেখো তাহলে গঙ্গাপূজার বাজার ভালোই বলতে হবে।

রামজয় বলে—বছরের বড় পরব। কেরকুচপূজোর মতই ধুমধা
হয়। তাছাড়া ধানের মরশুম।

খগেন রায় বলে ওঠে—বাজে খর্চা এতে করতে পারে তাই ওসব বন্ধ করে দেবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পূজোর চাঁদা এবার চার টাকা করা হয়েছে তাতেই সবাই চটে আগুন। এসব কি আমার নিজের জন্য করছি?

রামজয় জবাব দিল না।

ও জানে সকলের মনের কথা, আর অনেক খবরই। এর মধ্যে প্রায় হাজার পনোরো টাকা ওরা হাটে হাটে জুলুম করে এনেছে। এখনও সদলবলে জুলুম চালাচ্ছে। আর অন্যদিকে উদয়পুর শহরের বুকে উঠেছে খগেন রায়, রামপ্রসাদ চৌধুরী, বিনয় চৌধুরীর নোতুন বাড়ি। খগেনবাবু আরও চতুর ব্যক্তি, ত্রিপুরা রাজ্যের লাগোয়া বাংলা মুলুকের বিলোনিয়া শহরেও নোতুন বাড়ি করেছে।

এসবের রসদ আসে কোত্থেকে তা অন্য কেউ না জানলে রামজয় জানে। তবু সে চুপ করে রইল। কাযে মন দেবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ গোলমাল শোনা যায় হাটের মধ্যে। রামজয় উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক গরীব আদিবাসীও চীৎকার করছে, কার আর্তনাদ ভেসে আসে।

—কি ব্যাপার? রামজয় অবাক হয়।

খগেনবাবু চেয়ে ওদিকে। মিতুল আরও কয়েকজন রিয়াংদের নিয়ে কিছু লোকজন মেয়েদের টেনে আনছে।

কান্নাকাটির শব্দে সব ঘুলিয়ে যায়।

খগেনবাবু জানে এসব কথা। মদন রিয়াং এগিয়ে এসে বলে আমার দু গাড়ি ধান কেড়ে নিয়েছে। এই খগেনবাবুর লোক এদেরও সব কেড়ে নিয়েছে রামজয় ভাই।

খগেনবাবুই ধমকে ওঠে—তোকে সেদিন জরিমানা করা হয়েছিল চাঁদা দিস্ নি বলে নিয়েছে। জরিমানার টাকা সমাজে দিতে হবে

না? একি ছেলেখেলা পেয়েছিস? আর গঙ্গারাম, ওই লোকগুলোর ধানও সব নিয়ে চল। তুইছার বুগার কোন ব্যাটাকে ছাড়বি না।

এগিয়ে আসে ভিড় ঠেলে তৈন্দুল রিয়াং, তার ছনক্কা ধান, এক গাঁট তুলোও কেড়ে নিয়েছে এরা।

তৈন্দুল বলে ওঠে—জরিমানা করার তুমি কে হে খগেনবাবু?

গঙ্গারাম, কুমারিয়া ওঝা খগেনবাবুর বিশ্বস্ত অনুগৃহীত লোক। কুমারিয়া ওঝা লাফ দিয়ে ওঠে—মুখের উপর কথা বললে মুখ ভেঙ্গে দোব তৈন্দুল।

রামজয় নিজেকে অসহায় বোধ করে। বুড়ি দুচারজন গরীব আদিবাসী শুধু কাঁদছে—হেই খগেনবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি। ধান ফিরায়ে দাও। ধান বিচে চাদা আমি দিব।

...ওক্ষণে ওরা চার টাকার জায়গায় কুড়ি টাকার ধান পেয়েছে, তাই ছাড়তে রাজী নয়। খগেনবাবু এসব ঝামেলা এড়াবার জন্যে বলে।

—সব কটাকে কাছারিতে নিয়ে চল, গোলমাল করলে কাউকে ছাড়বি না।

হুকুম দিয়ে খগেনবাবু বের হয়ে চলে গেল।

গঙ্গারাম রিয়াং এ এলাকার একজন নামকরা বদমাইস লোক, ওর 'টাক্কাল' এর ঘায়ে বেশ কিছু লোক জখম হয়েছে, আরও অনেক কিছু কুকর্মের কুলোপুরুষ সে। আজ হঠাৎ ধর্মের জন্য দেবতার পূজোর জন্য চাদা আদায় করার কাজে নিজেকে যেন সমর্পিত করেছে। মিতুলও দুচারজনকে টেনে নিয়ে চলেছে।

তৈন্দুলকে ধরতে যাবে কালিপ্রসাদ, ছেলেটা গর্জে ওঠে

—গায়ে হাত দেবে না। ও ধান লুট করেছো আজ তোমার এলাকায় পেয়ে। তার জবাবও দেব।

...কালিপ্রসাদ হাসছে। জানে তারাই আজ জয়ী হয়েছে। তাই বিজয়ীর মত বের হয়ে গেল। তারা কিছু লোকজনকে ধরে

নিয়ে চলেছে কাছারির দিকে। এই এলাকায় তারাই জানাতে চায় যে খগেন রায় প্রধান, তার হুকুম অমান্য করলে এমনি শাস্তিই পেতে হবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রামজয়।

একজন বুড়ি কাঁদছে তার একমাত্র ছেলের অসুখ, পথ্যি অবধি নাই। সব ওরাই লুটে নিয়েছে।

রামজয় চাইল ওর দিকে। বুড়ির জরাজীর্ণ মুখে বয়সের কঠিন চিহ্নগুলো রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। দুচারজন অসহায় বৃদ্ধের আর্তকান্নাও শুনেছে সে। এ যেন তার কাছে একটা কঠিন বেদনাময় মুহূর্ত।

রামজয় বলে—তোমরা কেঁদো না। ধান, গম এখান থেকে কিছু নিয়ে যাও। আর কিছু টাকাও দিচ্ছি।

লোকটা আর্তকণ্ঠে বলে—বেচার মত ধান তামাক কিছুই তো নাই মহাজন। শুধবো কিসে?

রামজয় বোঝে আজ তার প্রতিকার করার কিছু আছে। তাই বলে সে—শোধ দিতে হবে না পৈতান।

ওরা অবাক হয়ে শুনছে কথাগুলো। এ ধরনের কথা শুনতে তারা অভ্যস্ত নয়। তাই বুড়ো পৈতান বিস্ময়ে বলে ওঠে।

—কি বলছো রামজয় ভাই?

রামজয়ের মুখে একটি শান্ত মধুর হাসির আভাষ জাগে। ও যেন আজ নিজের মনের গভীরে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। ওই কান্না ভরা অনেক মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ওদের আশীর্বাদে তার ফসল ভালো হয়ে উঠবে। রামজয় বলে—ঠিকই বলছি।

জয়ধ্বনি ওঠে তার নামে, হাটের সমাগত বহুমানুষ হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে উঠেছে। অত্যাচারী আর অত্যাচারিত দুটো শ্রেণীকে আজ তারা স্পষ্ট করে দেখছে, চিনেছে।

চিনেছে তাদের অকৃত্রিম বন্ধুদেরও। তাই এত আঘাত দুঃখের মাঝেও অসহায় ওই মানুষগুলো জয়ধ্বনি দিয়ে উঠে।

খবরটা অবশ্য খগেন রায়ও শুনেছে।

ইতিমধ্যে লুটের মালের স্তূপ বানাচ্ছে সে, বিভিন্ন হাটে গঞ্জে তার ...কজন বিজয় চৌধুরী, রামপ্রসাদ চৌধুরী, কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর ...ত্থে এই সামাজিক শৃঙ্খলার পথে শোষণ পব কায়েম করে চলেছে ...রা।

খবরটা এনেছে মিতুল।

—রামজয় রিয়াং ওর গোলা থেকে সবাইকে ধান আর টাকা ...চ্ছ রায়মশাই! আমরা নাকি জুলুম করে লুট করেছি গরীবদের ...।

খগেন রায় মনের রাগ চেপে বলে।

—গরীবের বন্ধু সেজে কদ্দিন চালায় দেখা যাক। যা বাবা ...গুলো সামলে রাখ। কালই পাহারা দিয়ে সব উদয়পুরে পাঠাতে ...: তামাক—তুলোর গাঁট যাবে বিলোনিয়ার হরকিষণের ...ে।

অবাক হয় মিতুল—আজ্ঞে ত্রিপুরার বাইরে? তা রাজদরবারে ...র উপর চুক্তি মাশুল দিতে হবে তো!

খগেন রায় ওর দিকে চাইল। গলা নামিয়ে বলে,—

ওসব খগেন রায়ের লাগে না রে! চুক্তিতে বলা আছে কেউ ...ব না।

অর্থাৎ আইন তার জন্য নয় এই কথাটা জানাতে চায় সে। ...ন রায় বলে,—একবার উদয়পুর যেতে হবে। আর খেয়াল রাখবি, ...পুরের ডাক্তারবাবু কখন আসে।

মিতুল বলে ওঠে—তাকে তো আসতে দেখলাম একটু আগে।

— তাই নাকি! খগেন রায় কি ভাবছে। ওর মুখচোখে ফুটে একটা বিজাতীয় কাঠিন্য। খগেন রায় জানে কি ভাবে এগোতে ...। ওই ডাক্তারের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে। ছোকরা

বাইরের থেকে এসে এর মধ্যে এসব এলাকায় খুব নাম ডাক করেছে। আর পয়সার দিকেও তার নজর নেই।

খগেন রায় জানে কি ভাবে একে জব্দ করতে হবে। তাই উদয়পুর সদরে গিয়েছে এবার চেষ্টা করবে সে। দরকার হলে আগরতলাতেও খবর পাঠাবে।

...রামজয় বিশ্বাস ক'দিনেই বিপদে পড়েছে। টাকার অভাব তার নেই। তাই একমাত্র ছেলের চিকিৎসায় কোন ত্রুটি করেনি কিন্তু হঠাৎ অমরপুরের ডাক্তারবাবু সদরে বদলি হয়ে গেছেন, অন্য কোন ডাক্তার এখনও আসেনি সেখানে। রামজয় চেষ্টা করেছে উদয়পুরের ডাক্তারবাবুকে আনতে, কিন্তু এই সময়ে এত পথ পাড়ি দিয়ে আসতে রাজী নন তিনি, শুধু বলেন হাসপাতালে নিয়ে আসুন। এখানে দেখবো।

...সুবলের দেহটা বিছানায় মিশিয়ে গেছে। নড়াচড়ারও উপায় নেই। রামজয়ের অবস্থাও পিতৃস্নেহে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। রতনমণি শুনেছেন সবকথা।

আরও বিস্মিত হয়েছেন হঠাৎ ডাক্তারের এই বদলির খবরে। তাইলা রামই খবরটা আনে।

——খগেনবাবুই সদরে তদ্বির করে বদলি করেছে ওই ডাক্তারবাবুকে।

রতনমণি অবাক হন——কি ব্যাপার?

কিন্তু করার কিছুই নেই। কয়েকটা মানুষ যেন সব শক্তি দিয়ে এদের নানাভাবে বিপদে ফেলছে। খগেন রায়ের রাগের কারণটাও জানা যায়, রামজয় নাকি সেদিন অনেক মানুষের কান্নাজলা মুখে হাসি ফুটিয়েছিল।

খগেন রায় তাই এমনি চরম আঘাত দিয়েছে তাকে।

রামজয় চোখের উপর দেখে সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে। রতনমণি

হৃদয়ে উৎস থেকে উৎসারিত কোন অমেয় শক্তিকে। তাই এই আত্ম-নিবেদনের মন্ত্র ধ্বনিত হয় ওদের কণ্ঠে অরণ্যের আদিম অন্ধকারে।

দিন তবু বয়ে যায়, একটি দিনের উজ্জ্বল অস্তিত্বকে মুছে দিতে নামে রাত্রির অমানিশা, কিন্তু তবু সে হারায় না। জাগর রাত্রির তপস্যার মাঝে আবার প্রতিষ্ঠিত হয় অন্য একটি স্বর্ণোকিরণোজ্জ্বল দিনের অস্তিত্ব!

...ডমরু পর্বতের নির্জন ঠাঁই—ওই নদীর দুধারের পাহাড় বনে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। কাল ভোররাত্রি থেকেই সুরু হবে তীর্থমুখের কুণ্ডে গঙ্গাপূজা, গোমতীপূজা।

ত্রিপুরা রাজ্যে গোমতী নদী গঙ্গার মতই পবিত্র। তাই সব সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের—সমতলবাসীদের ভিড় জমে এখানে তর্পণ করে, আর সারা বছরের সব মৃত আত্মীয় পরিজনদের অস্থি নিয়ে আসে ওই পুণ্যলগ্নে গোমতীর তীর্থমুখে বিসর্জন দিয়ে তার পারলৌকিক ক্রিয়া করে থাকে।

রামজয়ও এসেছে। সঙ্গে এনেছে গলায় ঝুলিয়ে একমাত্র সন্তানের শেষ চিহ্ন, তার অস্থি। কাল ভোরে বিসর্জন দিয়ে শ্রাদ্ধ তর্পণ করবে

ওদিকে রতনমণির আশ্রমে নামকীর্তন চলেছে।

পাহাড়ের বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে পুণ্যতোয়া গোমতী।

ওদিকে পাহাড়ের কোলে কিছু ফাঁকা জায়গায় বসেছে দোকান—পাঁপর, বাঁশের চাটাই ঢাকা ঝুপড়িতে দোকানী এনেছে পুঁতির মাল কাঁকই, আরসি, সূচ-সুতা—টুকিটাকি জিনিষ। কেউ এনেছে রঙ্গীন পাছাড়ি, রুপোলি চাদর লাইসাম্পির পশরা। কোথাও বসেছে লাড্ডু—তিল খাজার দোকান।

ওই শীতে মুক্ত পাহাড়ের কোলে হাজার হাজার মানুষ জমেছে ঠাঁই ঠাঁই গাছের গুড়িতে আগুন ধরিয়ে হাত পা সেঁকছে। আর অর্দ্ধজাগর জনতার মাঝে মৃদু কণ্ঠে গোমতী বন্দনার সুর ওঠে।

আমা এ গোমতী মা, আমা এ গোমতী মা,
য়্যা ফাৎসে দুর্বা কাথং তং নাইমা,
চু কালাংছি কবং তং নাইমা,
বলং আথজী ছিমাই তং নাইমা ;

ওগো আমার গোমতী মা, তোমার পায়ের নীচে সবুজ দুর্বাদল, উপরে কালাংছি বাঁশের ঘন বন তোমার মস্তক শোভিত করেছে, আর বিশাল সবুজ বনানীতে তুমি প্রবাহিতা, হে মা গোমতী তুমি সকলের প্রধান! দুঃখ বেদনা পেয়ে নিয়ে ডাকলে তুমি সেই দুঃখ মোচন করো।

বিচিত্র সুরের ওই মৃদু গুঞ্জরণ মিশেছে ডমরুর পর্বত গায়ের গোমতীর জলপ্রপাতের সুরে। ওই বিস্তীর্ণ পর্বত নদীর রাজ্যে কোন এক অধরা জগতে যেন হারিয়ে গেছে আদিম মানব সমাজ।

সকালের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর কলরবে ভরে উঠে চারিদিক। রাতের হিম জড়তা কেটে গিয়ে এসেছে নোতুন সূর্যের উত্তাপ। তীর্থমুখের জলধারায় নেমেছে হাজারো মানুষ।

বিজয় চৌধুরী, রাজপ্রসাদ চৌধুরী—এদিকের চৌধুরীদের অনেকেই এসেছে। তাদের লোকজন নেমেছে ওই তীর্থমুখে—এখানের প্রধান পাণ্ডা তারাই, এসব পূজা পার্বনের দক্ষিণা দিতে হবে তাদের হাতে। প্রতিটি তীর্থযাত্রী রিয়াংদের কাছে তাই দাবী করেছে তারা।

ওরাও ক্ষেপে ওঠে।

—চাঁদা দিহছি গঙ্গাপুজোর, বাসীপুজোর। চারটাকা চাঁদা দিয়ে আবার জুলুম।

কে বলে—ডমরু তীর্থমুখ তোমাদের নাকি হে! নিজেরা স্নান তর্পণ করবো, পুরুত থাকবে আমাদের।

কথায় কথায় গোলমাল বেড়ে ওঠে।

রামজয় এসেছিল, সুবলের শ্রাদ্ধ তর্পণ করতে বসেছে তার চেনা

এক রিয়াং পুরোহিত নিয়ে। কারা লাঠি দিয়ে সব পিণ্ড, চাল, ফুল সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে।

আর্তনাদ করে উঠে রামজয়। কিন্তু তার আগেই হাজারো মানুষ যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

খগেন রায় আর চৌধুরীর দল এমনি ব্যাপারটা ঘটাবার অপেক্ষাতেই ছিল, তারাও তৈরী হয়ে এসেছে। মিতুল, ভবানী ওঝা অন্যান্য সকলেই এবার লাফ দিয়ে পড়ে ওই নিরস্ত্র জনতার উপর।

...হঠাৎ যেন জল কল্লোল স্তব্ধ হয়ে যায়।

গোলমালের সংবাদটা পৌঁছেছে প্রেমতলি আশ্রমে।

খুশীকৃষ্ণ স্নান করতে গিয়েছিল তীর্থমুখে, হঠাৎ ওই গোলমাল দেখেছে সে। এদিকে হাজার হাজার মানুষ মেয়ে ছেলে বন্দী হয়ে পড়েছে, একটি মাত্র জায়গা—তারপরই ওই নীচে প্রবাহিত নদীর গভীর খাত। কোন রকম পালাবার পথ নেই। ওদের যেন কৌশলে যাঁতাকলে ফেলেছে কারা। এসময় মারামারি কোনরকম উত্তেজনা সৃষ্টি হলেই সমূহ সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই খুশীকৃষ্ণ কোনপথ না পেয়ে দৌড়ে আসে আশ্রমে।

রতনমণিও সব শুনে চমকে ওঠেন—সে কি কাণ্ড!

খুশীকৃষ্ণ বলে- তাই তো দেখছি। কিছু একটা ঘটে গেলে কতো মেয়েছেলে, পুরুষ, বৃদ্ধ মারা পড়বে বেঘোরে। আজ এ গোলমালটা বাঁধিয়েছে ওই চৌধুরীরাই।

রতনমণি নিজেই বের হয়ে এলেন ওই উত্তেজিত জনতার সামনে। তখন মেলা প্রাঙ্গণে পাহাড়ের সংকীর্ণ পরিসরে উত্তেজিত ভীতগ্রস্ত লোকজন মেয়ে, ছোট ছেলের দল কান্নাকাটি শুরু করেছে।

আর কিছু রিয়াং যুবক এর মধ্যে বাধা দেবার জন্য তৈরী হয়েছে, হাতে ওদের ধারালো টাক্কাল—মাথায় ফেটি বাধা, ওদের পেশীবহুল কঠিন দেহগুলো যেন ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে।

খগেন রায় আর চৌধুরীরা দূর থেকে ওদের যুদ্ধে নামাতে চায়, আর আজই তারা ওই ক্ষেপে ওঠা মানুষগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারবে। একবার এগিয়ে আসতে দেরী, তাহলেই চৌধুরীদের উদ্দেশ্য সফল হবে। হঠাৎ ওই গেরুয়া পরা জটাধারী সন্ন্যাসীকে দেখা যায় গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে কি বলছে। ওর মুখচোখে কি বেদনার ছায়া।

-- রতনমণি সাধু।...

জনতা স্তব্ধ হয়ে গেছে! ওদের চোখেমুখে একটা প্রশ্ন!

রতনমণি এই অবকাশে পাহাড় থেকে নেমে এসে বলে ওঠেন। —এ কি করছো তোমরা! নামাও টাক্কাল—তীর্থ করতে এসে কি নিজেদের রক্তে তোমরা হাত কালো করবে? এই গোমতী তীর্থকে কলঙ্কিত করে যাবে?

চৈন্দুল রিয়াংও এসেছে, এসেছে লংতরাই থেকে শক্তি রায়, তুইছারবুহা থেকে অত্যাচারিত মানুষের দল। আজ তারা রুখে দাঁড়াতে চায়, দরকার হলে লড়াই করতে চায় এতদিনের পুঞ্জীভূত আঘাতের প্রতিবাদে। কিন্তু তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ওই লোকটি। রতনমণি বলে ওঠেন-- নামাও 'টাক্কাল' তীর্থস্নান সেরে যে যার বাড়ি ফিরে যাও।

সমবেত জনতা বলে—আমাদের তর্পণ করতে দেবে না চৌধুরীরা!

...রতনমণি কথাটা শুনেছেন। তাই বলেন তিনি।

—এর একটা মীমাংসা হবেই।

.. খগেন রায় রীতিমত বিস্মিত হয়েছে। ওর কৌশলটাকে নিমেষের মধ্যে ওই একটি লোক বানচাল করে দিয়েছে। খগেন রায় দেখেছে হাজার হাজার মানুষ ওই একটি লোকের ইঙ্গিতে থেমে গেছে নিমেষের মধ্যে।

খগেন রায় একটা কঠিন সত্যকে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। রতনমণি যে কৌশলী সেটা বুঝেছে খগেন রায়। নাহলে সে ওদের

এভাবে আজ থামিয়ে দিত না। রতনমণিই বাঁচিয়ে দিয়েছে আজ না হলে এই সুযোগে গোমতীর জল ওই অসহায় মানুষগুলোর রক্তে রাঙা করে তুলতো খগেনবাবু আর চৌধুরীর দল।

—হুজুর!

খগেন রায় মিতুল আরও কাদের দেখে চাইল। মিতুলকে এর মধ্যে কারা বেশ কয়েক ঘা জমিয়েছে। ওর নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। আর চৌধুরীদেরও দুচার জন আহত হয়েছে।

এখন লড়াই করাও নিরাপদ হবে না। কারণ এবার সময় পেয়ে রিয়াং এর দল তাদের আস্তানা ঘিরে ফেলেছে।

এমন সময় দেখা যায় ভিড়-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছেন রতনমণি। সাধারণ চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। দু চোখের দৃষ্টিতে কি একটা প্রদীপ্ত আভা ফুটে ওঠে।

বিজয় চৌধুরী, রামপ্রসাদ চৌধুরীও বের হয়ে আসে।...তারাও ভাবেনি যে ব্যাপারটা এমনি গোলমাল পাকিয়ে যাবে।

রতনমণি বলেন—আপনাদের কাছেই এসেছি আশা নিয়ে। পূজো পার্বন তর্পণ যে যেভাবে পারবে করাবে। তার জন্য এই জুলুম কেন হবে?

চৌধুরীদের হয়ে খগেন রায়ই এবার কথা বলে,—জুলুমতো কিছু হয় নি। পূজারী ব্রাহ্মণরা যদি দক্ষিণা চান—সেটা জুলুম কেন হবে?

রতনমণি খগেন রায়ের দিকে চাইলেন। ওর চোখে একটু কাঠিন্য ফুটে ওঠে। রতনমণি বলে ওঠেন,

—খগেনবাবু, বিষয়টার মীমাংসা করতে এসেছি চৌধুরীদের সঙ্গে, কথা বলতে হয় তাঁরাই বলবেন। আপনি রিয়াং হয়ে চৌধুরীদের কথা বলবেন তা ভাবিনি।

খগেন রায়-এর ফর্সা মুখটা লাল্‌চে হয়ে ওঠে রাগে অপমানে। একেবারে তাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে যেন ওই স্পষ্টবাদী লোকটি।

খগেন রায় চুপ করে যায়।

বিজয় চৌধুরী এবং অন্যান্য সকলে ভাবছে কথাটা। একটা ভুলই করে ফেলেছে তারা।

রতনমণি বললেন—আপনারা প্রণামী যা হয় পাবেন, পুরোহিত পাবে দক্ষিণা। এইভাবে চলুক।

চৌধুরীদের অনেকেই বুঝেছে এছাড়া এখন আর কোন পথ নেই। ওরাই ইচ্ছে করলে তাদের এখন পিষে মেরে ফেলতে পারে। তাই বাধ্য হয়েই তাদের এই সর্ত মেনে নিতে হয় আজ।

বিজয় চৌধুরীও জানায়—ঠিক আছে। তাই হবে। আমরাও তীর্থস্থানে কোন অশান্তি হোক, চাই না।

সমবেত জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে—জয় রতনমণির জয়!···

কোন ভক্ত আবেশে গদগদ হয়ে চীৎকার করে—জয় গুরু!

পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে ওই জয়ধ্বনি। আবার প্রাণের সাড়া জাগে পর্বততীর্থে, গোমতী তীরে। সব মেঘ যেন মুছে গেছে। একটি মানুষ আজ কি দৈবশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে এই অত্যাচারিত রিয়াংদের পাশে।

·· খগেন রায় তখনও চুপ করে বসে আছে।

বিজয় চৌধুরী ক্ষুব্ধ স্বরে—এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না খগেনবাবু। তাই এই সর্ত মেনে নিতে হল!

খগেন রায় বলে—এর চেয়ে তীর্থমুখের জলে ডুবে মরাই ছিল ভালো। সর্ত নয়, মীমাংসা নয় চৌধুরী। এ ওই লোকগুলোর জুলুম, ওদের অন্যায়-দাবীটাই ওরা প্রতিষ্ঠিত করে গেল। এত বড় লজ্জা অপমানটাকে মেনে নেবো?

বিজয় চৌধুরী, রামপ্রসাদ চৌধুরী সেটা জানে। তাই বলে,

—কিন্তু কি করা যাবে?

খগেন রায় বলে—করার অনেক কিছুই আছে। আর সেইটাই করতে চাই যদি আপনারা সাহায্য করেন।

চৌধুরীর দলও আজ খুশী হয় নি। তাই তাঁরাও ফুঁসছিল মনে মনে। বলে ওঠে আমরাও তাই চাই! খগেন রায় বলে—তাহলে কথা দিন।

ওই তীর্থমুখের তীর্থলগ্নে যেন ক'টি মানুষ আজ শপথ নেয়, সর্বনাশের শপথ। চোখে ওদের হিংসা, লালসার জ্বালা ফুটে ওঠে।

হাজারো মানুষ এই শপথের খবর জানে না, জানলো না একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জন্মকথা। তারা আজ খুশি মনে তীর্থ স্নান সেরে টিলা বস্তিতে ফিরছে বিভিন্ন বনপর্বতের পথে। ওরা জানে না যে আকাশ ছেয়ে মেঘ জমেছে। ঘনকালো মেঘ।

তখনও সুর ওঠে—আমা এ গোমতী মা—

বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙ্গে।

কালো মেঘের দল বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই, জম্পুই এর ঢেউ খেলান মাথাগুলোয় এসে বাসা বেঁধেছে; এক একসারি পর্বত, ওরা হিমালয়ের শেষ প্রতিভূ, সারা ত্রিপুরার বুক জুড়ে ওরা নেমে গেছে! ঘন শাল, বাঁশ-গর্জন-পাহাড়ী কলাগাছে ঢাকা। মেঘগুলো নেমে এসেছে। সাদা ধোয়া ধোয়া মেঘগুলো আঠারো-মুড়া, দেওতামুড়া পাহাড়ের মাথায় লুকোচুরি খেলা সুরু করে।

আর বৃষ্টি ধারাস্নানে ভরে ওঠে সারা টিলা-পাহাড়, লুঙ্গা।

নদীগুলোয় নেমেছে পাহাড়ী ঢল। গোমতী যেন কেঁপে উঠছে, কেঁপে উঠেছে হাবড়া-খোয়াই নদী, ওদের মত্ত জলধারা মাঠ প্রান্তর ছাপিয়ে চলেছে।

নগ্ন টিলার বুকে এবার বৃষ্টি ধারায় মিশেছে জুম চাষের জন্য পোড়ানো গাছ গাছালির ছাইগুলো। মাটির বুকে উঠেছে একটা চাপা সুবাস। বাঁশবনের বাতাসে দমকাবৃষ্টির জলধারা ঝরে পড়ে।

...টিলা বসতির লোকজন এবার আশার মুখ দেখেছে। মা গঙ্গা, মা গোমতী এবার যেন প্রসন্ন হয়েছে তাদের উপর।

আকাশটা ঘসা কাচের মত বিবর্ণ, আর ঢালু হয়ে যেন বড়মুড়া পাহাড়ে এসে ঠেকেছে।

তৈন্দুল চলেছে টিলার দিকে, জমির রকম দেখা দরকার। চলছে সে বসতির পাশ দিয়ে, ঘন বাঁশবনের ধারে ছোট ঘরটার সামনে একটা সুর শুনে থমকে দাঁড়ালো।

ওই সুর সে চেনে।

কান্ত রায় বাড়িতে নেই। ইদানীং সে বেশী সময় কাটায় রতনমণির আশ্রমে। একটা কাজ তার বাকী রয়ে গেছে। মেয়েটার বিয়ে সাদী হয় নি এখনও। নয়ন্তীর মা ও মাঝে মাঝে বলে। কিন্তু কান্ত রায় এখন অন্য মানুষ।

ওর সামনে অনেক কাজ। সারা এলাকার অসহায় মানুষ আসছে আশ্রমে। রতনমণি যেন তাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।

কান্ত রায় ভাবেনি যে তাদের একদিন এই দায়ও সামলাতে হবে। তাই ওরাও নানা কাজে ব্যস্ত। কখনও সদরেও যেতে হয়, কাছারিতেও যায় কোন সাহায্যের আশায়।

রতনমণি বলেন—এসব ছাড়া তোমার ঘর সংসার আছে কান্ত।

কান্ত হাসে—ওসব ঠিক চলে যাবে ঠাকুরের কৃপায়।

অবশ্য নয়ন্তী নিজেই এখন এ সংসারের সব ভাবনা তুলে নিয়েছে নিজের ঘাড়ে। কান্ত রায় তাই বলে।

—তুই আমার ছেলের কামই করছিস নয়ন্তী।

নয়ন্তী জানে বাবার এই সব কাজের কথা। তাই নিজেই দরকার হলে জুমেও-চাষ করে, গরু বাছুর সামলায় মা-মেয়েতে। অবসর সময় তাঁত নিয়ে বসে।

বৃষ্টির সময় বাইরে যাবার উপায় নেই, নয়ন্তীর মা সুতোর যোগান দেয় আর তাঁতের কাজে নয়ন্তীর জুড়ি নেই। তার হাতের তৈরী শাড়ি, রিহার কাজ এখানের সকলেই চেনে। মহাজনের ঘরেও তার 'রিহা', পাছড়ার দাম একটু বেশী।

তবু নয়ন্তীর মনে হয় কোথায় যেন সারা মনে একটা শূন্যতার বেদনা রয়ে গেছে। জানে তৈন্দুল তাকে ভালোবাসে। কিন্তু তার বাবাও এটা চায় না।

…তৈন্দুলের নাকি জমি জারাত নেই। না থাক। খাটিয়ে মরদ—তারা দুজনে যেভাবে হোক সব ব্যবস্থা করে নেবে। একটা টিলায় ঘর বেঁধে চাষ আবাদ করবে তারা। কিন্তু ধান। লুঙ্গা জমি যেন সারা দেশে একটু নেই যেখানে তারা ঘর বাঁধতে পারে।

…বারবার কি সুরটা হাহাকারে ভরে ওঠে নয়ন্তীর।

বৃষ্টিঝরা আকাশ, চারদিকে বৃষ্টির সুর ওঠে। ওই বিচিত্র সুরের সঙ্গে মিশেছে নয়ন্তীর সুর।

ন থাদে গুরুম থাছে গুরুম খা অ

ইয়াম সুং সুকৃদি

আকাশের গর্জনও নয়, এ যেন আমার হৃদয়ের গম্ভীর সুরে কোন হাহাকারের সুর। অন্তরের এই বেদনাকে আমি স্তব্ধ করতে পারি না।

—নয়ন্তী।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে নয়ন্তী। বাঁশবনে লেগেছে উত্তরোল ঝড়ো হাওয়ার সঙ্কট, কালো মেঘে মেঘে ঢেকে গেছে দিনের এতটুকু আলো। বৃষ্টিতে ভিজছে গাছের বুক ছেয়ে ওঠা গোল-মরিচের লতার ফুলগুলো। তীব্র সৌরভ ওঠে।

—তুই।

নয়ন্তী অবাক হয়ে দেখছে তৈন্দুলকে।

…টিলার থেকে নামার মুখে হঠাৎ বৃষ্টির তাড়ায় তৈন্দুল এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরই দাওয়ায়। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে ছেলেটার সারা গা, ঠাণ্ডায় কাঁপছে। ও এসেছে যেন তার কাছে এতটুকু আশ্রয়ের আশায়।

নয়ন্তী বলে—ভিতরে এসো। জলে ভিজে নেয়ে উঠেছো।

তৈন্দুল বলে—বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যাস তো আছে। কিন্তু কি গান গাইছিলে। মেয়েটা চমকে ওঠে। ও যেন একটা কি অন্যায় করে ফেলেছে। তাই ও বলে—এমনিই গানের আবার মানে কিছু আছে নাকি?

হাসছে মেয়েটা। তৈন্দুলের মনে হয় ও যেন মিথ্যা স্বপ্নই দেখে ছিল। নয়ন্তীর মনের অতলে তার জন্য কোন ঠাই নেই।

নয়ন্তী দেখছে ওকে।

তৈন্দুলের মনের অতলের সেই বেদনাটা ওর মুখে ফুটে উঠেছে। মনে হয় নয়ন্তীর এটা তারই যেন জয়ের চিহ্ন।

বৃষ্টির ধারা কমে আসছে। আবার দাওয়া থেকে দেখা যায় মেঘমুক্ত একফালি আকাশ। তৈন্দুল বলে ওঠে।

—যাই। সামনের দিন ভালো থাকলে জুম বুনতে হবে।

বের হয় ছেলেটা। তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নয়ন্তী। ওর মনে হয় হঠাৎ যেন একটা কথা তার বলা হয়নি। বলতেও চেয়েছিল মেয়েটা কিন্তু কি দুর্বলতা তার সারা মনকে ভরিয়ে দিয়েছিল। নিজের এই লজ্জাটাই তার মনে কি ব্যর্থতার সুর হয়ে গুমরে ওঠে।

হঠাৎ মায়ের ডাকে চাইল। বুড়ি গিয়েছিল ও দিকের টিলার প্রতিবেশীর বাড়ি।

মায়ের হাতে কয়েকটা বাঁশ দিয়ে বোনা ছোট্ট ঝুড়ি। মা গজগজ করে—জুমের বীজ রাখার জায়গাও নাই, তাই বৃষ্টিতে ভিজে 'তিসিং' ক'টা নিয়ে এলাম। যেদিকে না দেখবো সেখানেই গোলমাল। বাড়ির লোকটা কেমন? আর তেমনি হয়েছে মেয়েটা।

নয়ন্তী মায়ের কথার জবাব দিল না।

তিসিংগুলো তুলে নিয়ে জুম চাষের জন্য বীজগুলো তাতে আলাদা করে রাখতে থাকে।

·পাহাড়িদের কাছে ওই জুম চাষই একমাত্র করণীয় চাষ। জমি আগেই সাফ করে গাছ পুড়িয়ে ছাই মাটি মিশিয়ে তৈরী হয়ে গেছে। একফালি রোদ উঠেছে ক'দিন বৃষ্টির পর। মেঘগুলোর জমাট ভাব আর নেই। মাঝে মাঝে একফালি উজ্জ্বল ওম আনা রোদের আভা ছিটিয়ে পড়ে বৃষ্টি ধোয়া বনভূমি টিলা উপত্যকার গায়ে, বাপ্পুমাটিতে টান ধরেছে।

ওরা সারবন্দী এলাকা ভাগ করে নিয়ে টিলার গায়ে বীজ বুনছে। হাল চাষী ওরা নয়। তাতে অনেক হাঙ্গামা, চাষের বলদ চাই, হালফাল চাই। থিতু হতে হবে তাদের। এদের পূর্বপুরুষ ওসব করে নি।

....এরাও অনেকে এখনও এক টিলায় দু'সন জুম চাষ করে যা ফসল পায় তাতেই খুশী। আর তারপর সার গোবরও নেই জমিতে। জমির উর্বরাশক্তি ফুরিয়ে যেতে এরাও সেই টিলা ছেড়ে দিয়ে আবার অন্য টিলায় জুম চাষ করার চেষ্টা করে।

ফলে এলাকার পর এলাকার বন কাটা পড়েছে, টিলাগুলো বন্ধ্যা অনুর্বর রুক্ষতার প্রতীক হয়ে ওঠে। তবু এমনিভাবেই যা পায় তাই সম্বল করে এরা বাঁচার চেষ্টা করে।

...'টাকাল' ওই দা এদের চাষের একমাত্র যন্ত্র। ওই দিয়ে নরম মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে গর্ত করে চলেছে। ওই গর্তগুলোয় তারা ধান, গম, কাপাস, সরষে, কুমড়ো সবকিছু বীজ একত্রিত করে পুঁতে দিচ্ছে।

গানের সুর ওঠে।

কাজের ফাঁকে ক্লান্তি ভোলার জন্য ওরা গান গায়, টিলার এপ্রান্ত থেকে সেই গানের সুর ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

পৈরী রিয়াং এর সুরলা গলা ভেসে ওঠে।

মাই সিংসিয়ারি বাংমানি বাগয়—

যাহুন না হারয়—

সুরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। পৈরীর ঘরের মানুষটা উদয়পুর শহরে কাজ করে। সবে চাকরীতে বহাল হয়েছে নিতাই রিয়াং। পৈরী চায় নি ওই নিতাই চলে যাক এখান থেকে শহরে।

কিন্তু নিতাই রিয়াং অমরপুরে মিশনারীদের ইস্কুলে কিছুদিন পড়েছে। তাই বড় হয়ে নিতাই বলতো—এই বনে জঙ্গলে থেকে লাভ কি ?

ও চেষ্টা করতো বাইরে চলে যাবার জন্য।

আর তাই সেদিন উদয়পুরে গিয়ে চাকরীর খোঁজ পেয়ে ফিরে এসেছিল কথাটা জানাতে।

পৈরী অবাক হয় কথাটা শুনে।

—চাকরী করতে যাবি তুই ? কি চাকরী ?

নিতাই ওর দিকে চাইল। নিতাই কিছুদিন থেকে চেষ্টা করছিল এখান থেকে চলে যেতে। শহরের আলো লোকজন দোকানপশার তার চোখে নেশা ধরিয়েছে, চৌধুরীদের দু'একজনকেও সে চেনে।

...খগেন রায় এর কাছে যেতে পারে নি, কালিপ্রসাদের কাছেই যেতো এটা-সেটা নজরাণা নিয়ে। কালীপ্রসাদই শেষ অবধি সুযোগটা করে দেয়।

নিতাই প্রথমে অবাক হয় কালিপ্রসাদের কথায়।

—চাকরী করবি ? তাহলে চল। আজই।

নিতাই যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই শুধোয়।
—আজই চাকরী পেয়ে যাবো কইছেন ?

—দেখা যাইক।

উদয়পুর শহরে এর আগেও এসেছে নিতাই। গোমতীর জলধারা সহরের কোল বয়ে বয়ে চলেছে, টিলার বহু নীচে বয়ে চলেছে নদীর ধারা, ওদিকে চরভূমিতে সবুজ ফসলের ইশারা। বড় গাছের গুঁড়ি বেছে নৌকা বানানো হয়েছে, ওই নৌকায় নদী পার হয়ে

উদয়পুর সহরে পৌঁছলো যখন তখন দেখে টিলার উপর বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে সারবন্দী।

কয়েকজন লোক ওদিকে চেয়ারে বসে রয়েছে। তাদের পরণে খাঁকি পোষাক। বুকে টাকার মত চকচকে কি সব ঝোলানো, ওদিকে বসে আছে খগেনরায়, নিতাই গিয়ে লাইনে দাঁড়ালো।

ওরা বোধ হয় অপেক্ষা করছিল আরও লোকজন আসবে লাইনে, কিন্তু খুব বেশী লোকজন নেই, ওরা তখন উঠে লাইনের দিকে এগিয়ে এল। দেখছে লোকগুলোকে।

খাকি পোষাকও দিয়েছে, আর বলেছে বাড়ি থেকে দেখা করে সহরে ফিরে আসতে, ওদের চাকরী হয়ে গেছে। এখানে ব্যারাকে থাকতে হবে, খাওয়া দাওয়া পোষাক জুতো পাবে, মাস গেলে মাইনেও পাবে।

নিতাই সেই খাঁকি পোষাক পরে এসেছে। টং-এর ঘরে থেকে জুতো পরা ঠিক অভ্যাস নেই। তবু ভারি জুতোগুলো পরে টলমল করে দাঁড়ালো। অবাক হয় পৈরী।

—একি চাকরী! এসব কি পিন্দেছিস্?

—পোষাক। যুদ্ধের চাকরী হয়ে গেল। বন্দুকও দেবে কইছে।

চমকে ওঠে পৈরী। শুনেছে সে যুদ্ধের কথা। অনেক লোক সেখানে মরে যায়। বন্দুকের গুলি গোলা চলে। আর তার লোকটা কিনা সেই কাজে যাবে।

নিতাই বলে—খগেন রায় মশাই বলেছেন সবাইকে, আরও অনেক লোক চাই। এখানের লোকজনদেরও নিয়ে যাবো।

পৈরী বলে ওঠে—দরকার নাই এমন চাকরীতে। তুই যাবি নাই, যেতে দিব নাই তোকে! গোমতী মায়ের কিরা!

…নিতাই এর মনে নোতুন এক সুর উঠেছে। ওর কাছে এই অন্ধকার ঝুপড়ির টান, ওই পৈরীর নেশাও আজ ফিকে হয়ে এসেছে।

তাই যেন এমান রাতের অপেক্ষায় ছিল নিতাই।

পৈরী ওদিকে ছ্যাং গিলে ঘুমুচ্ছে, ওর হুঁস জ্ঞান নেই। সকালে মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গে পৈরীর। জুমে যেতে হবে। গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে। পাহারা দিতে হবে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে ওদিকের মাচানটা খালি, নিতাই নেই। ভেবেছে নীচের ছড়ায় গেছে হাতমুখ ধুতে, এখুনি ফিরবে। কিন্তু বেলা হতেও ফেরে না। নিতাই এর সেই প্যাণ্ট জামাও নেই।

মেয়েটা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

···অনেকেই এসে পড়েছে। হান্দাই, মুকুন্দ রিয়াংও এসে পড়ে। পৈরী কাঁদছে শূন্য ঘরে। নয়ন্তীও এসেছে। ততক্ষণে খবর চলে যায় হাজাছড়া, লক্ষ্মীছড়া তুইছার বুহার এদিকের বেশ কয়েকজন জোয়ানকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কান্তরায়ও কান্নাকাটি শুনে এসেছে। নিতাই কোথায় যেতে পারে সেই কথাই হচ্ছে।

বুড়ো রামাই বলে—গুণীনকে ডাক। গুণে গেঁথে দেখতে হবে জোয়ানগুলো গেল কোথায়?

খবরটা আনে তাইন্দা রিয়াং। উদয়পুরে চলেছে অনেক জোয়ান। যুদ্ধের জন্য চাকরী হবে তারই আশায়।

কান্তরায় অবাক হয়—দলে দলে এমনি করে মরতে যাবেক তাইন্দা রিয়াং, আর মাতব্বর হয়ে তুমি দেখবা?

তাইন্দাও কথাটা জেনেছে। খগেনরায় নাকি সারা এলাকায় এমনি করে জোয়ান ছেলে খুঁজে ফিরছে। লোকজন ধরে ধরে নাহয় নানা কথা বলে নিয়ে চলছে।

তাইন্দাও ভেবেছে কথাটা। তাই বলে—

এই মরতে যেতে দিতে আমিও চাই নাই কান্তরায়। বগাফার মরদদের কতো বুঝালাম, তা কালিপ্রসাদ বলে আমাকেও নাকি সদরে ধরে নিই যাবে। আমি মহারাজার হুকুম মানছি নাই।

কান্তরায় দেখেছেও পৈরীকে। তাদের বসতির অবন্দী বুড়ির একমাত্র ছেলেটা চলে গেছে। অন্ধ বিষনের একমাত্র অবলম্বন তার ছেলেটাও পালিয়েছে।

কান্তরায় শুনেছে বার্মার যুদ্ধের কথা, সেখানে বোমার ঘায়ে সহর গ্রাম জ্বলে উঠেছে। লোক-সৈন্যসামন্ত মরেছে হাজার হাজার। সেই জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠাবে এদের।

তাই কান্তরায় বলে এর বিহিত করতেই হবে তাইন্দা, দরকার হয় চলো—সব রিয়াং বসতি মিশে আমাদের রায়কাঞ্চন দেবীসিং-এর কাছেই চলো। এমনি করে সব হারাবে আমাদের, ধন ধান সব গেছে, এবার যাবে তাজা ছেইলা গুলোন?

সমস্যাটা কঠিন, জটিল। আর সব বসতিতেই যেন খগেন রায়ের একটা চক্রান্ত চলেছে। ওরা তাই এর বিহিত করবেই।

টিকারায় ঘা পড়েছে, এ তাদের পুরোনো সংকেত। অন্ধকার এ টিলা ও টিলায় মশালের আগুণ জ্বলছে। ওরা আজ রায়কাঞ্চন-এর কাছে চলেছে এই বিরাট একটা বাধাকে মোকাবিলা করার জন্য।

বৃদ্ধ দেবীসিংও শুনেছে সবকথা। শুনেছে রিয়াংদের উপর চৌকিদারী ট্যাক্স, পুজোর চাঁদা—বাসি পুজোর চাঁদার জুলুম, তাদের দলে দলে বেগার দেবার জন্য ধরে নিয়ে যায় খগেন রায়, তীর্থ চৌধুরী, বিনয় চৌধুরীর লোকজন।

এবার তারা অন্যদিকে আক্রমণ করেছে তাদের। বসতির বাইরে বিরাট একটা পিপুল গাছের নীচে ওদের বৈঠক বসেছে। মুকুন্দ বলে ওঠে।

—এর বিহিত করতেই হবে রায়কাঞ্চন। আমাদের সব যাবে, আর বসে বসে দেখবো?

উত্তেজিত জনতার এতদিনের রোষ যেন ফেটে পড়ে। সমবেত

অর্ধনগ্ন লোকগুলোর মুখে কাঠিন্যের ছায়া—কঠিনতর হয়ে উঠেছে মশালের লালাভ আলোয়।

দেবীসিং বলে—আমি এর কি করতে পারি?

মুকুন্দ বলে—তুমি আমাদের 'রায়কাঞ্চন', খগেনকে আমরা মানি না। ও আমাদের কেউ নয়। গরীবের দুঃখ বুঝবে না ওরা।

দেবীসিং আজ বৃদ্ধ স্থবির। তাই তার সেই জোর হারিয়ে গেছে। অতীতের সেই বিরাট শক্তিমান পুরুষটা যেন মিইয়ে গেছে। আজ সে জীর্ণ, যেন বজ্রাহত বনস্পতির শূন্যতা তার দেহে মনে। দেবীসিং বলে—

ওদের ওভাবে কিছুই করতে পারি না। ওরা আমার কথা শুনবে?

তাইন্দা রিয়াং দেখছে দেবীসিংকে।

ও দিকে বসেছিল শক্তি রায় রিয়াং, সেও এসেছে তার অঞ্চলের লোকজনদের নিয়ে, রায় কাঞ্চনের হুকুম জানতে।

কিন্তু এখানে এসে হতাশ হয়েছে শক্তি রায়। তার দেহের ধমনীতে প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। সে জানে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে, তাই গর্জে ওঠে শক্তি রায়।

—তুমি হুকুম দাও রায়কাঞ্চন, সে হুকুম মানাবার ভার নোব আমরা। দরকার হলে ওই খগেন রায়, চৌধুরীদের সব ক'টাকে তোমার কাছে ধরে আনবো। তুমি বিচার করবে ওদের। জান কবুল—

তাইন্দা রায় বিচক্ষণ লোক। ও দেখছে ওই শক্তি রায়কে।

উত্তেজিত জনতা কি বিজয়ের উল্লাসে গর্জে ওঠে।

—হুকুম দাও রায়কাঞ্চন।

তাইন্দা রায়ই পরিস্থিতিটা সামলায়। ও বলে।

—রায়কাঞ্চনকে এবার সমস্যা মোকাবিলার জন্য ভাবতে সময় দাও তোমরা। কি বল কান্ত রায়? মুকুন্দ?

দেবী সিং-এর সামনে কোন পথই যেন নেই। সেও ভাবছে,

সামনে ওই বুভুক্ষু অত্যাচারিত জনতা, তারা আজ যেন ফেটে পড়তে চায়। কিন্তু আজকের বৃদ্ধ এই বিরাট শক্তিকে ভয় করে, তাই স্তব্ধ হয়ে ভাবছে সে।

খবরটা কালিপ্রসাদও জানে।

খগেন রায়ের লোকজনও কিছু আছে ওই জমায়েতে। বিজয় চৌধুরী তীর্থ চৌধুরী রাজারামবাবু সকলেই এসেছে অমরপুর শহরে।

ওদেরও এই খবরটা জানা দরকার।

কালিপ্রসাদও এই সুযোগে বের হয়েছে মিতুলকে নিয়ে।

জানে আজ বসতির অনেক লোকজনই চলে গেছে রায়কাঞ্চনের ডাকে ওই জমায়েতে। টিলাগুলোয় লোকজন নেই।

তাই কালিপ্রসাদও তৈরী হয়ে চলেছে বগাফার দিকে।

বনের ধারে ছড়ার জলের ধারে এসে দাঁড়ালো টিলাগুলোয়, সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। জুমের ক্ষেতে টং ঘরে দু'একটা বাতি জ্বলছে।

নয়ন্তীও প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তাই পৈরীর স্বামী নিতাই চলে যেতে সেও সেদিন প্রথমে খুঁজেছিল তৈন্দুলকে।

তৈন্দুল জুমের ক্ষেতে কুমড়া-লতিগুলোয় ভাল বাঁশ এনে তুলছে, হঠাৎ অসময়ে নয়ন্তীকে দেখে অবাক হয়।

—তুই।

নয়ন্তীর ডাগর দুচোখে ব্যাকুলতার চিহ্ন। এদিক ওদিক খুঁজেছে সে তৈন্দুলকে কি উত্তেজনা নিয়ে।

...হঠাৎ তাই বাঁশবনের ধারে ওকে দেখে খুশীতে ওর মুখটা উল্লসে ওঠে। সেই খুশীটা চাপতে চেষ্টা করে নয়ন্তী বলে।

এখানের পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই দাঁড়ালাম। তোকে খুঁজতে যাবো।

...কেন?

দেখছে তৈন্দুল ওই বিচিত্র মেয়েটাকে।

আলোছায়ার আভায় হঠাৎ যেন অপরূপ বোধহয় নয়ন্তীকে

পাখীডাকা স্তব্ধ বনভূমিতে কোথাও জলের মৃদু গুঞ্জরণ ওঠে।

—নয়ন্তী!

নয়ন্তী চমকে ওঠে। আজ তৈন্দুল কি সাহসে ভর করে এগিয়ে আসে। ওর সারা দেহমনে যেন ঝড় উঠেছে। নয়ন্তী ও যেন এমনি একটা বলিষ্ঠতার প্রত্যাশা করেছিল তৈন্দুলের সারামনে। তৈন্দুলের ছুটো হাত ওকে যেন পিষে ফেলতে চায়।

হাপাচ্ছে মেয়েটা। ওই নিবিড় স্পর্শের অতলে যেন নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে দিতে চায় নয়ন্তী। হঠাৎ চেতনা পেয়ে, নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করে নয়ন্তী।

…ছাড়!

তৈন্দুল বলে—কেন এসেছিলি এদিকে?

নয়ন্তী বলে ওঠে—তোকে খুঁজতে! সবাই নাকি খগেন রায়ের ডাকে পালাচ্ছে। তোকেও যাতে না ধরে নে যায়—তাই খুঁজছিলাম।

নয়ন্তী আজ ওর মনের অতলের সেই ব্যাকুলতার কথাটা না জানিয়ে পারে না। হাসছে তৈন্দুল।

—পাগলী কোথাকার! তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো না নয়ন্তী।

নয়ন্তী জানে, বিশ্বাস করে তৈন্দুলকে। তাই ওর কথায় আজ সে ফিরে পায় সারামনে একটা নিবিড় প্রশান্তি।

তৈন্দুল বলে—আমরাও বসতিতে বসতিতে বলে দিচ্ছি রায়-কাঞ্চনের হুকুম, খগেন রায়-এর ডাকে যেন কেউ না যায়।

নয়ন্তী জানে তৈন্দুল গেছে সেই জমায়েতে।

বসতির এদিক থেকে টং ঘরে এসে বসেছে মেয়েটা। এসময় চাঁদনী রাতে বন থেকে বের হয়ে আসে কালেশ্বর সম্বর, বিহ্বল হরিণের পাল আর বনশূয়োর ধান-গম-এর ক্ষেতে নামে। সাবধানী চাহনি মেলে রয়েছে। হঠাৎ নীচে কার ছায়া মূর্তি দেখে চাইল।

চমকে ওঠে নয়ন্তী। মৈতুল বোধহয় ফিরেছে।

তাই কি আগ্রহ নিয়ে মেয়েটা টং ঘর থেকে নেমে এল নীচের ঝুপি বনের ধারে। এগিয়ে আসে নয়ন্তী ওর দিকে।

হঠাৎ দুটো শক্ত হাতের কঠিন নিষ্পেষণে চমকে ওঠে নয়ন্তী। একটা ধূর্ত চিতাবাঘ যেন অতর্কিতে শিকারের উপর লাফ দিয়ে পড়েছে।

নয়ন্তী চিনেছে ওই শয়তানকে।

মৈতুল এসেছিল আজ তার ওপর আঘাত হানতে। নয়ন্তীকে ও যেন পিষে ফেলবে, নয়ন্তীও হঠাৎ হাতের কাছে বাঁশের টুকরোটা পেয়ে যায়, পাহাড়ী মেয়ের দেহে শক্তির অভাব নেই, তাই মেয়েটা কঠিন হাতে বাঁশের টুকরো তুলে নিয়ে মৈতুলের মাথায় আঘাত করেছে।

একটা-দুটো আঘাতেই ছিটকে পড়ে মৈতুল, রক্ত ঝরছে।

নয়ন্তীও এই অবকাশে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে মৈতুলের রক্তাক্ত দেহটার দিকে চেয়ে দৌড়তে থাকে বসতির দিকে। রাগে অপমানে মেয়েটা কি কান্নায় ফেটে পড়ে।

…ওদের অনেকের কান্নাই এমনি অরণ্যের গভীরে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায়। বাতাসে গুমরে ওঠে অনেক বেদনার হাহাকার। আর সব ছাপিয়ে ওঠে আর এক শ্রেণীর বিজয়োল্লাস।

খগেন রায় তাই সন্ধ্যার পর দলবল নিয়ে বসেছে। কালিপ্রসাদ দলবল নিয়ে গেছে, ওরা কোন কোনদিন আনে কোনও বসতি থেকে নিরীহ মেয়েদের ধরে, রাতভোর চলে হুল্লোড়।

…এসব ব্যাপারে মৈতুল-বদনচাঁদ-এর নাম ডাক আছে। আর ওই লোকগুলোকেও দরকার খগেনবাবুদের, তাই ওদের সমর্থন করতেই হয়। বাঘের মত হিংস্র আর বনের সাপের থেকেও ওরা ক্রুর, শয়তান।

খগেনবাবু জানে আজ ওরা বের হয়েছে। লোকজনও গেছে দেবীসিং-এর জমায়েতে। এই এলাকার বহু রিয়াং আদিবাসী সমবেত হয়েছে তাদের রায়কাঞ্চন ওই বৃদ্ধ দেবীসিং এর কাছে। তাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে।

বিজয় চৌধুরী, রাজারাম, কেষ্ট চৌধুরীরদল ওদিকে বসে ছিল। রাজারাম বলে—ওরা যদি ওই 'রায়কাঞ্চনের' ব্যাপার নিয়ে গোলমাল বাধায় তাহলে তো মুস্কিলই হইব খগেনবাবু?

খগেনবাবু আজ হাতে অস্ত্র হাতিয়ার পেয়েছে। এখন ওদের বেশ চালু সময়। যুদ্ধের ব্যাপারে ফেনী, বিলোনিয়া, হবিগঞ্জ, আশুগঞ্জ, আখাউড়া, ময়নামতী চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ইংরেজ সরকার আজ রুখে দাঁড়াতে চায়, অদূরে এগিয়ে আসছে জাপানী সৈন্য। বার্মার ইংরেজ অধিকার বিপন্ন। ওরা হেরে যাচ্ছে তাই ভারতের মাটিতে ওরা শেষ চেষ্টা করবে ওই জাপানীদের বাধা দেবার জন্য। ওরা এখন মরীয়া।

তাই ত্রিপুরারাজ্যেরও ফার্মান এসেছে আদিবাসী—এখানের সাধারণ মানুষকে নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার জন্য। উদয়পুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খগেনবাবু, চৌধুরীদেরই ডাকিয়ে এই সৈন্য সংগ্রহের ভার দিয়েছেন। এখন খগেনবাবুরা রাজ্যের দরকারী লোক।

তাই সেই ক্ষমতাটার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবে এবার এরা। ধূর্ত কৌশলী খগেন রায় তাই বলে,

—এ নিয়ে ঘাবড়াবেন না বিজয়বাবু। এর পর কি করা হবে তা দেখবেন। ওই রায়কাঞ্চন আর থাকবে না। দরকার হলে রাজদরবার থেকেই ওই ব্যবস্থা নাকচ করা হবে।

—ওরা সৈন্যদলে আসবে না, সেই পরামর্শই করতে গেছে।

তীর্থহরি চৌধুরী একটু অবাক হয়।

—সে কি। সরকারের হুকুম মানবে না?

খগেন রায় একটু ভোজন বিলাসী। পান ভোজন এসবের আয়োজনও থাকে তার এখানে সম্মানিত অতিথিদের জন্য। তাই অনেকেই আসেন। হঠাৎ স্বয়ং উদয়পুর থানার বড়বাবুকে আসতে দেখে খুশী হয়। খগেনবাবুর সব মহলেই বন্ধু আছে। তাই বড়বাবুকে দেখে আপ্যায়ণ করে—আসুন। খবর টবর কিছু আছে নাকি? বসুন।

ওদের পরামর্শসভায় এবার পরবর্তী পদক্ষেপের কথাটা নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। বড়বাবুও সায় দেন

—দরকার হলে তাই করতে হবে। আমিও নজর রাখছি সবদিকে। আর আপনার লোকজন যারা এদিক ওদিকের বসতি টিলায় আছে, তাদের বলে রাখুন—ওই লোকগুলোর উপর নজর রাখতে। কান্ত রায়, মুকুন্দ, তাইন্দা রায়, দখিন মহারাণীর শিলাময় রায় এদের গতিবিধি যেন নজরে রাখে।

কুমারিয়া ওঝা ওদিকে সঙ্গতিপন্ন চাষী। ও এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার করার মত একটা কাজ পেয়েছে। তাই বলে

—ওসব ঠিক খবর পাইবেন বড়বাবু। ওগোর সব খবরই দিমু।

খগেন রায়ও ভাবছে কথাটা। বাইরের অমরপুর, ডমরু-লংথরাই অঞ্চল থেকেও বেশ কিছু লোক এসেছে। তাই বলে সে,

—বাইরের লোকজনও এসেছে অনেক। শুনেছি সেই লংতরাই থেকেও কিছু লোকজন এসেছে। ওরা জমায়েত করছে ডমরুর পাহাড়বনের দিকে।

বড়রাবুও খবর পেয়েছেন। তাই বলেন

—এসব খবরও দরকার। সব খবর পৌঁছে দেবেন।

ওই রাতের অন্ধকারে পান ভোজনের উষ্ণ পরিবেশে বসে বসে এদের কর্মপন্থাও স্থির হয়ে যায়। চৌধুরীরাও এসেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। সেখানেও তাদের প্রভাব কিছু আছে।

তাই রাজারাম বলে—আমরাও যে যা খবর পাবো পাঠাবো।

…কালিপ্রসাদ এমনিতে একটু শান্ত থাকে। সহজে মাথা গরম করে না, আর কৌশলে কাজটা হাসিল করতে চায়।

তাই মৈতুলকে পাঠিয়েছিল ওই নয়ন্তীতে ধরে আনবার জন্য। আর বাবুদের জন্য ভেট দিতে যদি পারে তাই নিজে গেছে ওই পৈরীর কাছে।

টিলার নির্জন প্রান্তে ঘরখানা, বাঁশের দেওয়াল ও জীর্ণ—সামনের আগলটাও নেই। পৈরী চুপ করে বসে আছে। কেঁদে কেঁদে সে থেমেছে আপনা থেকেই। মনের অতলে বেদনাটা তখনও যেন গুমরে ওঠে। নিতাই তাকে ফেলে চলে গেছে।

অবশ্য তাদের মধ্যে এটা এমন একটা বড় ঘটনা নয়, এমন ছোড়ছাড় ঘটেই থাকে।

ছুজনে ছুদিকে চলে যায়, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে গেলে আবার মেয়েদেরও নোতুন করে ঘর বাঁধার অধিকার সহজেই এসে যায়। পৈরীও কথাটা ভেবেছে।

তাকে বসতির খুড়পিসী ধৈত্রী রিয়াংও এমনি কথা বলেছে।

ধৈত্রী বুড়ি বলে—এত কান্না কিসের। রূপ-যৌবন আছে। ভাল ছেলেরও অভাব নাই। আবার ঘর বাধবি বল? যে গেছে গিয়া তারে যাইতে দে। এত কান্না ক্যান!

পৈরীর মনের অতলেও রাগটাই এবার ঠেলে উঠেছে। শুধু রাগ নয়। একটা তীব্র অপমানের জ্বালা ফুটে ওঠে। প্রত্যাখ্যান আর নিদারুণ অবহেলা করে গেছে তাকে নিতাই। পৈরীর আদিম বন্য রক্তে তাই এবার প্রতিবাদের জ্বালাটাই ফুটে ওঠে।

তারাজ্বলা অন্ধকারে রাতের হাওয়া কাঁপে উদাস বাঁশবনে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল পৈরী।…লোকটা এগিয়ে আসছে। চেনা চেনা মনে হয়।

কালিপ্রসাদ দেখছে মেয়েটাকে। ওর ফর্সা রংটা অন্ধকারে যেন

তাজা ফুলের মত ফুটে উঠেছে। নিটোল স্বাস্থ্য ওর যৌবনের উন্মাদনাকে প্রবলতর করে তুলেছে।

পৈরী অবাক হয় ওকে দেখে—তুমি!

কালিপ্রসাদকে এর আগে দেখেছে পৈরী সেবার সদরে গিয়ে। নিতাই ওকে ভালো করেই চেনে। কালিপ্রসাদ বলে ওঠে।

—নিতাই ব্যাটা একা চলে গেল, বলেছিলাম তোকেও নিয়ে যেতে। ওখানে দুজনে থাকবি। ঘর বাধবি। তাই ওর লজ্জা হল। এদিকে এসেছিলাম তোকে নিয়ে যেতে। চল—

পৈরী দেখছে কালিপ্রসাদকে। কালিপ্রসাদের কথাগুলো ভাবছে সে, পৈরীর মনে হয় যাবে সে। সেখানে গিয়ে নিতাইকে এর জবাব দেবে। তাই রাগটা চেপে আজ সহজভাবেই মেয়েটা রাজী হয়ে যায়। পৈরী বলে—ও আছে ওখানে?

ধূর্ত কালিপ্রসাদ জানায়—ওখানেই তো থাকবে। চল, রাত হয়ে যাচ্ছে।

পৈরী আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিতাই-এর উপর পুঞ্জীভূত রাগটা এখন প্রকাশ করতে চায় না। ওটা মুখোমুখিই প্রকাশ করবে। আর তার জন্যই মেয়েটা এক কথায় রাজী হয়ে যায়। দরজার ভাঙ্গা আগল টেনে বন্ধ করে সে বের হয়ে গেল কালি-প্রসাদের সঙ্গে অন্ধকার বনের পথে।

কালিপ্রসাদ ভাবেনি এত সহজে কাজ হাসিল হয়ে যাবে। মৈতুল তখনও ফেরেনি ছড়ার ধারে, সঙ্গের বদনচাঁদকে মৈতুলের জন্য অপেক্ষা করতে বলে কালিপ্রসাদ দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল, ওর আর এখানে অপেক্ষা করার সময় নেই।

সে জানে ওই জমায়েতফিরতি লোকগুলোর মুখোমুখি হলে বিপদেই পড়বে। তাই ধূর্ত লোকটা বের হয়ে গেল পৈরীকে নিয়ে পাহাড়ের সোজা পথ ধরে।

পৈরীর সারামনে রাগের প্রতিশোধের একটা জ্বালা ফুটে উঠেছে।

নিতাই যে এমন ব্যবহার করবে তার সঙ্গে
তাই সেও দেখিয়ে দেবে নিতাইকে এবার।

কালিপ্রসাদ এর চাষ বাড়িটা নদীর ওদিকে। ওটা আসলে তার একটা বাগানই। আশপাশে গোমতীর পলি চর পড়েছে বেশ খানিকটা জায়গায়, তারপর নদীর খাতটা ওদিকে সরে গেছে, আর পয়স্তী ওই উর্বরা জমি হাসিল করে কালিপ্রসাদ সেখানে তার দখল কায়েম করেছে।

সদর তহশীলদারকে সামান্য কিছু টাকা প্রণামী দিয়ে এবার গেড়ে বসে ওখানে একটা ঘরবাড়িও করেছে। ওদিকে সহরের বিস্তার।

এককালে গোমতীর ওপারে ছিল ত্রিপুরার রাজধানী। গোমতী নদীর পারে ছিল গভীর অরণ্যের ধারে ভূবনেশ্বরী মন্দির। সেখানে প্রতিষ্ঠিতা ছিল বিগ্রহ, তার বলিদান এর রক্তস্রোত গিয়ে মিশতো গোমতীর পুণ্য প্রবাহে।

এখানে এসেছিল মোঘল হানাদার, ত্রিপুরার মহারাজার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহও হয়েছিল। মহারাজা উদয় মাণিক্যের নামে এই উদয়পুর, এখনও শহরের আশপাশে রয়েছে বিরাট কয়েকটা দিঘী।

...সেদিনের রাজধানী আজ শহর মাত্র। এর আগে রাজধানী ছিল পর্বতবনসমাকীর্ণ অমরপুর।

মহারাজ অমর মাণিক্য দেব সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে অমরপুরে রাজধানী করেছিলেন। সেখান থেকে রাজধানী স্থাপিত হয় উদয়পুর, তারপরে আসেন রাজবংশ বর্তমান আগরতলার ছ'মাইল দূরে। এখনও চতুর্দশ দেবতার মন্দির সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। তার পরবর্তী কালে বর্তমান আগরতলা শহরেই রাজধানী স্থাপিত হয়।

উদয়পুর তবু এখনও জমজমাট। কালিপ্রসাদ তাই এখানে ওই বিরাট ক্ষেত জমি নিয়ে চাষবাস ফেঁদে বসেছে। ধান জমিরও অভাব নেই।

হয়ে দেখছে এই জমিগুলোকে

তাদের টিলার জুম চাষের দৈন্য এখানে নেই। সমতল সবুজ ক্ষেতে ধান-গম-আলু-বেগুন-নানা সব্জী হয়ে রয়েছে। কয়েকজন মজুরও কাজ করছে।

কালিপ্রসাদ পৈরীকে এনে তুলেছে ছোট বাড়িটায়। ও বলে।

—এইখানে থাকবি। তোর কাজকর্ম দেখাশোনা করে দেবে এই বুড়ি। আর কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওসব বদলে ফেল। পৈরী অবাক হয়। রাতারাতি যেন তার দাম বেড়ে গেছে।

শাড়ি-জামা এসে গেছে। তাকে আর দেশী তাঁতের মোটা বিবর্ণ, পাছড়া, চেলি পরতে হবে না।

শোবার জন্য বিছানাও এসে গেছে। বেশ গদি মত বিছানা।

পৈরীও মনে মনে যেন বদলে যাচ্ছে।

কালিপ্রসাদও দেখছে সেটা। কালিপ্রসাদ ইচ্ছে করেই নিতাই-এর খবর জানায় না, আর দেখেছে সে মেয়েটাও ওসব কথা তুললো না।

কালিপ্রসাদ মনে মনে খুশী হয়েছে।

তাই বেশ গদগদ স্বরে শুধায়—কোন অসুবিধা হয় নি তো পৈরী?

পৈরী দেখছে লোকটাকে। মেয়েটা বুঝেছে যে এখানে ওর প্রতাপ অনেক, তাছাড়া দেখেছে পৈরী—পালাবার উপায়ও নেই তার, এখান থেকে পালানো মুস্কিল। ওই বুড়িটা আরও দু'চারজন লোক তাকে নজরে রেখেছে। আর তারাই যে এখানেই নিতাইকে আসতে দেবে না এটাও বুঝেছে। এখান থেকে বের হবার উপায় তাকেই ভাবতে হবে। সেই মানসিক অবস্থার কথা চেপে রেখে পৈরী বলে—না, না! এতো আরাম বসতিতেও পাই নি।

হাসছে কালিপ্রসাদ, মনে মনে খুশী হয়েছে ওর কথায়। দেখছে সে মেয়েটাকে লুব্ধ চাহনি মেলে। শাড়ি পরে মেয়েটা যেন বদলে গেছে। ওর দেহের রেখাগুলো আরও সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

কালিপ্রসাদ বলে—তোকে রাজরাণী করে রাখবো পৈরী।

পৈরীর মনের জ্বালাটা ও জানে না। মেয়েটা ওকে দেখছে।

…হঠাৎ কার ডাক শুনে বিরক্ত হয়ে চাইল কালিপ্রসাদ। দরজার ওদিকে এসে হাজির হয়েছে বদন চাঁদ। হাঁপাচ্ছে সে নিবিড় উত্তেজনায়।

—কালিবাবু, রায় মশায় এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন। খুব জরুরী দরকার।

—এখুনি যেতে হবে? কালিপ্রসাদ একটু যেন বিরক্ত হয়।

বদন বলে চুপিচুপি—সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে, ওই মৈতুল রিয়াংকে হাজাছড়ায় কারা চোট করেছে। রায় মশায় ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে আপনাকে ডেকে পাঠালেন।

চমকে ওঠে পৈরী।

মৈতুলকে সেও চেনে। হাজাছড়া তাদেরই বসতি। পৈরী খবরটা শুনে অবাক হয়। কালিপ্রসাদ জানে মিতুল কোথায় গিয়েছিল, আর সেখানেই তাকে কেউ চোট করেছে।

এত বড় খবরটা শুনে কালিপ্রসাদও একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ওর প্রেমালাপ মাথায় উঠে যায়। গর্জাচ্ছে কালিপ্রসাদ।

—এত বড় সাহস ওদের! চল দেখি!

পৈরীর দিকে চাইবার সময় তার নেই। কালিপ্রসাদ এ প্রসঙ্গ আপাততঃ মুলতুবি রেখে দৌড়ল চোট খাওয়া বাঘের মত হিংস্রতা আর জ্বালা নিয়ে। এই তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা বিরাট শক্তি যেন বনপাহাড়ে জন্ম নিয়েছে এটা আজ সেও বুঝেছে।

-

খগেন রায়ও বুঝেছে এই কঠিন সত্যটা।

বিজয় চৌধুরী রাজারামবাবু, তীর্থবাবুও সেই সকালেই দেখেছে, ওরা মৈতুলের রক্তাক্ত অর্ধমৃত দেহটাকে বাঁশের ডুলিতে তুলে এনেছে। কথা কইবার সামর্থ তার নেই।

ওরাও সঙ্গে না যাক—মৈতুলের খবর জানে। খগেন রায় এবার হাতে পেয়ে গেছে।

কোতোয়ালীর বড়বাবুও হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন, তিনিই বলেন —এসব ওই লোকগুলোরই কাজ। নাম করুন খগেনবাবু, এক ঐকটাকে পিছমোড়া কইরা বাইন্ধা আনুম !

খগেন রায় ঠাণ্ডা মাথায় সব জেনেছে। তাই বলে সে থানার বড়বাবুকে।

—কেসটা ডাইরী করে রাখুন। আর মিতুল কিছু বলতে পারলে একটা জবানবন্দী নিয়ে নেবেন। ওর মুখ থেকে খবর পেলে তবে আসামীকে ধরা যাবে, নাহলে শুধু শুধু গরীবদের হয়রানি করবেন না বড়বাবু।

খগেন রায় গরীবদের জন্য আজ বেশ দরদী হয়ে ওঠে।

…তাই একটু পরেই জবানবন্দীও তৈরী হয়ে যায়, কালিপ্রসাদ মিতুল, বদনচাঁদ গেছল ওই এলাকায়, সেখানের লোকজন যাতে রক্ষীবাহিনীতে আসে তারই প্রচার করতে, এমন সময় কান্ত রায়, মুকুন্দ, তাইন্দা রায় আরও অনেকে তাদের যা তা বলে। তাদের কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে চলে যেতে বলে, ওরা ফিরে এসেছিল হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে কারা তাদের উপর হামলা করেছে জঙ্গলের মধ্যে।

কালিপ্রসাদ, বদন বের হয়ে আসতে পেরেছিল, আর আক্রমণকারীরা মৈতুলকে ওইভাবে জখম করেছে।

খবরটা উদয়পুর ছাড়িয়ে অন্যান্য জায়গায় মায় সদর আগরতলায় অবধি পৌঁছে গেছে।

…ওই তাইন্দা রায়, মুকুন্দ, কান্ত রায় এই রিয়াংরা কেউই এসব খবর জানে না।

ওরা সেই রাতে রায়কাঞ্চনের বসতিতেই রয়েছে।

চুপ করে একটা আধপোড়া গুঁড়ির ধারে বসে আছে তাইন্দা রায়, কান্ত রায়, শক্তি রায় রিয়াং, তৈন্দুলও চুপ করে বসে আছে।

কান্ত রায়ের কথাগুলো চুপ করে শুনছে শক্তি রায়।

কান্ত রায় বলে—এ করে কিছু হবে না তাইন্দা। অন্য পথ দেখতে হবে।

শক্তি রায় এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার রক্তে যেন মাতন ধরে আছে। সে আশা করেছিল 'রায়কাঞ্চন' একটা কঠিন বিধানই দেবে।

কিন্তু কোন পথের নির্দেশই পায় নি তারা, প্রতিবাদ করার কোন পথ যেন তাদের নেই। তাই বলে ওঠে শক্তি রায়।

—পথ একটাই আছে রায়জী, ওই শয়তানের চেলাগুলোকে ধরে ধরে শেষ করা।

হান্দাই রায় বলে—তাতে কিছু হবে না শক্তি রায়। ওদের দলবলও কম নয়, ওরা থানা পুলিশকেও নিয়ে আসবে। রাজ দরবারেও যাবে। তখন?

—তাই বলে চুপ করে সইতে হবে? এতবড় অন্যায়ের, পাপের বিচার হবে না?

মুকুন্দ রায়ও কথাটা ভাবছে।

হঠাৎ অন্ধকারে কাদের পায়ের শব্দ শুনে চাইল কান্ত রায়। আবছা আগুনের আভায় দেখেছে কান্ত রায় তারই প্রতিবেশী বসরোকে। বুড়ো দীর্ঘ কয়েক ক্রোশ বনপাহাড় পাড়ি দিয়ে খবরটা এনেছে।

...বসরো বলে ওঠে—বসতিতে খগেন রায়ের দলবল এসে খুঁজছে তোমাদের। কাল রাতে পৈরীকে কারা তুলে নিয়ে চলে গেছে, আর জুমের টং ঘরে পাহারায় ছিল নয়ন্তী, ওকে বোধহয় কারা ধরতে এসেছিল, মিতুলও সঙ্গে ছিল। মিতুলকে প্রায় শেষ

করে দিয়েছে কেউ। তাই খগেন রায় আজ সকালেই দল নিয়ে তোমাদের খুঁজতে এসেছিল। থানায় ধরে নিয়ে যাবে।

…চমকে ওঠে কান্ত রায়। তৈন্দুল রিয়াংও এগিয়ে আসে।

—বসতিতে এইসব কাণ্ড ঘটবে কান্ত কাকা? খাজনা, চাঁদা সব বাড়বে। শান্তিতে বাস করতে পাবো না। সব কেড়ে নেবে ওরা?

ওদের দলে নাম লেখাতে হবে। নাহলে জোর করে ঘর থেকে মেয়েদেরও তুলে নিয়ে যাবে?

শক্তি রায় গর্জে ওঠে—ইজ্জৎ নেবে, তবু ওদের কিছু করতে পারবো না?

কে একজন বলে—রায়কাঞ্চন-এর বিচারটা শুনি।

অন্ধকারে তৈন্দুলও আজ যেন গর্জে ওঠে—এর বিচার করবো আমরাই।

কান্ত রায় সব ভেবেছে। ওর মাথা অনেক ঠাণ্ডা। সে সহজে উত্তেজিত হয়ে শক্তিমান প্রতিপক্ষকে চটাতে চায় না। তাই তৈন্দুলের কথায় ধমকে ওঠে—ওসব কথা থাক।

—তাহলে কার কথা শুনবে তোমরা? শক্তি রায় আজ প্রশ্ন করে।

রামজয় দেখেছিল প্রথম থেকেই সব ব্যাপারটা। সে কারবারী লোক, ঠাণ্ডা মাথায় হিসাব করতে পারে রামজয়। ওর একমাত্র ছেলে মারা যাবার পর থেকেই রামজয় রিয়াং তার আশপাশের গরীবদের সঙ্গেই মিশে গেছে। আর রোজ রতনমণির আশ্রমে যায়। ওই নামকীর্তন আর নাম জপের মধ্যে রামজয় যেন তার মনের জ্বালাটাকে ভুলতে পারে।

রতনমণি বলেন—নাম জপ এর মধ্যেই শান্তি পাবে রামজয়। রামজয় বলে—কাজ কর্ম আর ভালো লাগে না গুরুদেব। রতনমণি হাসেন। বলেন তিনি।

—নিজের জন্য এতকাল খেটেছো? এবার সকলের জন্য কাজ

করো রামজয়। তোমার অর্জিত সম্পদে তবু পাঁচজনের কল্যাণ হোক। তোমাকে কাজ করতেই হবে।

রামজয় ব্যবসা করছে, তার ব্যবসা আজ পুরোদমে চলেছে। আর লাভ এর সবটা জমা হয় আশ্রমের তহবিলে।

রতনমণি বলেন—একি করছো রামজয়?

রামজয় এতেই শান্তি পায়। তাই বলে সে।

—গীতার উপদেশের কথা আপনি বলেছিলেন, পাপী মানুষ। তবু সেকথাটা ভুলিনি, এই নিষ্কাম সেবাটুকু করতে দিন আমায়।

রামজয় তবু এসেছিল এখানে। সেও দেখছে এদের দুঃখ কষ্ট, ভেবেছিল হয়তো রায়কাঞ্চন দেবীসিং খগেন রায়দের ডাকিয়ে ওই অভিযোগের বিচার করবে। কিন্তু তা হয়নি।

ওরা হতাশার অন্ধকারে বসে কি ব্যর্থ আক্রোশে গুমরে ওঠে। সামনে বাঁচার কোন পথ নেই। হঠাৎ কথাটা মনে হয় রামজয়ের। ও বলে ওঠে।

—একটা মানুষ হয়তো পথ দেখাতে পারে কান্তরায়? তাঁর কাছে গেলে একটা বিহিত হবেই।

সকলেই উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে শুধোয়—কার কাছে? সেই লোকটি কে?

রামজয় ওদের স্তব্ধতার মাঝে বলে ওঠে তার নাম।

—সাধু রতনমণির কাছে চলো, ওঁর আশ্রমে। একটা বিহিত হবেই।

কান্তরায়, মুকুন্দ, হান্দাই রায় সকলেই যেন অন্ধকারে আলোর রোশনী দেখতে পায়। ওদের একবারও তার কথা মনে পড়ে নি। সব বিপদে আপদে তিনি এসেছেন তাদের কাছে।

তবু কান্তরায় বলে ওঠে—তিনি তো সাধু মানুষ।

তাইন্দা রায়ও ভেবেছে কথাটা। রতনমণি একটি সৎ লোক। সারা অঞ্চলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পাত্র। হয়তো তিনি পারবেন একটা পথ দেখাতে। তাইন্দাও সায় দেয়।

—তা মন্দ বলোনি রামজয়। একবার তাঁর পরামর্শও চাই।

শক্তি রায় এসব শুনে খুশী হয় নি। তবু দেখেছে সে রতনমণিকে সেদিন তীর্থমুখে। একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তাই বলে সে—ঠিক আছে। চল তার কাছে। তবে আমার এককথা, নখের বদলা দাঁত। তবু বলছো—চলো। যাবো।

রাতের অন্ধকারে ওই মানুষগুলোর পিছনে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটা জটলার মধ্যে একজন মানুষ চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ওদের কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ সকলের নজর এড়িয়ে সে বের হয়ে এল, একটু মাঠ পার হয়ে লোকটা রাতের অন্ধকারে বনের গভীরে ঢুকে হারিয়ে গেল। লোকটা বদনচাঁদ, খগেন রায়ের বিশ্বস্ত অনুচর। সে এদের আলোচনাটা শুনেই খবরটা নিয়ে রাতের অন্ধকারে পাড়ি দিয়েছে উদয়পুরের দিকে।

সবুজ বনের সীমানাঘেরা টিলাটাকে ওরা পরিষ্কার করে ছবির মত সাজিয়েছে। খুশীকৃষ্ণ, গোলাকৃষ্ণ এখানেই ঘরবসত গড়ে তুলেছে, কয়েকটা কাঁঠাল গাছে এসেছে তাজা ফুলের কুঁড়ি, ওদের উদগ্র সৌরভ মিশেছে বাতাসে। নাগেশ্বর ফুলের দীর্ঘ গাছগুলো মন্দিরের চূড়ার মত উঠে গেছে ছোট সাদা ফুলের বাহার নিয়ে, বাতাস আমস্থর হয়ে উঠেছে ওর মিষ্টি গন্ধে।

ওদিকে বাঁশের তৈরী কয়েকটা কুটির, সামনে মন্দির। বাগানে গাঁদা, জিনিয়া ফুলগুলো জায়গাটাতে এনেছে তপোবনের মাধুর্য। একটা ছড়া তরতরে জলধারা নিয়ে বয়ে চলেছে, আশপাশের জমিতে ধানের সবুজ স্পর্শজাল। রামজয় ওই জমিগুলো আশ্রমকে দান করেছে।

রতনমণির আশ্রমে নেমেছে বৈকালের ছায়া ছায়া ভাব। খুশী-কৃষ্ণের কাজের শেষ নেই। মন্দিরের দেবতাকে ঘিরে তার সারা-দিনের কাজের চাপ, আর অবসর সময়ে গান বাঁধে খুশীকৃষ্ণ।

রতনমণিও দেখছেন বিচিত্র ওই মানুষটিকে।

খুশীকৃষ্ণ গুণগুণ করে নাম গান করছে, নিজেরই রচিত এসব পদ। সুরেলা গলায় আশ্রমের পাখীডাকা পরিবেশে ওই গান যেন সজীব হয়ে ওঠে।

হরি নাম হরি নাম।
প্রথম খুলুমই রিংখা জয় সীতারাম,
সীতা সতী স্বয়ং লক্ষ্মীই সংসোরণি প্রাণ,
সাকনি বাদে আর করই সাগ হরি নাম;
বাসাক-নদে নানানি সাগ যত নাম।

ওদের রিয়াং ভাষায় রচিত পদের অর্থও পরিষ্কার।

হরিনাম হরিনাম।
শেষ প্রণাম জানিয়ে ডাক দেয়—জয় সীতারাম।
সীতা সতী, স্বয়ং লক্ষ্মী, এই সংসারের প্রাণ,
দেহ ছাড়া আর কিছুই নেই
দেহের ভিতর হরিনাম,
দেহকে জানতে হয়, দেহে যত নাম"।

রতনমণির ভালো লাগে খুশীকৃষ্ণকে। ওর সাধনায় আলস্য নেই সব অনুভূতি সুর হয়ে ফুটে ওঠে।

হঠাৎ বনের বাইরে সারবন্দী মানুষগুলোকে আসতে দেখে সেদিকে চাইলেন রতনমণি। সামনে তার একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এবার জুম চাষে তেমন ফসল ফলেনি, তাই এই এলাকার চারিদিকেই সুরু হয়েছে হাহাকার।

ধনী চৌধুরীদের ঘরে গেছে যা কিছু সঞ্চিত ধান-গম মকাই। ওই গরীব মানুষগুলো বনে জঙ্গলে কন্দমূলের সন্ধানে ঘুরছে। তাই কথাটা ভেবেছেন রতনমণি, এদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকার জন্যই যেন এই দারিদ্র, আরও ঘনিষ্ঠতর হতে হবে এদের। আর নৈতিক

চেতনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি মানবিকাবোধ এদের মনে।

তবেই এই হৃতদরিদ্র হাজারো মানুষ বাঁচার আশ্বাস পাবে। তাই তিনি বেছে নিয়েছেন এই নৈতিক উন্নয়নের পথ। নব চেতনার পথকে।

দূর দূরান্তরের গ্রামের গরীব মানুষের কাছে যান সেবার মন্ত্র নিয়ে, বাঁচার মন্ত্র নিয়ে। ওদের দীক্ষা দেন নব মন্ত্রে।

—ওঁ প্রাণারাম। এই মন্ত্র জপের মধ্যে বহু মানুষ যেন নিজের মনের অতলের সুপ্ত শক্তিকে ফিরে পায়, খুঁজে পায় একটি আশ্বাস। দিগ দিগন্তে তাই তার নামও ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ওই ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষগুলোকে এখানে আসতে দেখে চাইলেন তিনি। গোলাকৃষ্ণ বলে—এসো মুকুন্দ, তাইন্দা রিয়াং, হাউন্দা, লংতরাই এর শক্তি রায়, বগফার কান্তরায়, ভিড়ের মধ্যে রামজয়কে দেখে খুশীকৃষ্ণ বলে—আরে গোঁসাইদাদাও রয়েছে দেখছি। ব্যাপারটা কি গো?

ক্লান্ত অসহায় মানুষগুলো ওই টিলার চড়াই ভেঙ্গে এসে কাঁঠাল বাগানের নীচে, নাগেশ্বর গাছের তলে মাটিতে বসে পড়ে। ওদের মুখচোখ শুক্‌নো—কি যেন হতাশার ছায়া জমেছে ওদের মুখে।

কান্তরায় বলে ওঠে—তোমার চরণেই এলাম ঠাকুরবাবা, আর কোন পথ পেলাম না।

রতনমণি বলেন—তোমরা বিশ্রাম করো, খাওয়া দাওয়াও বোধহয় হয় নি। কিছু মুখে দিয়ে শান্ত হও। আজ রাতে কথাবার্তা হবে।

তাইন্দা রিয়াং-এর কথা বলার মত অবস্থা নেই। সেও জানায়। —তাই ভালো। ঠাণ্ডা মাথায় আলোচনা করতে হবে এসব ব্যাপার।

রতনমণি হাসলেন—কি এমন গুরুতর ব্যাপার হে তাইন্দা যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বলতে হবে? তোমার কিন্তু মাথা গরমই হয়ে আছে।

শক্তি রায় দেখছিল লোকটিকে, হঠাৎ ওর কাছে এসেই রতনমণি

বলে ওঠেন কথাটা। চমকে ওঠে শক্তি রায়। ওর মনের তখন আগুন জ্বলে চলেছে, আর ওই মানুষটি যে সেই খবরটা জেনে ফেলেছে এটা লুকোবার সাধ্য তার নেই।

শক্তি রায় ওর দিকে চাইল। রতনমণি দেখছেন বলিষ্ঠ সতেজ ওই রিয়াং ছেলেটিকে। ওর মনের জ্বালার খবরটা তাঁর অজানা নেই।

রতনমণি শান্ত কণ্ঠে বলেন—জ্বালাটাই বড় কথা নয় বাবা, সেই সঙ্গে মুক্তির পথও সন্ধান করতে হবে, তার জন্য চাই সাধনা ত্যাগ। ওই পঞ্চইন্দ্রিয়কেও বশে আনতে হবে। ক্রোধ-হিংসা এগুলোকেও। তা নাম কি তোমার বাবা?

শক্তি রায়ের সব জ্বালা যেন ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে। ওর শান্ত মধুর হাসিটুকু তার কাছে বিচিত্র ঠেকে। মনে হয় রতনমণি যেন একটি অভয় মন্ত্রের সন্ধান জানেন, যিনি পারবেন সত্যকার পথ নির্দেশ দিতে। শক্তি রায়ের এই প্রথম উদ্ধত শির নুইয়ে আসে। সে আজ দীর্ঘদিন পর প্রথম প্রণাম জানায় একটি মানুষকে ভূমিষ্ঠ হয়ে ওর পায়ে মাথা রেখে।

রতনমণি ওকে দু'হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেন,

—বিপদে ঘাবড়াবি কেন? শান্ত হয়ে বস। নাম কি তোর?

শক্তি রায় নামটা জানায় অশ্রুভিজে কণ্ঠে।

রতনমণি বলেন—স্নান করে এসো তোমরা। গোলাকৃষ্ণ খিচুড়ি বানাও, ওই দিয়েই রাতের প্রসাদ হবে আজ। জয় গুরু!

সমবেত জনতা ওই মন্ত্র উচ্চারণ করে—জয় গুরু!...

আশ্রমের ছায়াঘন পরিবেশে দিনশেষের ম্লান অন্ধকার নামে, আকাশে ফুটে উঠেছে দু'একটি তারার ভীরু চাহনি।

রাত্রি নেমেছে তউখম্ আশ্রমের টিলায় চারিদিকের অরণ্য প্রদেশে। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যায়। কয়েকটি হ্যারিকেনের

ম্লান আলোর আভা মানুষগুলোর মুখে চোখে পড়েছে। উত্তেজিত হয়ে আছে ওদের সকলেই।

কান্ত রায় বলে—তুমিই পথ দেখাও ঠাকুর।

শক্তি রায় চুপ করে কি ভাবছে। আজ সবকিছু যেন তার কাছে বিচিত্র একটা অর্থ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

রতনমণি সবই শুনেছেন, দেখেছেন ওই মানুষগুলোকে।

প্রথমে তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, মানুষের মনের মধ্যে তিনি একটা নতুন চেতনা আনতে চেয়েছিলেন মাত্র। রাজনীতি-বিদ্রোহ এসব তাঁর কাছে বড় নয়।

তাই বলেন তিনি—মানবিকতার বিকাশ, মানুষের সেবা করাই আমার ধর্ম তাইন্দা রায়, এসব গোলমালে আমাকে টেনো না।

তাইন্দা রায় বলে ওঠে—মানুষকে সঠিক পথ দেখাবে, তাদের দুঃখ বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াবে না রতনমণি? তাহলে আমরা যাবো কার কাছে? কে আমাদের পথ দেখাবে?

ওই অসহায় আর্তি ওদের সকলের কণ্ঠে ফুটে উঠেছে।

শক্তি রায় বলে—তাহলে আমরা পাথরে মাথা খুঁড়েই মরবো? আমাদের বুদ্ধিতে বলে—লড়াই। তাই করবো আমরা। তাতে শেষ হয়ে যাই—যাবো।

চমকে ওঠেন রতনমণি—না। এ আত্মহত্যার সামিল শক্তিরায়, তাতে শুধু বৃথা রক্তক্ষয় আর সর্বনাশই হবে।

—এছাড়া পথ আর দেখছি না ঠাকুর। শক্তি রায় ক্লান্তস্বরে বলে ওঠে।

—পথ! পথের সন্ধান জানেন না রতনমণি। তবু ভাবছেন কথাটা।

কান্ত রায় বলে—একটা কিছু করো, কিছু বলো ঠাকুর।

কি জবাব দেবেন জানেন না রতনমণি।

খুশীকৃষ্ণ চুপকরে বসে আছে। ওর প্রথম থেকেই এই গোলমাল ভালো লাগেনি। ও জানে এই সবে সুরু এরপর আরও সমস্যা

বাড়বে। সে চায় নিরিবিলিতে সাধন-ভোজন করতে, আর দেহতত্ত্বের গান বাঁধতে। এসব ঝামেলাতে ঠাকুর মাথা দেন এ চায়নি সে। তাই রতনমণিকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বরং খুশীই হয়েছে।

ভাইন্দা বলে ওঠে—তাহলে আমাদের বিপদে তুমি পরামর্শ দেবে না, কোন সাহায্য করবে না ঠাকুর?

—আমাকে ক্ষমা করো তোমরা। রতনমণি বলবার চেষ্টা করেন।

—এ পথ আমার পথ নয়। আমি সংসার ত্যাগী সাধু—আমাকে রাজনীতির মধ্যে কেন ডাকছো?

শক্তি রায় বলে ওঠে—তাহলে আমাদের বুদ্ধিতে যা কুলোয় সেই ভাবেই প্রতিবাদ করবো। তাতে যা হয় হবে। খগেন রায় আর ওদের দলের সব কটাকে ধরে এনে বলি দোব।

রতনমণি দেখছেন ওই মানুষগুলোকে। ওদের চোখে কি হিংস্র সর্বনাশের জ্বালা ফুটে ওঠে। সামগ্রিক বিপর্যয়ের ভীষণ ছবিটা তিনি যেন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বলেন রতনমণি।

—না! এ হতে পারে না।

ভাইন্দা বলে—কি হতে পারে বলো? তুমি যা বলবে তাই করবো। তোমার নির্দেশই সবচেয়ে বড়।

রতনমণি দেখছেন ওদের। তার কাছে আজ একটা সমস্যা বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে। এদের মাঝে সেই সভ্যজাগর শক্তিটাকে নিয়ে তিনি কিছু গড়তে চান। একটি নতুন চেতনাকে বৃহত্তর কল্যাণের কাজে লাগাতে চান।

এভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে দিতে পারেন না। এইটাই যেন তাঁর কাছে একটা কর্তব্যের নির্দেশ হয়ে উঠেছে। চমকে ওঠেন তিনি।

এ যেন তাঁর অন্তর দেবতারই নির্দেশ!

রতনমণি ভাবছেন, কানে আসে কি দিগন্তব্যাপী উত্তাল একটি আলোড়নের শব্দ। সেই বিরাট কলকল্লোল ছাপিয়ে ভেসে আসে একটি বাণী, এগিয়ে চলো।

রতনমণিকে চুপকরে থাকতে দেখে কান্ত রায় বলে ওঠে

—জবাব দাও ঠাকুর।

রতনমণি চোখ খুলে ওদের দেখছেন। ওর চাহনিতে একটা বিচিত্র দৃঢ়তা আর ঝকঝকে ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে। বলেন তিনি।

—আমার নির্দেশ মানতে পারবে? কঠিন সে নির্দেশ? এ আমার দেবতার নির্দেশ!

স্তব্ধতা নেমেছে রাত্রি গভীরে। তাইন্দা বলে

—পারবো।

রতনমণি বলে ওঠেন—প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তোমাদের আর এতবড় বিরাট কাজে নামার আগে চাই প্রস্তুতি, চাই আত্মত্যাগের দীক্ষা। কঠিন সেই পথ! পারবে তোমরা?

স্তব্ধ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে একটি বিচিত্র ঋজু মানুষ, হু'চোখে ওর স্নিগ্ধ জ্যোতি, কণ্ঠে কি নির্ভিক বলিষ্ঠতা, শক্তি রায় বলে ওঠে।

—পারবো ঠাকুর। তোমার নির্দেশ মানবো।

জনতা মুখর হয়ে ওঠে। কে জয়ধ্বনি দেয়—জয়গুরু!

এই জয়ধ্বনি রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ওরা যেন আজ পথ পেয়েছে, নির্দেশ এসেছে।

রাতের স্তব্ধতা নেমেছে। এদিক ওদিকে ওই মানুষগুলো আজ নিশ্চিন্ত আশ্বাস নিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা শ্রান্ত-ক্লান্ত।

ঘুম আসেনি রতনমণির।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন তিনি মন্দিরের চাতালে, আজ তার সামনে বিরাট একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে, আর এই কর্তব্যকে এড়াতে পারেননি তিনি।

—গুরুদেব!

রতনমণি চাইলেন খুশীকৃষ্ণকে দেখে। খুশীকৃষ্ণ এ নিয়ে কোন কথাই বলেনি, দেখেছে সবকিছু। তাই এবার বলে।

—এ কি হয়ে গেল গুরুদেব ? এতবড় দায়িত্ব—এত বিপদ সব নিজের ঘাড়ে নিলেন ?

রতনমণি চাইলেন ওর দিকে। অনেক ভেবেছেন তিনি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তটিকে ভুলতে পারেন না। এ যেন একটি বিচিত্র অনুভব। এ যেন তাঁর অন্তরাত্মার নির্দেশ, ওই আর্ত্ত-মানবিকতাকে তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। বলে ওঠেন তিনি।

—গীতা পড়েছো খুশীকৃষ্ণ ? ভগবান বলেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানং হৃদ্দেশহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়াণি মাযয়া॥

ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।

তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সসি শাশ্বতম্।

তুমি, আমি কেউ নই খুশীকৃষ্ণ, ঈশ্বরই প্রাণীদের হৃদয়ে থেকে পুতুলের মত তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন।

এও তাঁরই নির্দেশ খুশীকৃষ্ণ। তাকে স্মরণ করেই এই কঠিন কাজে নেমেছি। আর ফেরার পথ নেই।

খুশীকৃষ্ণও গুরুদেবের দিকে চেয়ে থাকে, ধ্যানমগ্ন কোন এক সন্ন্যাসীর জীবনের এ যেন এক নতুন রূপ।

অন্ধকারে জেগেছিল কয়েকটি মানুষ, হঠাৎ লোকটাকে ওদিক থেকে উঠে অন্ধকারে বনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে শক্তি রায়ের সহচর বলিষ্ঠ একটি আদিবাসী চকিতের মধ্যে লাফ দিয়ে গিয়ে ওই পলায়মান লোকটার টুটি টিপে ধরেছে।

লোকটাও ধরা পড়ে গেছে, জেগে উঠেছে অনেকেই। ওই লোকটাকে টানতে টানতে আনে শক্তি রায়ের কাছে। সহচরটি জানায়।

—চৌধুরীদের লোক, এখানে দলে মিশেছিল, সব শুনে পালাচ্ছে, শক্তি রায়ের হাতের ধারালো টাকালটা ঝকমক করে ওঠে।

ওরা জেগেছে এবার। শত্রুকে নিধনই করতে হবে। তারই নির্দেশ যেন শুধু চায় সে।

হঠাৎ রতনমণির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়

—ওকে ছেড়ে দাও।

শক্তি রায় অবাক হয়—ছেড়ে দেবো? ও আমাদের সব খবর জেনেছে। চৌধুরীদের লোক।

হাসেন রতনমণি—জানুক। আর ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চাই এটাও গোপন খবর কিছু নয়, ওকে যেতে দাও।

শক্তি রায় কি জবাব দিতে গিয়ে থামলো রতনমণির চাহনির সামনে। তাইন্দা রায়, কান্ত, মুকুন্দ ওরাও এসে পড়েছে। লোকটা প্রাণভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

রতনমণির পা দুটো ধরে কাঁদছে সে।

রতনমণি বলেন—যা। এখান থেকে চলে যা। ওকে যেতে দাও তোমরা। সামান্য কারণে এত উত্তেজিত হলে চলবে না, শক্তি রায়।

লোকটা ছাড়া পেয়ে তখন প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, মনে হয় এখুনি পালাতে না পারলে আবার ধরে ফেলে এবার শেষই করে দেবে তাকে।

রতনমণি বলেন—সামনে অনেক বড় কাজ, তার জন্য তৈরী হতে হবে। এত সহজে ধৈর্য হারালে চলবে না।

...খবরটা খগেনবাবুর কানে পৌঁছে গেছে।

একটার পর একটা খবর আসছে, আর মনে হয় সমস্যা যেন বাড়ছে। আর বেশ দ্রুত গতিতেই ব্যাপারগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

ওদিক থেকে উদয়পুরের সদরওয়ালাও তলব করেছেন খগেন-বাবুকে। তিনি খগেন রায়ের কাজে খুব খুশী হতে পারেন নি, এই

এলাকা থেকে রক্ষী বাহিনীতে সৈন্য বিশেষ সংগ্রহ করা হয়নি, অথচ খগেনবাবু খরচা বাবদ অনেক টাকাই নিয়েছেন। তাই তাকে আজই দেখা করতে যেতে হবে সেখানে।

খগেন রায়ের মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়েছে এবার।

খগেন রায় তাই এবার একটু চড়া স্বরেই চৌধুরীদের বলে—

—আপনারাও মদৎ দেননি আমার সঙ্গে।

তীর্থহরি বাবু অবশ্য দেখেছেন চেষ্টা করে। ওদের লোকজন গেছে গভীর অরণ্য অঞ্চলের আদিবাসী গ্রামে, হাটে-গঞ্জে।

বিশ্রামগঞ্জের হাটে সেদিন ওদের লোককে ওইসব রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেবার কথা বলতে অনেকেই বিরক্ত হয়।

হাজাছড়ায় কান্ত রায়ও দলবল নিয়ে গেছে। তারা বলে।

—স্বয়ং রতনমণির নির্দেশ, তোমরা গরীব লোক এসব যুদ্ধের ব্যাপারে থেকো না! বোমা, গোলাগুলি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, তোমরা মারা যাবে।

সাধারণ মানুষকে আজ ওই কান্তরায়, তাইন্দা রায় শক্তি রায়ের দল হাটে-গঞ্জে গিয়ে গিয়ে বিভ্রান্ত করছে।

বিজয় চৌধুরী বলে—জববরপুর অঞ্চলের মানুষ দলে দলে ওই রতনমণির শিষ্য হয়ে যাচ্ছে। তারা বলে—গুরুর নিষেধ। ওসব যুদ্ধে আমরা যাবো না।

খবরটা জানে কালিপ্রসাদ। সে গিয়েছিল বগাফা বিলোনিয়ার দিকে। ওদিকে ডমরু অঞ্চলে গেছল রাজারাম চৌধুরী। ওরাই বলে—শুধু তাই? রতনমণির লোকজন জোর করে ধান গম নিয়ে গিয়ে ধর্মগোলা করেছে। আর তুইছার বুহা, বসাফা তুইনানী অঞ্চলে ওরা টিলা সাফ করে বিরাট বিরাট ঘর তৈরী করেছে বনের মধ্যে। ওরাই নাকি দলবল নিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়েছে সেখানে!

রাজারাম বাবু কালিপ্রসাদের কথায় সায় দেন।

—ঠিকই বলেছে কালিপ্রসাদ, ওরা জোর করে আমাদের

চাষীদের কাছে ধান নিচ্ছে। আবার শুনছি নাকি ওই শক্তিরায় বলেছে, দরকার হলে মহাজন চৌধুরীদের ধানও লুট করা হবে।

খগেনবাবু নিজে এবার বিপদে পড়েছে। চারিদিক থেকে এমনি নানা ধরনের খারাপ খবর আসছে। আর নিজেও বুঝেছে এবার একটা কঠিন ব্যবস্থা না হলে তাদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই সংগঠিত রিয়াং প্রজাদের দল।

রাজারাম বলে—এসবের মূলে ওই রতনমণি। লোকটা এতকাল সাধুগিরি করে এবার বদলে গেছে। তার কথা মতই এসব প্রস্তুতি চলেছে। একটা বিহিত না হলে এবার ওরা আমাদেরই শেষ করবে খগেনবাবু।

তাই বলছিলাম চলুন, আমরা সবাই সদরে যাবো, এসব কথা জানাবো জেলার কর্তাদের, তাতেও যদি বিহিত না হয় রাজধানীতেই যাবো। রাজদরবারেই জানাবো সব খবর।

খগেন রায়েরও মনে হয় একা না গিয়ে এই মাতব্বরদের নিয়ে যাবে সে। আর নিজেকে রায়কাঞ্চন বলে সরকারী স্বীকৃতিটাও আদায় করে নিতে হবে এই সময়ে।

অবশ্য তার জন্য দরবারে নজরাণা দিতে হবে একশো টাকা আর দুটো সোনার মোহর, তা দিতে কোন অসুবিধাই তার নেই, বিনিময়ে সে ওই বুড়ো দেবী সিং আর এই হাজারো রিয়াংদের উপর আইনতঃ কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাবে, সরকারী সমর্থন পেলে সে এখনও ওই মুষ্টিমেয় মানুষগুলোকে পিষে মারতে পারবে। খগেন রায়ও চৌধুরীদের কথায় বলে।

—তাই চলুন। এতবড় ব্যাপারটা ঘটছে কর্তাদের কানে তোলারও দরকার। হঠাৎ খগেন রায়ের মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে।

কিন্তু এখনই সেই ব্রহ্মাস্ত্রটা সে প্রয়োগ করতে চায় না। ওটা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার করবে চরম আঘাত হানতে। তাই সেটা এখন প্রকাশ করে না এদের সামনে।

দারোগোবাবুও বাসায় বসে কিছু বিচিত্র খবর পাচ্ছেন, আর য়েকজন লোক এর মধ্যে থানায় এসে নালিশও জানিয়েছে ই তাইন্দা রায়, রতনমণির নামে, আর বড়বাবুও ভাবনায় ড়েছেন।

প্রথম প্রথম কিছু রক্ষী বাহিনীতে লোক এসেছিল অনেক ৎসাহ নিয়ে, তাদের খাকি পোষাক পত্র দিয়ে ওপাশের টিলা ঘর-গুলোয় থাকা খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমদিকে তাদের সারবন্দী দাঁড় করিয়ে প্যারেড করানো হোত, ওরাও নোতুন পোষাক পরে অনভ্যস্ত পায়ে জুতো এঁটে কোনরকমে পা ঠুকতো, কিন্তু হঠাৎ যেন আর লোক আসছে না রক্ষী-বাহিনীতে। যে কজন এসেছে তাদেরও সেই উৎসাহ আর নেই! কেমন মিইয়ে গেছে তারা।

...এদিকে সদর কর্তাদের দপ্তরে বড়বাবুরও আজ ডাক পড়েছে। তিনি নাকি ঠিকমত ডিউটি করছেন না। বড়বাবুও ঘাবড়ে গেছেন। তিনি জানেন সেনাবাহিনীতে এই লোক না আসার মূলে ওই রতনমণির দলই। বরং তারাই লোকজনদের নিয়ে দল পাকাচ্ছে। তুইনানীতে ক্যাম্প করেছে। তুইছাংবুহাতেও ঘাঁটি গড়েছে ঘন বনের মধ্যে।

সদর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওসব কথাও শুনেছেন। কিন্তু কোন যুক্তি মানতে তিনি রাজী নন। তাই মিটিং-এর মধ্যেই তিনি বেশ চড়াস্বরে বলেন—ওসব কথা শুনতে রাজী নই খগেনবাবু, বিজয়বাবু।

আপনারা রাজদরবারের হয়ে ঠিকমত কাজ করছেন না। লোকজনদের বোঝাতে পারেন নি।

খগেনবাবু বলে ওঠে—আমাকে সরকারীভাবে রায়কাঞ্চন করা

হয়নি, তাই রিয়াংরা আমার হুকুম অনেকে মানতে চাইছে না। তাদের কাছে ওই বুড়ো দেবী সিং এখনও ঐ 'রায়কাঞ্চন'।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্টও তাই বলে। তিনিও ভেবেছেন কথাটা। দেবী সিং আজ স্থবির। ওকে ওই পদে রাখার কোন অর্থই নেই। তারাও কাজ চান এ-সময়, রক্ষী বাহিনীতে লোক চাই, ওদিকে জাপানী সৈন্যদল এগিয়ে আসছে, বার্মার যুদ্ধের খবর খুবই খারাপ। রেঙ্গুনের আকাশে এসে হানা দিয়েছে জাপানী বিমান-বাহিনী। ইংরেজ রাজত্ব বিপন্ন, সুতরাং এখন সব ব্যবস্থাই তাঁদেরও নিতে হবে। ব্রিটিশকে সাহায্য করতেই হবে। তাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলেন।

—রায়কাঞ্চন আপনাকেই করা হবে। সদরে আমিও রেকমণ্ড করছি আপনার নাম।

খগেন রায় এবার সেই চরম অস্ত্রটিই ছাড়লো। জমায়েত সকলেই চমকে ওঠে। আজ তাদের কাছেও যেন এই মিটিং-এর প্রকৃত কারণটা পরিস্কার হয়ে ওঠে, সকলেই অজানা ভয়ে চমকে ওঠে।

খগেন বাবু জানান—আমার কাছে খবর আছে স্যার ওই রতনমণি হয়তো জাপানীদেরই লোক। ওর আসল বাড়ি বার্মা সীমান্তের রাঙ্গামাটির ওদিকে। আর হঠাৎ সে এখানে গেড়ে বসেছিল এই সুযোগের জন্য। আমরা যখন জাপানীদের রুখবার জন্য রক্ষীবাহিনী গড়ছি, ঠিক সেই সময়ই সে তাদের গ্রামে-গঞ্জে-হাটে গিয়ে বাধা দিচ্ছে, আমাদের লোকদের খুন-জখম করার চেষ্টাও করছে। আমারই লোক মিতুলকে শেষ করে দিয়েছিল প্রায়। কালিপ্রসাদের উপরও হামলা করেছে। যাতে আমরা হাটে গিয়ে মিটিং না করতে পারি তার চেষ্টা করছে।

শুধু তাই নয়, সে নিজেই দল গড়ছে। এসবের মানে ওরা সাহায্য করতে চায় জাপানীদেরই। আমাদের নয়।

-একি বলছেন খগেনবাবু ? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও চমকে ওঠে এমনি সাংঘাতিক একটা খবর শুনে।

খগেনবাবুও দেখেছে ওর মনের প্রতিক্রিয়াটা, বড় দারোগাও বলে ওঠে—রতনমণির দলের এ্যাকটিভিটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে স্যার। ওরা নাহলে এই সময়ই এসব করবে কেন ?

জেলাশাসকও বিপদে পড়েছেন। এতবড় খবরটা সদরে পাঠাতেই হবে তাকে। তাই খগেনবাবুকে বলেন তিনি—সদরে যেতে হবে আপনাকে আমার সঙ্গে, কিছু জরুরী আলোচনা করতে হবে সেখানে।

খগেনবাবুও এটা চেয়েছিল। তাই মনে মনে খুশী হলেও, বিষণ্ণ মুখে জানায় সে—আপনি হুকুম করলে মানতেই হবে স্যার। তবে চৌধুরীদেরও দু'একজন মাতব্বরকে সঙ্গে নোব। মানে ওদেরও সাহায্যের দরকার হবে কিছু করতে গেলে।

জেলাশাসকও রাজী হন—ঠিক আছে। ওরাও যাবেন।

খগেন রায় সকলকেই জড়িয়ে কাজে নামতে চায়, তাই শেষ আসরেও এই বড়ো চালটা দিয়েছে। চৌধুরীরা এই দিকের ক্ষমতাশালী লোক, তাঁরাও খুশী হন দরবারে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে।

দুর্গম পথ। ঘন অরণ্য আর টিলার রাজ্য। তারই বুক চিরে রাজধানী আগরতলায় যাবার রাস্তা চলে গেছে। বর্ষায় গোমতী হাবড়া নদীর বুকে গেরুয়া তুফান নামে। তাছাড়া বন-টিলার এদিকে-ওদিকে রয়েছে অসংখ্য ছোট পাহাড়ী নদী, ছড়া। সেগুলো ফুলে ফেঁপে ওঠে। রাস্তা যেন দুর্গম হয়ে যায়। দু-একদিন যাতায়াতও বন্ধ থাকে।

ওরা চলেছে হাতির পিঠে।

হাতি এদিকের অরণ্যে অনেক। আর তাই খেদা করে,হাতিও ধরা হয়। খগেন রায়েরও নিজের হাতি আছে। হাওদা বসিয়ে

ওরা চলেছে রাজধানীর দিকে। চড়িলাম, বিশ্রামগঞ্জ পার হয়ে ওদের পথ চলেছে আগরতলার পানে। খগেন রায় অনেক আশা নিয়েই চলেছে।

নিতাই বেশ কিছুদিন উদয়পুরে এসে রয়েছে। সকাল বিকাল ওই প্যাণ্ট জুতো পরে থানার সামনের মাঠে লেফট-রাইট করে, বন্দুকেও হাত দিয়েছে সে। ওদের চাঁদমারী শেখান হচ্ছে।

নিতাই ভেবেছিল তাদের সঙ্গে আরও অনেকেই আসবে, কিন্তু ঠিক ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে বোধ হয়। ক্যাম্পে লোকজন আর বিশেষ আসছে না, বরং যে কয়েকজন রয়েছে তাদের দিকেও কর্তাদের যেন তেমন নজর নেই। খাওয়া দাওয়ারও জুত হয় না।

সেদিন লক্ষ্মীছড়ার শীতল রিয়াং বলে—ওরা সবাই ভয় পেয়ে গেছে। তাছাড়া হাটে দেখা হল আমাদের বসতির লোকের সঙ্গে। রতনমণি বলেছে, এ যুদ্ধে কোন রাজা থাকবে না।

রাজার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বোমা গুলি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, আমরা এতে নাই।

ওরা অবাক হয়। ব্যারাক বলতে টানা মুলি বাঁশের ঘর, ছনের ছাউনি। বৃষ্টি নেমেছে। চারিদিকের আকাশ ছেয়ে গেছে পাংশু ছাই রং-এর মেঘে মেঘে।

ওরা কয়েকজন ভাবছে কথাটা।

শীতল বলে ওঠে—রতনমণি মানুষ নয়, দেবতার অংশ। ওর কথা সত্যিই হবে নিশ্চয়। ঠাকুর বলেছে, এ যুদ্ধে অনেক লোক মরবে। তাই ভাবছি, আর কেউ ওরা আসবে না এখানে। আমরাই আটকে পড়েছি।

শীতলের কথাগুলোয় কেমন ভয় ভয় বোধ করে নিতাই। এরা যেন কি একটা বিপদেই পড়েছে। ওদের চোখেমুখে অসহায় ভাব ফুটে ওঠে।

নিতাই-এর মনে পড়ে তাদের টিলার কথা, ছোট্ট বসতির চারিদিকের বনে এখন বর্ষা নেমেছে। কালো মেঘের দল এসে যেন বাঁশবনের মাথা ছুঁয়েছে। জুম-এর ক্ষেতগুলোয় এসেছে সবুজের আভা, পৈরীর কথা মনে পড়ে। তাকে ফেলে চলে এসেছিল সে এখানে কি এক নেশার ঘোরে। আজ নিতাই-এর মনে হয় একটা ভুলই করেছে সে। টাকা পাবে অনেক কিন্তু এখনও টাকার মুখ দেখেনি। ওসব নাকি পরে পাবে।

খগেনবাবুও নেই।

বৈকালে বের হয়েছে নিতাই, যদি ওদের কোন খবর মেলে। কিন্তু গোমতী নদীর বুকে নেমেছে পাহাড়ী ঢল। ছোট শহরটাকে একদিকে ঘিরে রেখেছে ওই নদীটা। টিলার নীচে নদীর খাত থেকে দুর্মদ গর্জন ভেসে আসে। কদিনের বৃষ্টিতে চর ভূমির ধান ক্ষেতে এসে জল ঠেকেছে। ওই নদীটা আসছে তাদের বসতির গা দিয়ে, আরও উপরের পাহাড়গুলোর বুক চিরে। দেওতামুড়া পাহাড়ের চূড়ার বনরাজ্যে মেঘগুলো হারিয়ে যায় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে।

…পৈরী সেই সবুজ বনরাজ্য থেকে এখানে বন্দী হয়ে রয়েছে। কালিপ্রসাদ আজও ওকে ঘরে যেতে দেয়নি। শুধু তাই নয় ওর সবকিছু লুঠ করে নিয়ে আজ যেন তাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে। পৈরীও জানেনা নিতাই-এর খবর।

দু'একবার শহরের দিকে এসেছে, কিন্তু কালিপ্রসাদের নজর সবদিকে, ওকে যেন পাহারা দিয়ে রেখেছে তার লোকজন, সেই বুড়িটা।

…পৈরী জানতে দেয়নি ওদের শহরে কেন এসেছে সে, কিছু পাছাড়ি, জিনিষপত্র, শাড়ি কিনেছে, কিন্তু তার দু'চোখ খুঁজে ফিরেছে একজনকে। এত লোকজনের মাঝে তবু নিতাই-এর সন্ধান পায়নি সে।

—বাসায় ফিরতে হবে দিদি, বাবু জানতে পারলে রাগ করবে। বুড়ি তাড়া দেয়। পৈরী বাধ্য হয়ে বলে—চলো।

আবার ফিরে এসেছে পৈরী তাদের চাষবাড়িতে। অবশ্য কালিপ্রসাদ তাকে অযত্নে রাখেনি। তবু পৈরীর এই জীবন ভালো লাগে না।

সেদিন পৈরী মাঠের ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঁঠালগাছের নীচে। ঘরে দিনরাত মন টেঁকে না, তাই বাগানের দিকে আসে। একটু ঘোরাফেরা করে।

হঠাৎ ওই বৃষ্টির মধ্যে কাকে দেখে চমকে ওঠে পৈরী। ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে লোকটা। পৈরীর সারা শরীরে মনে কি দুর্বার চাঞ্চল্য জাগে। লোকটা তাকে দেখেনি। পৈরীই চাপাস্বরে ডাক দেয়—নিতাই।

নিতাই ফিরছিল খগেনবাবুর ওখান থেকে। নানা উড়ো কথা কানে আসছে তাদের। ওইভাবে ব্যারাকে পড়ে থাকতে ঠিক মন চায় না। তাছাড়া রতনমণি সাধুর কথাগুলোও শুনেছে সে। সেই রতনমণিই নাকি নিষেধ করেছে এ যুদ্ধে কাউকে না যেতে।

...নিতাই-এর মনে হয় চুপিসাড়ে একদিন সরে পড়বে সে। ফিরে যাবে সেই গভীর বন-পর্বতের নির্জন প্রশান্তির মাঝে। হয়তো এখনও সেখানে পাবে পৈরীকে। আবার সেই ছোট্ট ঘরে তারা সুখী হবে সামান্য নিয়ে।

হঠাৎ ওই ডাক শুনে চমকে ওঠে নিতাই।

এদিক ওদিকে চাইতে থাকে নিতাই। হঠাৎ ওদিকে পৈরীকে দেখে চমকে ওঠে সে।

—তুই! এখানে? নিতাই একনিঃশ্বাসে পথ থেকে কাঁঠাল গাছের ছায়া অন্ধকারে দাঁড়ানো মেয়েটার কাছে এসে পড়েছে।

মেয়েটার দু'চোখে কি জ্বালার কাঠিন্য ফুটে ওঠে। নিতাই ওসব কিছু ভাবেনি, পৈরীকেই দেখছে সে। ওর পরনে শাড়ি, হাতে রূপার গহনা, কানে সোনার গহনা উঠেছে। নিতাই অবাক হয়—এসব শাড়ি গহনা কোথায় পেলিরে? এখানেই বা এলি কি করে?

—তোর খোঁজে। মেয়েটার গলা বুজে আসে উদ্গত অভিমানের অশ্রুভারে। বলে চলেছে পৈরী।

—আমার কথা ভেবেছিস তুই একবারও এতদিনে? তাই না খেয়ে পড়ে থাকতে পারিনি। কালিপ্রসাদবাবু এখানে এনে রেখেছে। বাবু খুব ভালো রে।

নিতাই দেখছে মেয়েটাকে। কালিপ্রসাদ-এর সম্বন্ধে ওর মুখে প্রশংসা শুনে বলে ওঠে নিতাই—হ্যাঁ। খুব ভালো লোক! তুই আর লোক পেলি না? ওর বাড়িতে এসে রইলি?

পৈরী চুপ করে থাকে। হঠাৎ মনে হয় নিতাই যেন তার পরাজয় আর অপমানের কথা শুনে ফেলেছে। নিতাই-এর কথায় পৈরী বলে ওঠে।

—তুনিয়ায় আর ঠাঁই কোথাও যে নাই আমার! এবার একদিন মরতেই হবে।

নিতাই ভাবছে কথাটা। এ ভাবে পৈরীকে সে শেষ হয়ে যেতে দিতে পারে না।

নিতাই বলে—এখান থেকে চলে যাবি পৈরী? ওই বনপাহাড়ে আবার ফিরে যাবো আমরা! আমিও ভুলই করেছি রে।

পৈরী দেখছে ওকে। নিতাই-এর মনে আবার হারানো সেই সুরটা ফুটে উঠেছে, বনপাহাড়ের সেই জীবন যেন ডাকছে তাদের। সেই অরণ্যের মানুষ তারা, শহরের মোহ তাদের গেছে। তবু পৈরীর ভয় হয়। ও চাপাস্বরে বলে।

—কালিবাবু সাংঘাতিক লোক। যদি জানতে পারে তোকেও বিপদে ফেলবে, আমাকেও শেষ করে দেবে।

নিতাই আজ যেন নিজের হারানো পৌরুষটাকে ফিরে পেয়েছে। তাই বলে সে—সে দেখা যাবে।

হঠাৎ পৈরী সচকিত হয়ে ওঠে। বুড়ি দেখেছে ওদের তু'জনকে। পৈরী বলে ওঠে—তুমি যাও। বুড়ি সব খবরই কালিবাবুকে দেয়।

—পরে আসবো।

নিতাই ওই টিপ্‌টিপে বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে গেল।

পৈরী বাড়ির দিকে এগোলো। তখনও বুড়ি তার দিকে চেয়ে রয়েছে। পৈরী দেখেছে ওর চোখে সন্দেহের ছায়া। তাই বলে ওঠে পৈরী।

—বাবু কোথায় রে? একটা লোক বাবুকে খুঁজতে এসেছিল।

বুড়ি হয়তো কথাটা বিশ্বাস করেছে। ও বলে—বাবুতো সহরের দিকেই গেছে। বাবুকে ও খুঁজে নেবে যেখান থেকে হোক। এই বৃষ্টিতে ভিজো না। ঘরে এসো।

পৈরী বাড়ির ভিতরে চলে গেল। আজ হঠাৎ বেশ কিছুদিন পর তার মনে একটা গানের সুর গুনগুনিয়ে ওঠে।

তওখম্‌ আশ্রমে এসেছে কর্মব্যস্ততার সাড়া। রতনমণিও মাঝে মাঝে ভাবেন কথাটা। তিনি এই দায়িত্বকে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে চরম নিষ্ঠার সঙ্গে একটা যেন ব্রত পালন করে চলেছেন।

ক্রমশঃ আশ্রমের শিষ্য সংখ্যা বাড়ছে। হাটে গঞ্জে রটে গেছে তাদের দলের কথা, আর দূর-দুরান্তরের মেয়ে-পুরুষ দলে দলে আসছে। তার কাছে ওরা যেন কি আশ্বাস পেয়েছে।

চিন্তামণিও কিছুদিন থেকে এসেছে এখানে। রতনমণির ছোট ভাই, তাইন্দা রায়ই বলেছিল।

—চিন্তামণিকে আমার সঙ্গে দিন।

রতনমণি ঠিক খুশী হননি ওকে দেখে। তিনি বলেন।

—চিন্তামণি রাঙ্গামাটির বাড়িতেই ফিরে যাবে তাইন্দা। একসঙ্গে দুই ভাই আশ্রমে থাকলে আশ্রমেও স্বার্থের গন্ধ দেখতে পাবে অনেকে। তাছাড়া ওর কাজ অন্যত্র।

তাইন্দা, হান্দাই বলে—ওকে তুইছার বুহা ক্যাম্পে রাখবো ঠাকুর। লেখাপড়া জানে—ধর্মগোলার হিসাব কিতাব রাখতে হবে।

চিন্তামণির ব্যাপারে রতনমণি বলেন—তোমরা ওর জন্য দায়ী থাকবে।

চিন্তামণিও কাজ হাতে নিয়ে এবার নেমে পড়েছে। ঘন বনের মধ্যে বিরাট কয়েকটা টিলার জঙ্গল কেটে সাফ করে সেখানে সারবন্দী ঘর তৈরী হচ্ছে।

রতনমণি বলেন—ধর্মগোলার কাজে জোর দাও ভাইন্দা। এবারের জুম উঠলে, ধান উঠলে সকলের কাছ থেকেই ধান নেবে। আর মদ খেয়ে যে আশ্রমের ধারে কাছে আসবে তাকে ধরে আনবে। বলে দিও—মদ খেয়ে মাতলামী করলে সইবো না। আর বাড়ি বাড়ি মেয়েরা তাঁত বুনবে।

ওরা এবার তুইছার বুহা তুইনানীতেও সেবাদল গড়ে তুলেছে, তারাই এসব কাজ করছে। রামজয় এখন আশ্রমের কাজে ব্যস্ত। তার ব্যবসার জন্য কিছু সময় যায়—বাকিটা থাকে এখানে।

রতনমণিকে মন্দিরের চাতালে বসে দর্শন দিতে হয় সকাল বিকাল, দর্শনার্থীর কামাই নেই। দূর-দূরান্তর থেকে আসছে তারা, আর রতনমণির পায়ে প্রণাম করে নামিয়ে দেয় টাকা পয়সা ধান গম শব্জী সবকিছু।

...রতনমণি বলেন—এসব কেন ? টাকা...

কোন ভক্ত বলে ওঠে—আশ্রমের খরচ তো অনেক ঠাকুর। আমরা গরীব মানুষ, যা সাধ্য দিতে চাই—তুমি নেবে না ?

টাকার অনেক দরকার। তাই এদের দান-সাহায্য তিনি ফেরাতে পারেন না।

একটু ভাবছেন রতনমণি। তারপরই ডাকছেন।

—রামজয় !

রামজয় ওদিক থেকে ঠাকুরের ডাক শুনে এগিয়ে এল। রতনমণি বলেন—টাকা পয়সা নিয়ে তুমি এতকাল নাড়াচাড়া করেছো, এসব তোমার কাছেই রাখো। এবার থেকে আশ্রমের ভাঁড়ারী হ'লে তুমি।

চমকে ওঠে রামজয়।

—একি বলছেন ঠাকুর?

হাসছেন রতনমণি। স্নিগ্ধ শান্ত হাসি। তিনি জানান।

—আমাকে সাধু হয়েও এই হাজারো মানুষের ঘরের মানুষ হতে হয়েছে। তুমি কারবারী মানুষ, এদের টাকা পয়সার হিসাব রাখবে এমন কঠিন কথা কি?

রামজয় কি ভাবছে।

এবার থেকে সেও জড়িয়ে পড়েছে এখানের কাজে। ঠাকুরের চারিদিকে নানা কাজের ভিড়। তপোবনের প্রশান্তির মাঝে তাঁর সেই তপস্যামগ্নতাকেও ভঙ্গ করেছে হাজারো মানুষের হাহাকারের কলরোল। তিনি এগিয়ে এসেছেন ওদের পাশে।

আজ রামজয় যেন নোতুন করে চিনেছে ওই মানুষটিকে।

রামজয় বলে—আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য ঠাকুর। আমার যা কিছু সবই তোমার, এ নির্দেশও তাই মানতেই হবে।

রামজয় তার সবকিছু গুরুর পায়ে সমর্পণ করে আজ যেন নিষ্কাম সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায়। সে গীতা পড়েনি, ঠাকুরের কাছে শুনেছে গীতার সেই কথাগুলো! কর্মফলের আশা সে করে না।

একদিন নিজের স্বার্থে, নিজের কামনা মেটাবার জন্যই হাটে গঞ্জে বেসাতি করেছে। মাল কেনা-বেচা করেছে। কিন্তু মনের জ্বালা মেটেনি এত পেয়েও।

আজ সেই পাওয়ার জ্বালাটাকে ভুলতে চায় সে। কাজই করে যাবে তার পিছনে কোন কামনা-লোভ আর রাখবে না।

রামজয়ের কাছে এ যেন পরম আনন্দময় একটি অনুভূতি। সব ত্যাগ করেই তবে এই শান্ত পৃথিবীর প্রশান্তি-ব্যাপ্তির অসীমতাকে স্পর্শ করা যায়। রামজয় সেই স্বপ্ন দেখছে এই কাজের মধ্যে।

আশ্রমে নামগান চলেছে, মানুষের ভিড় জমে। ওই অসহায়

মানুষগুলো এতকাল জানতো না এই অনুভূতির কথা। ওরা যেন ক্রমশঃ একটা নোতুন চেতনাকে ফিরে পেয়েছে।

হঠাৎ দেখা যায় বড় দারোগা আর কিছু উর্দিপরা রাজার কনেষ্টবলদের। ওরা আশ্রমে এসে ঢুকতে নামগান থেমে যায়। রতনমণিও চাইলেন ওদের দিকে।

খবরটা বিদ্যুৎগতিতে গ্রাম-বসতে হাটে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। বগাফা, লক্ষ্মীছড়া, হাজা ছড়া এই এলাকা থেকে মানুষ এসে পড়ে, এসেছে অমরপুরের মানুষ। ডুম্বুর পাহাড় অঞ্চলেও খবর চলে গেছে। বনের টিলা থেকে আর এক টিলায় শিঙ্গার শব্দ তুলে—টিকারায় ঘা মেরে ওরা যেন এই চরম বিপদ সংকেতের খবর জানাচ্ছে।

...কান্ত রায় অবাক হয় কথাটা শুনে।

—কি বলছেন দারোগাবাবু? আমরা আশ্রমে থাকি নামগান গাই। মানুষজন আসে মাত্র। এর মধ্যে অপরাধ দোষ-ঘাট কি দেখলেন আপনারা যে, আমাদের ঠাকুরকে যেতে হবে সদরে?

বড়বাবু বেশ বিনয়ী লোক।

তিনিও দেখেছেন কয়েক মিনিটের মধ্যে এদের চারপাশে জমে গেছে বহু মানুষ। শক্তিরায়-এর দু'চারজন অনুচরকেও তিনি চেনেন, জানেন। ওরা এখুনি তাঁদের কয়েকজনকে পিষে মেরে ফেলে বনের গভীরে গুম করে দিতে পারে।

বড়বাবু তাই বিনীত কণ্ঠে জানায় রতনমণিকে।

—সদর থেকে হুকুম এসেছে আপনাকে আর কান্তরায় খুশীকৃষ্ণ মুকুন্দকে সেখানে পাঠাতে হবে।

রতনমণি চুপ করে কথাটা শুনছেন।

উত্তেজিত জনতা হুঙ্কার তোলে—ওই খগেনবাবুরই কারসাজি এসব। চৌধুরীদের সঙ্গে দল পাকিয়ে গিয়ে এসব করেছে। সদরে যাবেন না ঠাকুর।

—সরকারী হুকুম। বড়বাবু জানাতে চান।

—ওই খগেনবাবুদের হুকুম এটা। ওসব মানি না।

জনতা গর্জে ওঠে! তাইন্দা রায়ও এসে পড়েছে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে। এতকাল ধরে মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে ওই অসহায় মানুষগুলো, আর তারা সইতে রাজী নয়। এবার তাই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা।

—ঠাকুরকে যেতে দিব নাই!

রতনমণি দেখেছেন সবকিছু। এমনি একটা চেষ্টা হবে তাও জানতেন তিনি। এই ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে। আর সবকিছু সহ্য করতে হবে এই ব্রতের জন্য! তাই তিনিও তৈরী হয়েছেন।

ওই উত্তেজিত জনতা যেন বড় দারোগা আর সঙ্গের লোকজনদের উপর চড়াও হবে। কলরব উঠছে।

ঘাবড়ে গেছে বড়বাবু। হঠাৎ রতনমণির সতেজ কণ্ঠস্বরে সেও একটু ভরসা পায়। রতনমণি বলেন।

—তোমরা থামো।

উত্তেজিত জনতা ওই কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে।

রতনমণির কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন।

—হ্যাঁ, আমি সদরে যাবো ঠিক করেছি।

গুঞ্জরণ ওঠে ওদের মধ্যে। রতনমণি বলেন।

—আমাদের কোন ক্ষতি হবে না এ জানি। তোমরা শান্ত মনে যে যার ঘরে ফিরে যাও। আমরা কোন অন্যায় করিনি এই কথাটা রাজ দরবারে আমাদেরও জানাতে হবে। তাই সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তাইন্দা কি বলবার চেষ্টা করে। কিন্তু রামজয়ের চোখে জল নেমেছে।

খুশীকৃষ্ণ অশ্রুভিজে কণ্ঠে বলে—এসব দুঃখ বিপদ।

তার কথা শেষ হয় না। রতনমণি থামিয়ে দেন।

—সাধনার পথ বহু দুঃখ বিপদের পথ খুশীকৃষ্ণ! ঈশ্বরের নির্দেশই

খড়। তাইন্দা—আমি না ফেরা পর্যন্ত আশ্রমের সবকিছু ভার রইল তোমার উপর। রামজয়ও থাকবে।

জনতার উদ্দেশ্যে বলেন—আর রইলে তোমরা। চলুন দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু নিশ্চিন্ত হন। ওই জনতার ব্যূহ ভেদ করে ওরা বেরুচ্ছে! দারোগাবাবু দেখেছেন ওই জনতার দু'চোখে কি অগ্নিজ্বালা। রতনমণি সহজে আসার সিদ্ধান্ত না নিলে ওদের ক'টি প্রাণীকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না আজ! তবে বেশ বুঝেছেন বড়বাবু যে এরা এবার তাকে সহজে ছেড়ে দিল শুধু ওই রতনমণির জন্যই, কিন্তু তাকেও চিনে রেখেছে তারা, হয়তো সুবিধে পেলে উপযুক্ত জবাব দেবে।

খগেন রায় দলবল নিয়ে আগরতলায় এসে যথাস্থানেই খবরটা প্রকাশ করেছে। চারিদিকে তখন যুদ্ধের সাজ সাজ রব। ইংরেজ সৈন্যদল বার্মা থেকে পিছু হটছে বেদম মার খেয়ে, জাপানীরা এগিয়ে আসছে ভারতবর্ষের দিকে, যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে ইংরেজদের সাম্রাজ্যের এইখানেও। ত্রিপুরায় সিঙ্গারবিলে এরোড্রাম হয়ে গেছে, ময়নামতীতে জমায়েত করেছে ইংরেজ তার সৈন্যদল।

ত্রিপুরা রাজ্যের উপরও চাপ আসছে তারাও যেন সৈন্যদল গড়ে তোলে যাতে ত্রিপুরার বনপাহাড় ভেদ করে জাপানীরা ঢুকতে না পারে।

খগেন রায় এবং ওদের দলবলকে সদরে আনা হয়েছে। সদরে তখন সাজ সাজ রব পড়েছে। ইংরেজ সরকার থেকে তখন স্বয়ং মহারাজ অবধি সুরু করে তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীদেরও কাউকে মেজর কাউকে ক্যাপটেন, কাউকে লেফটেনান্ট পদবীও দেওয়া হয়েছে।

মেজর ব্রজলাল দেববর্মা অফিসে রিপোর্ট পেয়েছেন। তাই তিনিও একটু বিচলিত। খগেন রায় এবং চৌধুরীদের কয়েকজনকে দেখে তিনি বসতে নির্দেশ দিয়ে সেই চিঠির ফাইলটাই আনিয়ে নেন।

খগেন রায় ও এই ফাঁকে তার বক্তব্য বেশ গুছিয়ে নিয়ে ফাঁস করে—ওই রিয়াংদের খেপিয়ে তুলেছে একটা লোক স্যার—ওই রতনমণি!

ব্রজলাল দেববর্মা এর আগেও ওর নাম শুনেছেন। ওর ঘরে এসে ঢুকেছেন লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা। তিনিই বলেন।

—ডম্বরুতে ওরাই সেবার গোলমাল করেছিল, না?

মাথা নাড়ে খগেন রায়।

তীর্থ চৌধুরী বলে,

—ওখানে আমাদের এতকালের অধিকার, সব কেড়ে নিতে চায় স্যার। আরও এখন রিয়াংদের নিয়ে দলবেঁধে ক্যাম্প করেছে। রসদপত্র, অস্ত্রশস্ত্রও যোগাড় করেছে। ওরা আমাদের সৈন্যদলে আসবে না। বলে—রাজা আর কেউ থাকবে না।

ব্রজলাল দেববর্মা চড়াস্বরে বলেন,

—ওরাই তাহলে রাজা হবে নাকি? আইনও মানবে না?

খগেন রায় যোগান দেয়—ওরা বলে ওদের রাজা রতনমণি! তিনি কারোও আইন মানেন না। ওরা জাপানীদেরই চর স্যার!

লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা অবাক হন।

—কি বলে ওরা? এতবড় সাহস? রায়কাঞ্চন নেই ওদের?

খগেন রায় শোনায়—রায়কাঞ্চন দেবীসিং ওদেরই কথামত চলছে, তাই ব্যাপার এত গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

মেজর দেববর্মা ভাবেন জাপানীদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়, হয়তো থাকতেও পারে। তাহলে সন্দেহ বিবাদ ঘটতে পারে। তাই তিনি ওই দেবীসিংকেও অগ্রাহ্য করতে চান। তিনিই বলেন খগেনবাবুকে।

—রায়কাঞ্চন হবেন আপনি।

চমকে ওঠেন খগেন রায়—রায়কাঞ্চন বেঁচে থাকতে অন্যে রায়কাঞ্চন হবে কি করে স্যার?

ওরা আজ ওই রিয়াংদের, ওই রতনমণির সব ব্যক্তিত্ব, অধিকারকে নস্যাৎ করতে চান। তাই বলেন মেজর দেববর্মা।

—দরবারের হুকুমে আপনি রায়কাঞ্চন হবেন। আর লেঃ দেববর্মা ?

লেঃ দেববর্মা এগিয়ে আসেন। মেজর দেববর্মা বলেন।

—হুকুমৎ নামা বের করে দিন। রতনমণি আর তার বিশ্বস্ত কর্মীদের সাতদিনের মধ্যে যেন এ্যারেস্ট করে সদরে পাঠানো হয়।

মেসেজটা আজই লোক দিয়ে উদয়পুর সদরে পাঠান। আমি নিজে সেই লোকটিকে দেখতে চাই। কুইক।

খগেন রায় মনে মনে খুশী হয়েছে সব থেকে বেশী।

তবু সেই আনন্দটা চেপে বিনীতভাবে বলে খগেন রায়।

—তাহলে রায়কাঞ্চনের দরবারে নজরানা দিতে আজ্ঞা হয় স্যার ?

নজরানা বলতে তুটি সোনার মোহর আর একশো টাকা নগদ। আজ খগেন রায় এই সামান্য মূল্য দিয়ে ওদের সমাজের সর্বাধিনায়ক হবার আইনসিদ্ধ অধিকারটা কিনে নিল।

আরও খুশী হয় এবার রতনমণিকে এরা সদরে আটকে রাখলেই কয়েকদিনে এবার খগেন রায় ওই রিয়াং মহলে নিজের আসনই কায়েম করে নেবে।

ওদিকে কাজকর্মের ফাঁকে কান করে কথাটা শুনছিল ভ্রমর দেববর্মা। এই দপ্তরে তার যাতায়াত আছে, সামান্য ব্যবসা-পত্র করে। আর তাই গ্রাম গ্রামান্তরে তাকে যেতে হয়। ও শুনেছে সব কথা। মায় রতনমণিকে এ্যারেস্ট করার হুকুমের কথাও শুনেছে সে।

লোকটা দেখছে খগেনবাবুকে।

হাটে গঞ্জে গ্রামে গিয়ে সে দেখেছে রতনমণির লোকজনদের, খগেন রায়ের অত্যাচার। ওদের ধরে নিয়ে বেগার খাটানোর

কাহিনীও জানে। রতনমণির লোকজনই তাকে আশ্রয় দেয়, সাহায্য করে। সারা দেশের মানুষের কাছে রতনমণির কি শ্রদ্ধার ঠাঁই তা জানে ভ্রমর দেববর্মা।

সেবার তুইনানীর ওদিকের হাটে গিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রায় বেহুঁস হয়ে পড়েছিল ভ্রমর দেববর্মা। ওই রিয়াংরাই তাকে তুলে নিয়ে যায় রতনমণির আশ্রমে। সেখানে তাঁর আশ্রয়ে থেকে ভ্রমর বেশ কয়েকদিন জ্বর ভোগ করার পর সুস্থ হয়ে ওঠে।

সেবার রতনমণির আশ্রয় না পেলে ওই দুর্গম বনপাহাড়েই শেষ হয়ে যেতো ভ্রমর দেববর্মা।

আজ সেই সংসার ত্যাগী সাধুকে ওরা বন্দী করে রাজধানীতে আনতে চায় রাজদ্রোহের অপরাধে। আর ওই অভিযোগকারীদের ও স্বরূপটা চেনে ভ্রমর।

কিন্তু এখানে কোন কথা বলে ফল হবে না। খগেন রায়—আর ওই তীর্থ চৌধুরী, বিজয় চৌধুরী, রাজারাম চৌধুরীরা আটঘাট বেঁধে কাজে নেমেছে।

ভ্রমর দেববর্মা কি ভাবছে। ও নিজের কাজ সেরে বার হয়ে এল, যেন এসবের কিছুই জানে না।

রাজবাড়ীর বিরাট চত্বরের সামনে সাজানো বাগান, দুদিকে বিরাট দিঘী, শ্বেতশুভ্র উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের গম্বুজের ছায়া কাঁপে দিঘীর কালো জলের বিস্তারে। প্রাসাদ এলাকার চার কোণে চারটি সুন্দর মন্দির। ওদিকে লক্ষ্মীনারায়ণজী, ওদিকে কালী মন্দির। এদিকে জগন্নাথ মন্দির, অন্যদিকে দুর্গামন্দির।

মহারাজা বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সৎ নিষ্ঠাবান ধর্মপরায়ণ সুশাসক। ভ্রমর দেববর্মার মনে হয় তাঁর কাছে নিশ্চয়ই এসব সঠিক খবর পৌঁছয়নি। দরকার হলে ভ্রমর দেববর্মার ও কিছু বন্ধুবান্ধব আছে প্রাসাদে—তাদের মারফৎ সে স্বয়ং মহারাজার কাছেই দরবার করবে এ নিয়ে।

তাই আপাততঃ এই ব্যাপারটার দিকে নজর রাখতে হবে তাকে। চিন্তিত মনে বের হয়ে আসে ভ্রমর দেববর্মা।

...ওদিকে মহারাজার আস্তাবলে দিশী বিদেশী ঘোড়ার দল বাছাই পছন্দের কাজ চলছে। ইদানীং মহারাজার কিছু গাড়ী, ট্রাক এসেছে, তবু রাজ্যের দূর বনপাহাড়ে যাতায়াতের জন্য ঘোড়া হাতিই ব্যবহার করতে হয়।

হাতির জন্য রয়েছে পিলখানা, ওদিকে এসে ভুবনজয়কে দেখে দাঁড়ালো ভ্রমর। ভুবনজয় হাতির সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। হাতির খেদা থেকে হাতি ধরে পোষমানাতে তার জুড়ি নেই। তাই ওকে দরকার হয় হাতিশালায়।

দিলদরিয়া লোক ভুবন। আর সহরের বিভিন্ন মহলে মায় কোতোয়ালী থানা—অন্য সব কর্মচারীমহলে খুবই প্রিয় সে।

ভুবন ভ্রমরকে দেখে এগিয়ে আসে।

—এত চুপচাপ কেন হে? রাজদরবার থেকে কি আক্কেল নিয়ে ফিরছো?

ভ্রমর চাইল ওর দিকে।

লোকটাকে সে খুব ভালো করে চেনে। আপনজন। তাই ভ্রমর বলে—একটু দরকারে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম ভুবনদা।

ভুবনজয় অবাক হয়—আমার কাছে যাচ্ছিলে দরকারের জন্য? ব্যাপার কি হে? শাল বাঁশ-এর কারবার ছেড়ে হাতির ব্যবসায় নামবে নাকি?

ভ্রমর ওকে সিগারেট-এর প্যাকেট বের করে দিয়ে বলে,

—হাতির কারবার বলতে পারো, তবে হাতি ধরা নয়, হাতিকে মুক্ত করতে হবে। অনেক হাতিকে তো ধরে বন্দী করে বন থেকে শহরে এনেছো, কাউকে বনে ফিরে দিয়েছো কোনদিন?

ভুবনজয় অবাক হয়। এ-কথা সে কোনদিনই ভাবেনি। তাই অবাক হয়ে বলে সে—এ কাজ তো সত্যিই বিচিত্র রে?

ভ্রমর বলে—পরে দেখা করবো ভুবনদা। তোমাকে একটা বিহিত করতেই হবে।

ভ্রমর চলে গেল। ভুবন তখনও দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর ভাবছে কথাটা। বন্দী হাতির চোখে সে দেখেছে অশ্রুধারা, ওরা তখন খায় না, দায় না। হঠাৎ মনে হয় ভুবনের সে ওই প্রাণীগুলোর উপর দারুণ অবিচারই করে চলেছে তারা। সব কেমন তার ঘুলিয়ে যায়। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ওদিকের তাজা মদ্দ হাতিটার দিকে চেয়ে থাকে। গায়ে সস্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে আদর করছে তাকে। ওদের সে বন্দী করে এনেছে সবুজ শ্যামল বনরাজ্য থেকে।

বড় দারোগাবাবুও পত্রপাঠ আদেশ পালন করেছে। বন্দীদের সেই দিন ভোরে হাতির পিঠে তুলে পাহারাবন্দী করে সদরে নিয়ে এসে কোতোয়ালীতে হাজির করে। তখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে।

লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা ও খবর পেয়ে এসেছেন কোতোয়ালীতে।

কিন্তু রতনমণিকে দেখে অবাক হন। সাধারণ চেহারার মানুষ। পরণে গেরুয়া, মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সঙ্গী কয়েকজনও তেমনি। প্রথম দর্শনেই হতাশ হন তিনি।

বড় দারোগা বলে—এই রতনমণি স্যার।

লেঃ দেববর্মা তবু সাবধান থাকতে চান। সহরের কেউ যেন জানতে না পারে ওদের আসার খবর। সবকিছুই তদন্ত করা দরকার। তাই বলেন তিনি।

—ওদের খাস আলং ঘরেই রাখবেন। পাহারাও মোতায়েন থাকবে। পরে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে।

কোতোয়ালীর বড় দারোগাবাবুও নিশ্চিন্ত হয়। তার এখানে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না।

খাস আলংঘর এর ব্যাপার একটু স্বতন্ত্র। বিশেষ ধরণের

বিচারাধীন বন্দীদের সেখানে রাখা হয়। কোতোয়ালী থেকে ওদের সেখানে নিয়ে যাবার জন্য হাতির ব্যবস্থা হয়েছে।

আর সেই হাতিতে মাহুত হয়ে এসেছে ভুবনজয় নিজে।

শীর্ণ লোকটা লেঃ দেববর্মাকে আভূমি নমস্কার করে জানায়—মাহুত ব্যাটার জ্বর, আমাকেই আসতে হল! তা কই স্যার, সওয়ারী কই?

—ওই যে! হুঁসিয়ার হয়ে নিয়ে যাবে। লেঃ দেববর্মা জানান।

ভুবনজয় নাম শুনেছে রতনমণির। ভ্রমরের কাছে সবই শুনেছে লোকটা। আরও শুনেছে রতনমণির সম্বন্ধে অনেক খবর। তবু লোকটাকে না চেনার ভান করে চেয়ে থাকে ভুবনজয়। সাধু মহারাজাদের মত চেহারা—বেশবাস দেখে ভুবনজয় ভক্তিভরে প্রণাম করে।

—প্রাতঃপ্রণাম সাধু মহারাজ। তা আলং ঘরে পরম সমাদরেই থাকবেন। চলুন।

হাওদায় উঠেছে ওরা, সঙ্গে একজন বন্দুকধারী সিপাইও রয়েছে। কিন্তু হাতি আর ওঠে না।

ভুবনজয় বলে ওঠে—স্যার, ওই হাতিটা বন্দুকধারীকে ঘাড়ে নিতে চায় না। তাই ও উঠছে না। মহারাণার হাতি—ওর মনমর্জিই আলাদা।

শেষকালে পাহারাদার হেঁটেই চলতে বাধ্য হয়। সে নামতে ভুবনজয়ের ইঙ্গিতে হাতিটা সহজেই দাঁড়িয়ে এবার চলতে থাকে।

অবাক হয়েছেন রতনমণি। ওরা চলেছে, পথটা নির্জন প্রশস্ত। ওদিকে আখাউড়া রেল স্টেশনের দিকে গেছে পথটা। দু'ধারে সাজান বাড়ি, সরকারী অফিস, মন্ত্রী, আমলাদের বাগানঘেরা বাংলো।

রাজধানীর বাহার ফুটে উঠেছে। রতনমণি ভদ্রলোককে দেখছেন। ভুবনজয় বলে গলা নামিয়ে—ভ্রমর দেববর্মা—কাঠের

ব্যবসা করে, চেনেন তাকে? আপনার আশ্রমে জ্বর অবস্থায় গিয়ে পড়েছিল!

রতনমণি চাইলেন ওর দিকে। মনে হয় লোকটা ইচ্ছে করেই ওই পাহারাদারকে সঙ্গে না নেবার জন্যই হাতিটাকে উঠতে দেয়নি।

একটু অবাক হন তিনি। মনে করতে পারেন ভ্রমর দেববর্মার কথা। তারপরেও ভ্রমর গেছে তার আশ্রমে। তাই বল্লেন—চিনি। কেমন আছে সে? আপনার কে হয়?

ভুবন বলে—আমার বন্ধু লোক। ভালোই আছে সে।

ভুবনজয় বলে—ওরা আটকে রাখবে আপনাকে, মেজর সাহেব না আসা অবধি তো বটেই। তবে ভয় নেই। পরে দেখা হবে আবার।

রতনমণি ওর দিকে চেয়ে থাকেন। সামনে দেখা যায় বিরাট প্রাসাদ। ওরা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়েছে। হাতিটা কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে বিরাট ফটকের সামনে দাঁড়ালো। ওরা এসে পড়েছে আলং ঘরের সামনে।

মনোরঞ্জন ঠাকুর এখানের কর্তা ব্যক্তি। তার কাছে আগেই নির্দেশ এসে গেছে। বন্দীদের নিয়ে ওরা ভিতরে চলে গেল। বড় দরজাটা সশব্দে আবার বন্ধ হয়ে যায়। মুকুন্দ, খুশীকৃষ্ণ নির্বাক হয়ে গেছে। বনে-পর্বতে থাকে তারা। রাজধানীর এই জাঁকজমক, বিরাট চওড়া রাস্তা, লোকজন—আর এই বিরাট বাড়ি দেখে কি এক অজানা ভয়ে ওরা স্তব্ধ হয়ে গেছে।

রতনমণি তবু সহজভাবেই বল্লেন—এতো ভয় কিসের হে খুশীকৃষ্ণ?

খুশীকৃষ্ণ বলে—না ঠাকুর। তুমি তো সঙ্গে রয়েছো।

তবু ভয় হয়। ওরা যে তাদের বন্দী করে রেখেছে এটা বুঝতে দেরী হয় নি খুশীকৃষ্ণর।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে বনে পর্বতে, গ্রামে, গঞ্জে।

সাধারণ মানুষগুলো এতকাল ধরে ওই খগেনরায়, চৌধুরী আর

কিছু স্বার্থপর মানুষের শিকারে পরিণত হয়েছিল। ওদের জমি জায়গা যা কিছু ছিল সেগুলো প্রায় ওই মহাজনদের কবলে গেছে; সেই জমিতে এখন ওরা বেগার দেয়, আর 'জুম' চাষ করে নিজেরা বন্ধ্যা টিলার পর্বতে। ওদের সেই বেদনাহীন অস্তিত্বে রতনমণির কথাগুলো নোতুন একটি সাড়া এনেছিল।

তাইন্দা রায়, রামজয় রিয়াং-ওরাও ভাবনায় পড়েছে।

তাইন্দা রায় বলে কি অপরাধ করেছে ঠাকুর যে ফাটকে পুরবে তাকে?

অপরাধ কি তা জানে না ওরা।

আশ্রমের প্রাঙ্গণ ভরে উঠেছে জনতায়, দূর-দূরান্তরের পাহাড় বন গ্রাম গঞ্জ থেকে ওরা এসেছে ব্যাকুল হয়ে।

তৈন্দুল রিয়াংও একদিকে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা এখন কর্মব্যস্ত। তুইনানী ছড়ায় ওরা বিরাট টিলায় গড়ে তুলেছে নোতুন ক্যাম্প ঘর, তুইছার বুহার শালজঙ্গল এর মধ্যে ওদের বড় বড় মাচাং ঘরগুলোয় জমা হচ্ছে এই এলাকার বহু লোকের ধান। গম জমেছে সেখানের ধর্ম গোলায়। সেখানেও তারা বড় বড় ঘর তুলেছে, দিনরাত লোকজন কাজ করছে সেখানে, আর অনেকে ঘুরছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। এখন প্রতি সন্ধ্যায় রিয়াংদের ঘরে ঘরে ওঠে নামগানের সুর, ওরা নোতুন উৎসাহে মেতে উঠেছে।

জেনেছে এতদিন পর যে একসূত্রে তারা বাঁধা হয়ে বাঁচতে চায় মানুষের অধিকারে। একটি মানুষ সেই পথের সন্ধান দিয়েছে তাদের। আর তাকেই ওই রাজার সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেছে ঐ সদরে।

শক্তি রায় গজরাচ্ছে চোট খাওয়া বাঘের মত!

জানে সে রাজধানী থেকে বলপ্রয়োগ করে ঠাকুরকে উদ্ধার করা কঠিন কাজ।

এই বনপর্বতে হলে সেও দেখে নিত তার সামনে দিয়ে কি ভাবে ঠাকুরকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যেতো।

হঠাৎ শক্তি রায় শুধোয়—যদি না ছাড়ে কি করবে তোমরা ?

ওরা ভাবনায় পড়েছে। জানে না এরপর কোন পথ নেবে তারা। ওই একটি মানুষের অভাবে তাদের সবকিছু আশা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তাইন্দা রায় তবু বলে—ছেড়ে দেবে নিশ্চয় !

শক্তি রায় ওই আশাবাদী নয়। সে বলে ওঠে—ওরা না ছাড়লে আমরা সারা এলাকায় ওই চৌধুরীদের আর জোতদার মহাজনদেরও ছেড়ে কথা কইবো না। দরকার হলে খগেন রায়েরও সর্বনাশ করবো। এই এলাকায় আমরাই আমাদের অধিকার কায়েম করবো !

উত্তেজিত জনতা যেন একটা পথ পেয়েছে, তারাও চায় যেন হাউই-এর মত জ্বলে উঠতে, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে। তাই তারাও সমস্বরে গর্জন করে—তাই করবো আমরা। টাক্কাল-এর ঘায়ে ওদের মাথাগুলো বাঁশ কাটার মত টুকরো করে ফেলবো।

তাইন্দা রায়-এর উপর ঠাকুর সব ভার দিয়ে গেছেন। তাইন্দা জানে রতনমণি কখনও এইসব পছন্দ করেন না। প্রতিবাদ করবে তারা কিন্তু এই হানাহানি করে অযথা শক্তি ক্ষয় করে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারবে না সে।

তাইন্দা রায় বলে—এখন ওসব কথা থাক। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা কিছু খবর আসবেই। তার মধ্যে আমাদের কাজ থামবে না। আরও দূর-দূরান্তের রিয়াং আদিবাসীদের মধ্যে প্রচার করতে হবে। লোকজন কর্মীর দরকার।

শক্তি রায় বলে—সে কাজ চলছে, কিন্তু সাতদিনের মধ্যে খবর না এলে অন্য ব্যবস্থাই নেব তাইন্দা রায়। সেদিন আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

শক্তি রায়ও কর্মী। সে জানে কি করে দল গড়তে হয়। তার রক্তের ওই মত্ততাকে অস্বীকার করা যায় না।

রামজয় বলে—ওসব ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা যাবে শক্তি রায়। এখন সদরে যোগাযোগ করা দরকার। দেখা যাক কি খবর আসে।

শক্তি রায় তবু থামতে রাজী নয়। ও বলে চলেছে। —ঠাকুর ফিরে এলেও এই কথা আমার থাকবেই। ওই খগেন রায় আরি চৌধুরীদের জব্দ আমি করবোই। ওদের ঘা না মারতে পারলে চিরকালই আমাদের মার খেয়ে যেতে হবে।

...তৈন্দুলও কথাটা বিশ্বাস করে। তাই বলে সে—রায়জীর কথাটা সত্যি তাইন্দা, আমরা আর চুপ করে থাকতে পারবো না। ওদের জুলুমও বেড়ে উঠবে। এতকাল ধরে অনেক সয়েছি। আর কতো সইবো?

নয়ন্তী অবাক হয় তৈন্দুলের কথা শুনে। ওই শান্ত ছেলেটার বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। আজ নয়ন্তীও তাই চায়।

তার বাবাকেও ওরা ধরে নিয়ে গেছে। কান্তরায়-এর মেয়ে হয়ে চুপ করে এসব দেখবে না সে।

নয়ন্তী বলে—শুধু তাই নয়, আমাদের ইজ্জৎ নিতে চায় ওরা। আর আমরা চুপ করে সেই সব সয়ে চলেছি তাইন্দা খুড়ো?

তাইন্দা রায়ও জানে এসব। কিন্তু জানে তারা দুর্বল। তাদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আঘাত হানার সময় এখনও আসেনি। তাইন্দা রায় বলে—সব জানি, কিন্তু আরও লোক চাই. অস্ত্রশস্ত্র চাই আমাদের, বন্দুক চাই, গুলি বারুদ চাই।

শক্তি রায়ও ভাবছে কথাটা। গুলি বন্দুক তাদের দরকার। ওই টাকাল দিয়ে এতবড় প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। দিশী বন্দুক কিছু পেতে পারে, ক্যাপদার বন্দুক, গুলিও চাই।

শক্তি রায় বলে—তার চেষ্টাও করছি তাইন্দা রায়। ওসব আমাদের চাই। কিন্তু টাকা পয়সা—

রামজয় আজ দেখেছে তাদের ফেরার পথ নেই। এগিয়ে যেতে হবে। তার এতকালের সঞ্চিত অর্থও বেশ কিছু আছে! আজ সে

বলে—তার যোগাড় কিছু হয়ে যাবে। তুমিও দেখো ওসব কোথায় পাওয়া যায়। দরিদ্র জনতা তাই উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে। তারা অরণ্য পর্বতের গহনে এমনি একটি প্রতিবাদের প্রাচীর গড়ে তুলবে।

মেজর ব্রজেন্দ্র দেববর্মা দেখছেন ছোট্ট মানুষটিকে। পরণে গেরুয়া, মাথায় জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। শীর্ণ চেহারা নিয়ে রতনমণি তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পাশে কান্তরায়—খুশীকৃষ্ণ—মুকুন্দ। মেজর দেববর্মা বলেন—রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন আপনারা?

রতনমণি অবাক হন—রিয়াংরা বেইমান নয়, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তারা করেনি, করবে না।

—তবে এইসব করছেন কেন? খগেন রায়কে মানবেন না, চৌধুরীদের ডম্বুরুতীর্থে মারধোর করেছেন। গ্রামের লোককে খেপিয়ে তুলেছেন?

দেববর্মার কথায় কান্তরায় বলে—আজ্ঞে জুলুম করছেন ওরাই। চাঁদা দ্বিগুণ করে নিজেদের পকেটে পুরেছেন, চৌকিদারী ট্যাক্স বাড়ালেন, ছুতোনাতায় গরীব রিয়াংদের ধরে নিয়ে গিয়ে জরিমানা করবেন।

মেজর দেববর্মার মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠে।

মনোরঞ্জন ঠাকুর বলে ওঠেন—সে টাকাতো সমাজের কাজেই ব্যয় করা হয়।

রতনমণি বলেন—প্রায় কুড়িহাজার টাকা ওরা জরিমানা আদায় করেছেন। সমাজের কোন কাজে সেটা ব্যয় করেছেন দয়া করে জানাতে বলুন তাঁদের। সে টাকার হিসাব পাবেন না, সব গেছে ওদের হাতে।

স্তব্ধতা নামে সারা ঘরে।

জানলা দিয়ে দূরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। সন্ধ্যা নামছে বকুল বীথিতে। মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি ওঠে। দুহাত তুলে

নমস্কার জানালেন দেবতার উদ্দেশ্যে রতনমণি। দুচোখে তাঁর স্নিগ্ধ চাহনি। বলে ওঠেন তিনি,

—রিয়াং কখনও রাজার বিদ্রোহী হবে না, সে রাজার কাছে যুগ যুগান্তর থেকে শপথবদ্ধ। আপনিও জানেন সেই অতীতের কথা। ডম্বুরুতীর্থে পূজা নিয়েই গোলমাল বাধে রাজার লোকদের সঙ্গে ওই রিয়াংদের। সেই সময় মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য বিদ্রোহী রিয়াংদের বন্দী করে আনেন রাজধানীতে, বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কথা সাব্যস্ত হ'ল।

মহারানী গুণবতী সব শুনে এগিয়ে আসেন। তিনিই একটি পাত্রে মাতৃদুগ্ধ রিয়াংদের পান করিয়ে তাদের সন্তানের মর্যাদা দিয়ে মুক্ত করেন।

কান্তরায় বলে—আজও সেই পিতলের পাত্র রিয়াংদের কাছে পবিত্র জিনিষ, তারা বিদ্রোহ করবে না শপথ নেয়। মোচকা দফা, তুইমাইফা দফা, রাইকচা দফা, চড়কী দফা—চৌদ্দ দফা রিয়াংদের সবাই ওই শপথ মেনে চলেছে।

রতনমণি বলেন—প্রতিবাদ ওই খগেন রায়দের বিরুদ্ধে। আপনারা এর সুবিচার করুন এই আর্জি আমরা নিয়ে এসেছি।

মেজর দেববর্মা একটু চিন্তায় পড়েন। তিনিও বুঝেছেন যে অত্যাচার চলেছেই। আর খগেন রায়কেও রাজ অধিকার দেওয়া হয়ে গেছে সব তদন্ত ঠিকমত না করেই। ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেছে।

তাই একটু ভেবে দেখতে হবে। তিনি বলেন।

—পরে সব তদন্ত করা হবে।

আশাভরে বলে ওঠে কান্তরায়।

—আমরা তাহলে যেতে পারি হুজুর?

মেজর দেববর্মা চাইলেন অন্য সহকারীদের দিকে।...মিঃ দেববর্মা ছিলো ওদিকে। সে জানে ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। তাই জানায়।

—এখনও সব তদন্ত শেষ হয়নি। ওসব হয়ে গেলে যেতে পারবেন।

রতনমণি যেন ব্যাপারটা বুঝেছেন। তাই তার মুখে একটু হাসির আভা যুটে ওঠে। তিনি বলেন।

—আলং ঘরেই এখন কিছুদিন থাকতে হবে দেখছি। জয় গুরু।

ওদের নিয়ে চলে গেল দেহরক্ষী সৈন্যদল। তখনও মেজর দেববর্মা কি ভাবছেন। একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা যেন ভুলই করেছেন।

খাস বেয়ারা দশরথের ডাকে চাইলেন মেজর দেববর্মা।

—বাড়ি যাইবেন না স্যার? রাত হইছে।

…বন্দীদের নিয়ে চলেছে পাহারাওয়ালা।

কান্তরায় একটু ভাবনায় পড়েছে। ওরা বুঝেছে যে সহজে ছাড়া পাবেনা তারা, তাদের প্রতিপক্ষ এবার প্রতিশোধই নিয়েছে। তাদের এখানে বন্দী করে রেখে এবার খগেন রায়, তীর্থ চৌধুরী, বিজয়বাবুর দল নিরীহ ওই লোকদের উপর অত্যাচার চালাবে।

—কি হবে ঠাকুর?

রতনমণি চুপ করে কি ভাবছেন। পাহারাদার ওদের কথা শুনে বলে—চুপ কইরা যাবেন কত্তা। কথা কওনের হুকুম নেই।

অর্থাৎ ওরা বন্দীই সেটা সেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

…ওদের ঘরে তুলে দরজা বন্ধ করে তালা দেওয়া হয়ে গেছে। …চারিদিকে নেমেছে রাতের স্তব্ধতা। ওদের চোখে ঘুম নেই।

হঠাৎ দরজাটা কে যেন খুলছে, ঠিক জোরে নয়, ধীরে ধীরে তালাটা খুলে গেল। একফালি আলোয় দেখা যায় একটা মুখ।

—ঠাকুর।

…চমকে চাইলেন রতনমণি। লোকটা যেন তার চেনা।

ভ্রমর এসেছে, সঙ্গে একজন লোক। রতনমণি এক নজরেই

চিনতে পারেন ওকে। আশ্রমে ওকেই সেবার অসুখ থেকে সুস্থ করে তুলেছিলেন।

ভ্রমর চুপিসারে বলে।

—এর সঙ্গে আপনারা চলে যান। এই রাতেই চলে যাবেন সহর থেকে ওই বন পর্বতে। দেরী করবেন না। সব ব্যবস্থা করা আছে।

...ভ্রমর চলে গেল অন্য দিকে। লোকটা ধীরে ধীরে দরজার তালা ঠিকমত বন্ধ করে ওদের নিয়ে অন্যদিকে আলো আঁধারির মাঝে পিছনের দেওয়ালের ধারে চলেছে।

উঁচু দেওয়ালের এদিকে পার হবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, বাইরে কয়েকটা কাঁঠাল জাম গাছের জটলা জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে, সেখানে দেওয়াল ঘেঁসে কালো পাহাড়ের মত হাতিটা অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিঠেই বসে পড়েছে তারা। হাতিটাও ওই রাতের অন্ধকারে চলেছে।

...হাবড়া নদীর জল পার হয়ে চলেছে অন্ধকারে হাতিটা। ওর গতিবেগও বেড়ে ওঠে। খোয়া ইট ফেলা উদয়পুর যাবার পথ ছেড়ে 'চড়িলাম' এর কাছে সিপাহীজলার ঘন বনের মধ্য দিয়ে চলেছে তারা।

—ঠাকুর!

...রতনমণি চাইলেন মাহুতের দিকে। চমকে ওঠেন, রতনমণি আবছা আলোয় ওকে দেখে—তুমি! সেদিন জেলখানায় তুমি নিয়ে গিয়েছিলে কোতোয়ালী থেকে, না?

হাসল ভুবন। মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা গায়ে জড়ানো ময়লা লাইসামপি। ভুবন বলে

—আজ ঘরে ফিরাই দিলাম ঠাকুর।

—তোমাকে ধরতে পারবে না? কান্তরায় শুধোয়।

ভুবন বলে—এ হাতি তো এখন সদরে নাই, চরার জন্য বনে

এসেছে। ওরতো খোঁজও এখন হবে না। আর গরবিনী ও কাউকে বলবে না। কি কস্ রে গরব?

হাতিটা শুঁড় নাড়তে নাড়তে চলেছে বনের বুক চিরে। ভোর হয়ে আসছে। বাতাসে কুয়াসার ভিজে ভিজে গন্ধে মিশেছে নাগেশ্বর স্যাণ্টার্ণ ফুলের উদগ্র সুবাস। সন্ত ঘুম ভাঙ্গা পাখীগুলো কলরব করে। আঁধার আকাশের যবনিকা ফিকে হয়ে আসছে। ভুবন ওদের বনের মধ্যে হাতি থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে।

—চলি ঠাকুর।

হাতিটা নিয়ে সে বনের গভীরে চলে গেল। কেউ দেখেনি—ক'টি মানুষ ভোরের দিকে কুয়াসার চাদর জড়ানো পরিবেশে বন থেকে এবার সুদূরের দিকে এগোলো। দূরের গ্রাম বসতে তখন মানুষের ঘুম ভাঙ্গছে।

আশ্রমে কলরব ওঠে। গোলাকৃষ্ণ ছুটে এসে রতনমণির পায়ে পড়ে জয়ধ্বনি দেয়—জয় গুরু।

তাইন্দা রায় ও বের হয়ে আসে। বের হয়ে আসে রামজয়। ও যেন জীবন ফিরে পেয়েছে। রতনমণিকে প্রণাম করে ওর পায়ের কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

—তুমি ফিরে এসেছো ঠাকুর?

রতনমণি ওকে বুকে তুলে নেন।

চারিদিকের বসতিতে খবরটা হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে।

হাটের লোকজনও অবাক হয়। ওদের কেনা বেচা কোন রকমে সেরে ওরাও এসে হাজির হয়েছে আশ্রমে।

তাইন্দা রায়, শক্তি রায় ওই জনতার ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। নামগান ধ্বনিত হয় জনতার মুখে মুখে। খুশীকৃষ্ণ আজ বেশ কিছুদিন পর এবার বাঁশবনের ছায়া আলোয় বেণুবনের মর্মরে সুর তোলে—

—জগণি গুরু সে অব

মানিয়া মুনুছে

রতন গুরু সে অব

মানেখা আমান্নং ন অ।

বিজয় আমান্নং ন অ

বিজয় কালী মা।

ওরা নামকীর্তন করে চলেছে, জগতের গুরু ওই রতনমণি। মানুষের আইন তাকে বাঁধতে পারে না। সেই রতন আমাদের গুরু। তুমি আমাদের পিতা-মাতা। জয় বিজয় তোমার কাছে। তুমিই মা কালী।

…নয়ন্তীও এসে পড়েছে।

বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে মেয়েটা। কান্ত রায় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলে—কাঁদিস নে মা। শক্ত হ, বুক বাঁধ। সামনে অনেক কাজ।

বাইরে এসে তৈন্দুল রিয়াংও দেখছে নয়ন্তীকে। ওর মুখটা আষাঢ়ের মেঘজমা আকাশের মত থমথমে, চোখের জলে ওর ভিজে মুখখানায় বৃষ্টি ভেজা কচি শাল পাতার সবুজ আভা ফুটে উঠেছে।

—নয়ন্তী!

নয়ন্তী ওর ডাকে চাইল।

একফালি চাঁদ উঠেছে বনসীমায়, ওর ছায়া আলোর হিজিবিজি অক্ষরে লেখা কি কাব্য রেখা বনের শিশিরে ভেজা ঘাসের বুকে। তৈন্দুল বলে—বাবাকে কথাটা বলবি এবার ?

কথাটা কি জানে নয়ন্তী। ওরা ঘর বাঁধতে চায় দুজনে।

নয়ন্তী চাইল ওর দিকে। বলে সে—ঠাকুরের মত নিতে হবে।

চমকে ওঠে তৈন্দুল, রতনমণির সামনে দাঁড়িয়ে ও কথা সে বলতে পারবে না। অথচ সারা মনে তৈন্দুলের একটা নীরব ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে। কতদিন পথ চেয়ে আছে সে ওই নয়ন্তীর।

নয়ন্তী দেখছে তৈন্দুলকে, ওর বলিষ্ঠ চোখমুখের কাতর ভাবটা নয়ন্তীর নজর এড়ায় নি। ও বলে। —চল! নামগান হচ্ছে। দিনরাত তোর ওই ভাবনা, এদিকে কত কি হচ্ছে তার দিকে নজর নেই।

তৈন্দুল বলে—নজর আমার সব দিকেই। শক্তি রায়জীর আমাকে নাহলে চলে না। ওতো বলে লড়াই হবে।

নয়ন্তী শুনছে কথাগুলো।

লড়াই এর নাম শুনে নয়ন্তীর ডাগর দুচোখে কি ভয়ের ছায়া নামে। ওতে অনেক লোক ক্ষয় হয়, রক্তারক্তি হয়। তৈন্দুল ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে,

—ভয় পেয়ে গেলি নাকি রে? ধ্যাৎ—মরতে তো একদিন হবেই। তাই তার আগে তোকে নিয়ে দুদিন ঘর বাঁধার সুখটাও পেয়ে নিতে চাই রে নয়ন্তী।

নয়ন্তীর দেহটা তৈন্দুলের দেহে মিশেছে কি ব্যাকুলতা নিয়ে। নয়ন্তী হাত দিয়ে ওর মুখটা চেপে রেখে বলে ওঠে।

—ও কথা বলিস না তৈন্দুল। তোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

…ওদের দু'জনের নিবিড় সান্নিধ্যে ওরা যেন কোন এক স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে গেছে, সেখানে ভেসে থাকে বনমর্মর, পাখীর কাকলি আর নাগেশ্বর ফুলের মদির সুবাস। এই তাদের কাছে ক্ষণিক স্বর্গরচনায় আশ্বাস, এই নিয়ে এত দুঃখ বিপদের মাঝেও তারা বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

খগেন রায় এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরছে দলবল নিয়ে। এখন সেইই স্বীকৃত 'রায়কাঞ্চন', আর তার চোখের সামনে কয়েকটা লোকের কথা মনে হয়, তাদের এবার সামাজিক দণ্ড দেবে, কঠিন দণ্ড। ওদের বিষয়-সম্পত্তিও নীলামে চড়াতে পারবে সে।

খগেন রায় নিশ্চিন্ত মনে উদয়পুর ফিরে এসে এবার জানায়।

—তীর্থবাবু, বিজয়বাবু এবার অবাধ্য প্রজাগুলোকে তোমরাও

শিক্ষা দাও। যাতে ব্যাটারা মাথা তুলতে না পারে। আর ঘরপিছু একজন জোয়ানকে রক্ষীবাহিনীতে নাম লেখাতেই হবে। না হলে ওদের ধরে এনে বেশ দাওয়াই দিয়ে দেবে।

বিজয়বাবু একটু ইতিউতি করে—মানে একেবারে এই পথ নেব?

খগেনবাবু হাসে—আর ভয় কি? ওদের নেতা ওই দেবতা তো জেলে। এখন আরও ক'টাকে ধরে এনে পুরে দিচ্ছি। ডাকাতির দল গড়া ঘুচিয়ে দেব। ওসব ডাকাতি করার জন্যই দল আড্ডা খুলছিল ওরা। শুনলেন তো সদরেও ওরা তাই বলেন।

তীর্থপতি শুনছে কথাটা। মনে হয় একটা পথ এবার নিতেই হবে ওদের। ওদের মাথা তোলার চেষ্টাকে বানচাল করতেই হবে। এই তার সুযোগ।

কালিপ্রসাদও তৈরী ছিল, আর মৈতুল এখন সেরে উঠে যেন চোটখাওয়া জানোয়ারের মত ক্ষেপে রয়েছে। সেও বলে—তাই করুন বাবু। বলুন তা হলে বেগাফার তাইন্দা রায়কেই এবার তুলে আনবো।

খগেনবাবু জানে তাইন্দা রায় কঠিন লোক, একেবারে ওখানে হাত দিতে চান না তিনি। ক্রমশঃ উপরে উঠতে হবে। তাই বলে।

—ওকে নয়, ওর ভাইপো গুপীনাথটাকেই ধরে আন। সেবার চাঁদা দেয় নি।

তীর্থপতিও কায়দাটা বুঝে বলে—আমার প্রজাদের মধ্যে কটা রতনমণির চ্যালা আছে, সে ক'টাকেও ধরে এনে একটু দাওয়াই দেব।

খগেন রায় বিচক্ষণ ব্যক্তি। ও পরামর্শ দেয়।

—এমনি আশপাশের একটু সঙ্গতিপন্ন লোককে ধরে এনে জুলুম করো, ভয় দেখাও ওদের। ওদের ও মনটা বুঝে নিয়ে তারপর ওই মাথা ক'টাকেও ধরতে হবে। দু'চারটার নামে কোতোয়ালীতে ডাইরী করিয়ে কেস দেবে আগে থেকে।

অর্থাৎ এরা এবার হিসাব কষে এগোতে চায় যাতে চারিদিকের

এই সম্মিলিত আক্রমণে ওই গরীব মানুষগুলো নাজেহাল হয়ে যায়। তার পরই ওরা মাথা নীচু করে এদের হুকুম মানতে বাধ্য হবে।

মৈতুল হুকুমের অপেক্ষাতেই ছিল। তাই হুকুম পাওয়ামাত্র লোকজন নিয়ে গিয়ে হামলা করেছে বগাফার ওদিকের টিলায় গুপীনাথের বাড়িতেই।

গুপীনাথের কয়েকখানি লুঙ্গা জমি রয়েছে, বাড়িটাও বেশ বড়, সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, গুপীনাথ সেখানে কিছু ধান-এর গাদা করে রেখেছে। সারা দিনের কাজের পর সন্ধ্যায় আরও ক'জন প্রতিবেশী মিলে গুরুদেবের বন্দনা গান-এর আসর করেছে। গুপীনাথ দোতরা বাজাতে পারে ভালো।

হঠাৎ ওদের গানের আসরে মৈতুল রিয়াংকে দলবল নিয়ে হাজির হতে দেখে ওরা একটু ঘাবড়ে গেছে। ক'দিন ওদের সকলেই ভাবনায় রয়েছে। রাজদরবারে রতনমণিকে ডেকে নিয়ে গেছে, এমন সময় মৈতুলকে দেখে গুপীনাথ একটু ঘাবড়ে যায়।

মৈতুল বলে—এখুনিই অমরপুরে যেতে হবে তোকে।

—এই সন্ধ্যা বেলাতে? গুপীনাথ আপত্তি করে।

মৈতুল বলে—না গেলে বেঁধে নিয়ে যেতে হবে। রায়কাঞ্চনের হুকুম। আর সেবার বাসিপুজোর চাঁদা দাও নি, ওই ধান-এর বস্তাগুলো রায়কাঞ্চনের হুকুমে নিয়ে যাওয়া হবে।

তাদের লোকজন তার আগেই ধানের বস্তাগুলো তুলেছে, গুপীনাথ বাধা দেবার চেষ্টা করে।

—ওই আমার খোরাকি ধান মৈতুল ভাই! রায়কাঞ্চনকে আমি গিয়ে বলবো।

মৈতুল জানায়—গিয়ে যা বলার বলো। ধান নিয়ে যেতেই হবে।

তখন এসব খেয়াল ছিল না? যাও সেই দেবতার কাছে চল এখন!

ওরা জোর করেই গুপীনাথ রিয়াংকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে নিয়ে চলেছে। পিছু পিছু ওর বৌ কাঁদতে কাঁদতে আসে। কিন্তু তার কান্না অনুরোধে কোন কাজই হয় না।

দক্ষিণ মহারাণীর ওদিকে গঙ্গারাম রিয়াং বেশ সঙ্গতিপন্ন চাষী। ওদিকের অনেক মাল জমির মালিক সে। তার মেলামেশাও চৌধুরীদের সঙ্গে। তীর্থ চৌধুরীর কথাও শুনেছে সে।

আরও শুনেছে রিয়াংদের উপর রাজদরবার মোটেই খুশী নয়, তারা নাকি রাজার বিরোধিতা করছে। দরবার তাদেরও শাস্তি দেবে।

গঙ্গারাম রিয়াং বলে—আমি তো ওদের চাঁদা দিই নি, ধর্ম গোলায় ধান দেই নি। আপনাদের সঙ্গেই আছি।

তীর্থপতি জানায়—ওদের দলের কিছু লোকজন তো তোমার প্রজা, তাদের কি করেছো? তাদের ভয় দেখিয়ে ওই দল ছাড়াতে হবে। না হলে তোমার নামেও কোতোয়ালিতে রিপোর্ট দিলে জমি-জায়গা দরবারে খাস হয়ে যাবে।

চমকে উঠে গঙ্গারাম। কথাটা সেও ভেবেছে।

এইভাবে সব হারাতে রাজী নয় সে। তাই গঙ্গারাম রিয়াং ওর চাষীদের মধ্যে কয়েকজনকে ডেকে এনেছে।

রাইতাল রিয়াং একটু জেদী লোক। সারাদিন মাঠে পড়ে থাকে কাজ নিয়ে, আর ফসল ফলায় প্রচুর। তার টিলার সারা গায়ে চাষ করেছে তেলেঙ্গী—জলডুবি আনারসের। তার সেই আনারসের কদর শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। ধান, আলু সরষেরও চাষ করে। তাই দুটো পয়সা তার ঘরে আসে।

গঙ্গারাম রিয়াং-এর দাবী তার উপরই বেশী।

—তোর বড় ছেলেটাকে রক্ষীবাহিনীতে দিতে হবে। আর

সেবার গাঁওবুড়োর কথা মানিস নি বড়ঠাকুরের পূজোর দিনও চাষ করেছিলি। তার জন্যে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

রাইতাল প্রতিবাদ জানায়—ছেলেটা চাষ-বাষ করে, ওকে ছাড়ান দিতে হবেই। আর ওই চাষ করার নালিশটাও মিছে কথা।

গঙ্গারাম রিয়াং ওদের মুখের জবাব শুনে গর্জে ওঠে।

—রায়কাঞ্চনের হুকুমও মানবি না?

রাইতাল ওসব মানতে রাজী নয়। ও জানায়।

—ওই খগেন রায় রিয়াং 'রায়কাঞ্চন' হ'ল কবে যে তার হুকুম মানতে হবে? ঠাকুর হুকুম দিলে তবে মানবো। তুমি ট্যাকসো ভাগচাষের ধান পাও, তাই দিমু। ওর বাইরে আর কিছুই দিমু না।

গঙ্গারাম রিয়াং ছোট খাটো সর্দার, এখন খগেন বাবুদের মদত পেয়েছে, পিছনে চৌধুরীরাও আছে। ফলে গঙ্গারাম হুঙ্কার ছাড়ে।

—সরকারী হুকুম মানবি না? রায়কাঞ্চনের হুকুম মানবি না, মগের মুলুক পেয়েছিস নাকি ব্যাটা হারামজাদা? ওসব না দিয়ে এখান থেকে উঠতে পারবিনা আর সরকারী হুকুম না মানার জন্যে তোকে সদরে চালান যেতে হবে।

অবাক হয় রাইতাল রিয়াং, আজ ওকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে চলেছে অমরপুর তহশিলে, সেখানে তার বিচার হবে। লোকটা ঘাবড়ে গেছে। মনে হয়, সত্যিই আজ বিপদে পড়েছে সে, আর তার বড় ছেলেটাই মাঠের কাজ দেখে, তাকে ওই রক্ষীবাহিনীতে পাঠাতে পারবে না। তার নিজের যা হয় হোক, তাই লোকটা মুখবুজে ওদের সঙ্গে চলেছে অমরপুরের দিকে।

গ্রামে গঞ্জে খবর রটছে, অত্যাচারের খবর। ওই খগেন রায়, চৌধুরীদের অনেকে, মায় সর্দাররা অবধি রতনমণিকে সদরে আটকে রাখার পরই অন্য মূর্তি ধরেছে।

কুমারিয়া ওঝাও খুদে সর্দার। এর মধ্যে সেও জোর করে গোটা তিনেক ছেলেকে মার ধোর করেছে তুইনানী বসতিতে আর বাধ্য

হয়ে ছেলেগুলো এসেছে রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে অন্য কোন পথ না পেয়ে। দিকে দিকে যেন একটা আতঙ্কের রাজ্য গড়ে তুলছে ওই খগেনবাবু আর চৌধুরীর দল। সর্দাররাও অনেকে এগিয়ে এসেছে।

খগেন বাবু ক'দিনেই প্রতাপ প্রতিপত্তি বেশ কায়েম করে নিয়েছে। হীরাছড়ার সঙ্গতিপন্ন লোক গোবিন্দরাম রিয়াং এসেচে ওর কাছে। কয়েকশো টাকা দিয়ে বলে।

—ধনেপ্রাণে মারবেন না রায়কাকন! আপনার দয়াতেই বাস করছি—তাই আপনার কাছেই এলাম আশ্রয়ের ভরসায়!

খগেন রায় দেখেছে তার কাছে অনেকেই আকুতি জানাচ্ছে। তবু খগেন রায় বলে—ওই রতনমণির ডাকাতদলকে ঠাণ্ডা করে দোব গোবিন্দ,...ওদের চাঁদা—ধান দাও নি তো?

—আজ্ঞে না! ওদের গাঁয়ে বসতিতে আসতে দিই নি! গোবিন্দ জানায়।

খগেন রায়, বিজয় চৌধুরী—রাজারাম চৌধুরীরা অভয় দেয়।
—ঠিক আছে। ওদের যেন গাঁয়ে ঢুকতে দিও না! দরকার বুঝলে আমাদের খবর দেবে। তোমার কোন ভয় নেই। হ্যাঁ—বরং ওই শক্তিরায়ের নামে একটা ডাইরী করে যাও।

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বের হয়ে গেল। ওরাই এই এলাকার দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে উঠেছে। সদর কোতোয়ালীর পুলিশ অফিসার মিহির বাবুও এসেছেন। খানা পিনার আয়োজন চলেছে। এখন তাদের আর ভাবনা নেই।

বিজয় চৌধুরী বলে।

—ক'দিনেই ওই ডাকাত দলের সবকটাকে এবার ধরুন দারোগাবাবু, বেশ ক'জন তো ডাইরী করেছে। আর ওদের বিরুদ্ধে যদি কেউ ডাইরী করতে আসে সেগুলো যেন লেখা হয় খাতায়। আপনার লোকদের একটু বলে দেবেন।

মিহিরবাবু বিজ্ঞ ব্যক্তি। উনি জানেন কোনদিকে হাওয়া বইছে। তাই শোনায়—ওসব লেখা হচ্ছে খগেনবাবু, তারপর দেখুন না ওদের এক একটাকে এবার ধরে এনে উদয়পুরে গারদে পুরছি।

গঙ্গারামও এসেছে হুজুরদের কাছে।

প্রণামী এনেছে তাজা একটা খাসি ছাগল, বাঁশের চোঙ্গা ভর্তি বাড়ির গরুর তৈরী ঘি আর বস্তা খানেক সুগন্ধি খাসা চাল।

গঙ্গারাম ওগুলো নামিয়ে রেখে নমস্কার করে জানায়,

—আপনাদের সেবার জন্যে আনলাম বাড়ির জিনিষ।

অবশ্য ওর কোনটিই গঙ্গারামের বাড়ির নয়। চাষীদের ঘর থেকে জোর করে সংগ্রহ করা হয়েছে, তুইনানির কুমারিয়া ওঝা আরও চতুর ব্যক্তি, সে এর মধ্যে রক্ষী বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে মীমাংসার জন্য বেশ কিছু লোকের কাছ থেকে টাকা কড়িও আদায় করেছে। কুমারিয়া ওঝা বলে।

—তাহলে খবর সবর ভালোই ওদিকে, কি বল গঙ্গারাম?

গঙ্গারাম খুশি হয়ে বলে—বাবুদের দয়াতে ভালোই আছি। তাই বলছিলাম ওঝা মশাই, সমাজে শাসন না থাকলে চলে? ওই দেবী সিং, ওর রায়কাঞ্চন গিরি গেছে, সমাজে শাসন এসেছে। আর ওই ব্যাটা রতনমণি গেছে বেঁচেছি আমরা।

খগেন রায় বলে—এবার বাকী কটাকেও দেখছি। তাহলে দারোগাবাবু, এবার তাইন্দা রায় রিয়াং, শক্তি রিয়াং এ দুটোকে ফাটকে পুরুন।

দারোগাবাবু নিমকের মর্যাদা জানে। বেশ ভূরিভোজনও হয়েছে পানাদি পর্বের পর। তাই বলেন।

—ওসব এবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কাল—পরশু দুদিনে ক'টা জোয়ান ছেলে রক্ষীবাহিনীতে এসেছে জানেন? ওদের দিয়েই এবার রিয়াংগুলোকে ঠাণ্ডা করে দোব। বলে না—তোর শিল, তোর নোড়া তোর ভাঙ্গবো দাঁতের গোঁড়া।

হঠাৎ এমন সময় ঝড়ের বেগে মৈতুলকে ঢুকতে দেখে চাইল খগেনবাবু, হাঁপাচ্ছে মৈতুল। ওর জামাটা ছেঁড়া—চুলগুলো উস্কো-খুস্কো গায়ের লাইসামপিটাও নেই।

মৈতুল বলে ওঠে—সর্বনাশ হয়ে গেছে খগেনবাবু। ওই শুনুন।

কান পেতে ওরা শুনছে স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে ড্রিম্ ড্রিম্ দামামার শব্দ, কি রহস্যজনক শব্দটা ছড়িয়ে পড়ছে দিগ্‌দিগন্তরে। বুনোমোষের শিং-এর শিঙ্গা বাজার তীক্ষ্ণ সুর ওঠে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় জমাট আঁধার নামা টিলাগুলোয় মশালের আলো জ্বলছে। কাঁপছে আলোগুলো।

ওই সুপ্তি মগ্ন অরণ্য পর্বত যেন এক বিচিত্র রহস্য নিয়ে জেগে উঠেছে হঠাৎ। খগেন রায় চমকে ওঠে—কি ব্যাপার?

মৈতুল হাঁপাতে হাঁপাতে বলে,

—রতনমণি সদরের আলংঘর থেকে পালিয়ে এসেছে রায়মশায়? স্বচক্ষে দেখে এলাম ওকে।

চমকে ওঠে খগেন রায়—কি যা তা বলছিস?

—ঠিকই কইছি বাবু! আর ঠাকুরকে দেখে রিয়াংরাও মেতে উঠেছে। তাই ওই নাগরা বাজিয়ে খবর পাঠাচ্ছে চারিদিকে।

মৈতুলের চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন। গঙ্গারাম-কুমারিয়া ওঝাও ঘাবড়ে গেছে। বিজয় চৌধুরী বলে—ওই আলংঘর থেকে কেউ বের হয়ে আসতে পারবে না।

মৈতুল বলে—এসেছে চৌধুরীবাবু। ওরা বলছে রতনমণি ঠাকুর নাকি দেবতার অংশ। ও মাছি হয়ে গারদ থেকে বের হয়ে এসেছে। কেউ ওকে আটকাতে পারবে না।

গঙ্গারাম ভীত কণ্ঠে বলে—এবার কি হবে রায়মশাই?'

বড় দারোগাবাবুর মনের রঙ্গীন ভাবটা কেটে গেছে। মিহির-বাবু তবু সাহস ভরা স্বরে বলার চেষ্টা করেন।

—আবার গারদেই পাঠানো হবে ওকে। কোন ভয় নাই।

হঠাৎ যেন দামামা ওই রামশিঙ্গার শব্দটা কাছাকাছি শোনা যায়।

দারোগাবাবু বলে—আমি যাই রায়মশায়, এতক্ষণ বোধহয় কোতোয়ালীতে খবর এসেছে।

শুধু হাতে মিহিরবাবু এখান থেকে যান না, তাই খগেনবাবুর কিছু নজরানা নিয়ে বের হয়ে গেলেন।

লোকগুলো হঠাৎ যেন চমকে উঠেছে কি এক বিচিত্র সংবাদে।

তখনও একটানা সুরে রাতের অন্ধকারে ওই গুরু গম্ভীর শব্দটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে—দ্রিম্ দ্রিম্ দ্রিম্।

রতনমণি চুপ করে বসে আছেন। তার মনের অতলে একটা জ্বালা ফুটে উঠলেও তার বহিঃপ্রকাশ নেই। তিনি স্তব্ধ-ধ্যানমগ্ন। আজ ক'দিনেই অনেক কিছু দেখেছেন তিনি। ওই অবস্থায় মানুষ গুলো অনেকেই এসেছে তাঁর কাছে সর্বস্ব হারিয়ে।

গুপীনাথ রিয়াং এসেছে, তার ছেলেকে ওরা জোর করে ধরে নিয়ে গেছে সদরে, আটকে রেখেছে। তাকে জরিমানা করেছে রায়কাঞ্চন-এর হুকুম না মানার জন্য। বাড়ি থেকে দুটো গরু, একটা শুয়োরও তুলে নিয়ে গেছে।

এসেছে রাইতাল রিয়াং, তারও খোরাকি ধান গেছে, কিছু টাকাও দিতে হয়েছে, আর ওর সর্বাঙ্গে প্রহারের দাগ।

এসেছে কলাছড়া থেকে রোহিনী ওঝা তাকেও দণ্ড দিতে হয়েছে।

শক্তি রায় বলে ওঠে—এসবও চুপ করে সইতে হবে ঠাকুর!

তাইন্দা রায় বলে—ওরা ভেবেছিল তোমাকে ফাটকে পুরে দিয়ে এসেছে। তারপর এইভাবে আমাদের শেষ করবে ওরা। কিন্তু আমরাও সইবো না।

…রতনমণি বলে—নিজেরা তৈরী হও শক্তি রায়, তুইনানী তুইছার বুহায় ঘাটি গড়ার কাজ শেষ করো। আরও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। না হলে এসবের জবাব দেওয়া যাবে না।

কান্ত রায় মনে মনে আজ তৈরী হয়েছে, সেও প্রতিঘাত হানতে চায়। তাই সে বলে—এই সব সহ্য করলে ওরাও পেয়ে বসবে। টাকা-পয়সা কেড়ে নেবে—

হাসলেন রতনমণি! বলেন তিনি।

—টাকা! দিন আসছে কান্ত রায় যেদিন এই রাজারাণীর ছাপ মারা টাকা, এই নোট-এর কোন দামই থাকবে না। এ রাজ্যও থাকবে না। সেদিনের আর দেরী নাই। ছোট-খাটো সংঘাতে শুধু বৃহত্তর লড়াই-এর প্রস্তুতি বাধা পাবে মাত্র।

শক্তি রায় কি বলতে গিয়ে থেমে গেল।

তাইন্দা রায়ও ভাবছে কথাটা।

সন্ধ্যার তারাজ্বলা অন্ধকারে ওই অবস্থায় লোকগুলোর আর্তস্বর বেজে ওঠে। —তা হলে কোন প্রতিকারই হবে না ঠাকুর? আমরা কার কাছে যাবো?

মানুষগুলো কোন জবাব না পেয়েই চুপ করে আছে। গুপীনাথ বলে। —তা হলে খগেন রায়ের পায়ে পড়া ছাড়া গতি নাই।

রাইতাল বলে—ওদের হাতেই মরতে হবে দেখছি। ভাবছিলাম প্রতিকার হবে অন্যায়ের। এর বিচার পাবো।

রতনমণি দেখছেন অসহায় মানুষগুলোকে। ওদের আশাহীন করুণ মুখে কি হতাশার আঁধার নেমেছে। দলে দলে ওরা এসেছিল বাঁচার আশ্বাস নিয়ে, কিন্তু সেই আশ্বাস দিতে পারে নি রতনমণি। ওদের রক্ষা কবার ব্রত নিয়ে যেন পিছিয়ে পড়েছেন ভয়ে; নিজের মনের দুর্বলতার জন্য।

শক্তি রায় যেন নীরব একটা বিক্ষোভে ফুঁসছে।

কান্ত রায়, তাইন্দা রায়, মুকুন্দ ওরাও দেখছে। বলে ওঠে তাইন্দা রায়। —ওদের অন্যায়গুলোর প্রতিকার করতে চাই। ওই রায়কাঞ্চনকে আমরা মানবো না। সারা রিয়াং সমাজ এবার প্রতিবাদ করবে। এর জবাব দেবে। তুমি মত দাও ঠাকুর!

রতনমণির মনে হয় ধাপে ধাপে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। হাজারো মানুষের মনের মৌন মূক প্রতিবাদকে তিনি মুখর করে তুলবেন। তার জন্য কঠিন হতেই হবে।

গীতার বাণী মনে পড়ে। সেই রাত্রে তিনি মনের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন, তারপর এই পথ নিয়েছেন। তার জন্য বন্দীদশাও ঘটেছে, আরও দুঃখ বিপর্যয়ও আসবে।

কিন্তু বাধা তাকে দিতে হবে। সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় এখানে বড় কথা নয়, বাঁচার লড়াই-এ সর্বহারার সামিল হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই কথাটাই বড় কথা।

—সুখে-দুঃখে সামকৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥

সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় একভাবে নিতে তিনি প্রস্তুত। তাই আজ মন থেকে নির্দেশ পান তিনি—এই প্রতিবাদ তাকে জানাতেই হবে দীনদরিদ্র অত্যাচারিত মানুষগুলোর হয়ে।

গীতার নির্দেশই মেনে নেবেন রতনমণি।

স্তব্ধতার মাঝে ওঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

—এই অত্যাচারের জবাব আমরা দেব তাইন্দা রায়, ওই মানুষগুলোকে এর জবাব দিতে হবে। যেন কোন নিরীহ নির্দোষ মানুষের উপর অত্যাচার না হয়।

স্তব্ধ জনতা অন্ধকার রাত্রির আকাশ বিদীর্ণ করে জয়ধ্বনি দেয়।

—জয় রতনমণির জয়! জয় গুরু!

রতনমণির সামনে অনেক দায়িত্ব। তিনি ওদের সকলকে নিয়ে বসেছেন। জানেন তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে সহজেই, আর উত্তেজনা-উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি পছন্দ করেন না। তাই চেয়েছিলেন প্রথমে ওদের মনের মধ্যে ধর্মচেতনা, ঈশ্বর বিশ্বাস আনতে। আত্ম-শুদ্ধি ঘটাতে। তবেই সেই শুদ্ধচিত্ত মানুষগুলোকে দিয়ে বড় কাজ

করানো যাবে। তাদের মনের অতলে লোভ, মাৎসর্য, হিংসাটাকে দমন করতে হবে।

রতনমণি বলেন—অপরাধীকে বিচারকদের সামনে হাজির করতে হবে। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দিতে হবে, অপরাধী হলে তবেই শাস্তি দেবে সেই বিচারকরা। শাস্তি দেবার অধিকার আর কারো নেই।

কান্ত রায়ও বলে—এটা ন্যায্য কথা।

রতনমণি বলেন—নিজের মতে কোন কাজ কেউ করবে না তার জন্য থাকবে রীতি, বিধান। আর পাঁচজন মিলে সেই রীতি কানুন তৈরী করবে।

তাইন্দা বলে—রাজদরবারেও পাঁচজনই মন্ত্রী আছে। আমাদের এখানেও সেই পাঁচজন মন্ত্রী থাকবে। আর সৈন্য বাহিনীও থাকবে। সেনাপতিও।

রতনমণি বলেন—তার উপরই থাকবে শান্তিরক্ষা, আশ্রম রক্ষার ভার। আর প্রতিটি মানুষ এখানে হবে সৈন্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে হবে আমাদের লড়াই।

ওরা স্তব্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছে। রতনমণি সব দিকের সমস্যা-গুলোর কথা ভেবেই আজ নির্দিষ্ট কার্যসূচী নিতে চান।

একটি নোতুন চেতনার রূপায়ণ ঘটতে চলেছে ত্রিপুরার অরণ্য-গহনে। নির্যাতিত, নিপীড়িত কিছু মানুষ এগিয়ে এসেছে তাদের নিজেদের কল্যাণে একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে, এ যেন তাদের নিজেদের হারানো রিয়াং রাজ্যকে তারা আবার ফিরে পেয়েছে। একটি গৌরবময় ঐতিহ্যকে অনুভব করছে তাদের সারা অন্তরে। মুক্তি যজ্ঞের ঋত্বিক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী রতনমণি।

সেই খবরই ঘোষিত হচ্ছে দিক দিগন্তরে দুন্দুভির বজ্র নির্ঘোষে। টিলা বসতির মানুষ জেনেছে সেই সংকেত, ওরা সেই সংকেতকে

পাঠিয়ে দিচ্ছে দূরে আরও দূরে ওদের অরণ্যপর্বতের গহন কন্দরে প্রতিটি আশাহারা সর্বহারা মানুষের ঘরে ঘরে।

গঙ্গারাম রিয়াং ফিরছে বসতিতে। সকালের রোদ কচি শালবনে এনেছে হলুদ উজ্জ্বল আভা। লুঙ্গার ক্ষেতগুলোয় পাকা ধান-এর ইশারা, বনটিয়ার কলরব ওঠে। এবার ফসল ভালোই হবে গঙ্গারামের, চককে চক জমি এদিকের সব তারই। আর সেগুলো তার হাতে এসেছে প্রায় জোর করেই। এবার রাইতাল রিয়াং-এর তিনকানি জমিও দখল নিয়েছে সে। সেই জমিটার কাছে এসে দেখছে গঙ্গারাম।

হঠাৎ ওদিকে শালবন থেকে কয়েকজন জোয়ান বের হয়ে এসেছে, গঙ্গারাম কিছু বলার আগেই দু'জন লাফ দিয়ে এসে ধরে ফেলেছে তাকে, চীৎকার করতে যাবে গঙ্গারাম।

কিন্তু অন্যজন ধারালো টাকাল তুলে বলে—চীৎকার করলে মুণ্ডু ধড় থেকে নেমে যাবে গঙ্গারাম। চুপ করে চলো আমাদের সঙ্গে।

গঙ্গারাম ভীতকণ্ঠে শুধোয়—কোথায় যেতে লাগবে ?

একজন গম্ভীরভাবে জানায়—রতনমণির দরবারে। তোমার বিচার হবে সেখানে। চমকে ওঠে গঙ্গারাম। কিন্তু পালাবার পথ নেই।

বাধ্য হয়েই সে ঘন বনের মধ্য দিয়ে ছোট্ট নদীর জলরেখা পার হয়ে চলেছে ওদের সঙ্গে। অজানা ভয়ে কাঁপছে লোভী ভীরু মানুষটা। একদিনেই যে এখানের রং বদলে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি গঙ্গারাম।

রতনমণির সামনে ওরা বেশ কয়েকজনকে ধরে এনেছে।

উপস্থিত রয়েছে তাইন্দা রায়, দক্ষিণ মহারাণীর শিলারাম, হাজাছড়ার কানাই রিয়াং, কুর্মা বসতির প্রধান নিধিরাম রিয়াং, ওদিকে শক্তি রায়, ওর অন্যতম সাকরেদ তুইছারবুহার কৃষ্ণরাম, সর্পজয়ও রয়েছে। ওরা ধরে এনেছে ওই গঙ্গারাম রিয়াং, কুমারিয়া ওঝা, বসন্ত, ধ্রুব চৌধুরী আরও ক'জনকে। ওরা এর মধ্যেই বেশ

কিছু গরীবদের সব কিছু লুটপাট করেছে, থানায় খবর দিয়ে তাদের ধরিয়ে দিয়েছে। কাউকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে দণ্ড দিয়েছে।

তাইন্দা রিয়াং-এর সামনে কুমারিয়া ওঝা বলে ওঠে।

—এসব আমরা করি নি তাইন্দা রায়।

শক্তি রায় বলে—তবে ওদের ধান লুট করো নি? জরিমানা করো নি তোমাদের চাঁদা দিতে পারে নি বলে?

গুপীনাথ আর্তকণ্ঠে জানায়—আমার গোয়াল থেকে দুধেল গরু, চাষের বলদও নিয়ে গেছে রায়মশায়! মানুষগুলানকে শাসিয়েছে—ঘর জ্বালাই দিব তোদের? কও নি গঙ্গারাম?

—গঙ্গারাম বেগতিক দেখে বলে—ভুল হয়ে গেছে ঠাকুর। তোমার পা ছুয়ে বলছি সব ফিরাই দিব। গরু-মোষ-ধান-টাকা সব।

রতনমণি দেখছেন ওদের। ওই অত্যাচারী মানুষগুলোর উদ্ধত মাথা নুইয়ে দিয়ে জানাতে চেয়েছিলেন যে এসব আর চলবে না। এখন থেকেই এদের মাঝে একসঙ্গে বাস করতে হবে। তিনি বিপ্লবের চেয়ে ওদের চিত্তশুদ্ধিতেই বিশ্বাস করেন। এই মানুষগুলো যদি শোধরায় তা হলেই এদের সমাজের সামগ্রিক বদল হবে। তাই ওদের সুযোগ দিতে চান।

ধ্রুব চৌধুরী বিবর্ণ মুখে বসেছিল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে এদের সংঘবদ্ধ রূপ। আজ এরাও শক্তিমান। এখুনি ওদের ধারালো টাক্কালের ঘায়ে ক'জনের মাথা ধড় থেকে খসে পড়বে। কোন গহন অরণ্যে ফেলে দিয়ে আসবে তাদের লাশগুলো। কেউ টের পাবে না।

ভয়ে শিউরে উঠছে চৌধুরী। ওই কঠিন মানুষগুলোর হাত থেকে আজ বাঁচার কথা ভাবতেও পারে না। মনে হয় এতকাল ধরে একটা অন্যায়ই করে এসেছিল তারা।

আজ তার জবাব দেবার দিন এসেছে। ধ্রুব চৌধুরী বলে,

—এসব আর হবে না রতনমণি। আমরাও কথা দিচ্ছি এ অন্যায় এর প্রতিকার করবো।

ধ্রুব চৌধুরীর দিকে চাইলেন রতনমণি। ওর চোখের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাকে দেখছেন। মনে পড়ে ভ্রমর দেববর্মা—সেই আপনভোলা ভুবন দেববর্মার কথা। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পেয়েছেন অনেক বড় হৃদয়ের সন্ধান। এই হাজার হাজার রিয়াং এর ভালোবাসার মধ্যেও সেই হৃদয়ের উষ্ণতার সন্ধান পেয়েছেন। মানুষকে ভালোবাসতে পারেন তিনি। তাই বিশ্বাস করেন মানুষ অন্যায় করে, আবার বদলায়—শোধরায়। তিনি রক্তপাত নয় মানুষের প্রীতির মধ্যে নোতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেন। তাই ওর কথায় বলেন—এ কথার মর্য্যাদা থাকবে ধ্রুব বাবু ?

ধ্রুব চৌধুরী জানায়—আমার দিক থেকে এসব আর হবে না। কুমারিয়া ওঝা—গঙ্গারাম রিয়াং রতনমণির পায়ের কাছে এসে পড়ে ব্যাকুল স্বরে বলে—ভুল হয়ে গেছে ঠাকুর। এবারের মত মাপ করে দেন।

...তাইন্দা, কানাই শিলারাম সকলেই দেখছে ওদের। শক্তিরায় কঠিন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে আছে। রতনমণি বলেন, —এদের একটা সুযোগ দিতে চাই। আমাদেরই লোক—একসঙ্গে এতকাল বাস করেছি। ওদের অন্যায় বুঝে যদি ওরা নিজেদের শোধরায় সকলেরই ভালো হবে। তাই তাদের ফিরে যেতে দিতে চাই।

শক্তি রায় বলে—তবে এদের ধান গরু মোষ সব ফিরিয়ে দিতে হবে। ওর ভারি গলার গর্জনে চাইল কুমারিয়া ওঝা, গঙ্গারামও চেনে লোকটিকে। তাই বলে—সব ফিরিয়ে দোব, আজই দোব রায়জী।

তাইন্দা জানায়—ঠাকুর তোমাদের মাপ করলেন তাই ছেড়ে দিচ্ছি নাহলে আজ তোমাদের ফিরে যেতে হতো না। কথাটা মনে রেখো গঙ্গারাম।

শক্তি রায় বলে—আর কথাটা ওই খগেন রায়, তোমাদের চৌধুরী বাবুদেরও শুনিয়ে দিয়ো ধ্রুববাবু। অনেক সয়েছি আর সইবো না। সর্পজয়—ওদের নিয়ে যা। আর তোদের সব জিনিষ ঠিকমত পেলি কি না জানিয়ে যাবি। ওদের চোখ বেঁধে নিয়ে যা।

গঙ্গারাম কুমারিয়া ওঝা, ধ্রুব চৌধুরীকে ওরা তুলে এনেছিল চোখ বেঁধে, বনের মধ্যে ওদের সঠিক অবস্থানের কথাটা জানাতে চায় না। তবু এই কিছুক্ষণের মধ্যেই গঙ্গারাম আশেপাশে নজর দিয়ে জায়গাটা চেনার চেষ্টা করেছে, পাহাড়ের ঘন বন ঝোপ, সব কেমন একরকম দেখায়। আর দেখছে টিলার চারিদিকে অনেক ছোটবড় নোতুন বাড়িও গড়ে উঠেছে। ঘন বাঁশ—শালখুঁটি পুতে চারিদিকে মজবুত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। জায়গাটা বেশ সুরক্ষিত বলেই বোধ হয়। আশেপাশে প্রচুর মানুষজনও দেখা যায়, নানা কাজে ব্যস্ত।

—চলো।

কে ওদের চোখ বেঁধে নিয়ে চলেছে, টিলা থেকে নামাচ্ছে ঢালু পথ বয়ে। ওরা সঠিক জায়গাটার হদিস পায় না। ওই ভাবে একবেলার পথ এসে ওদের দখিন মহারানী মৌজার কাছে চোখ খুলে দেয়। তখনও বন্দী মানুষগুলো ভয়ে কাঁপছে!

খবরটা পৌঁছে গেছে চারিদিকে। লতাছড়ার হাটের ব্যাপারী—সাধারণ রিয়াংদের মুখে মুখে কথাটা ফিরছে।

বিজয় চৌধুরীর লোকজন এসেছিল হাটে গ্রামসভার জন্য চাঁদা আদায় করতে। ওরা এর মধ্যে হাটের দিন এসে হাজির হয়। মহাজনের তোলা, এর চাঁদা সব নিয়ে বেশ জোর জুলুম চলে। আজ ধীরেন্দ্র সিং রিয়াং বলে—চাঁদা দিমু এবার ওই রতনমণি ঠাকুরকেই। তোমাদের দিমু না হালায়।

চৌধুরীর বাহনরা কিছু বলার সাহসও পায় না। তারাও শুনেছে যে রতনমণির লোকজন কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে নিয়ে গেছে।

তবু তারা বলার চেষ্টা করে—চাঁদা না দিলে রায়কাঞ্চনকে নালিশ করতে লাগবে।

কে গর্জে ওঠে—ওই নকল রায়কাঞ্চনের কথা ফেলাইয়া থোওছে। বেশী জুলুম করলে ওরেই একদিন তুইলা লইয়া যাবে নি শক্তি রায়ের লোকজন। তোমাদেরও বলি অতি কিছুর ভালো না, কাইটা পড় এহান থনে।

ওরাও বুঝেছে আজ হাওয়া বদলে গেছে, তাই চুপচাপ করে সরে এল ওরা, চাঁদা আদায় করার সাহসই নেই, সেই বীর দর্প ওদের যেন মুছে গেছে।

দক্ষিণ মহারানীর হাটে এ দিকের বহু রিয়াং—ত্রিপুরী সাধারণ মানুষ আসে। জম জমাট হাট। আজ সেখানে সর্পজয় রিয়াংও এসেছে ওই গঙ্গারাম কুমারিয়াদের পৌঁছে দেবার পর।

ওদের কানে উঠেছে হাটে হাটে ওদের জুলুমের কথা। তাই সজাগ হয়ে উঠেছে রতনমণির দলবল। আর লোকজনও বহু আসছে তাদের দলে। তাই হাটে সবজী—আনাজ পত্রও কিনতে হবে।

কালিপ্রসাদ নিজে এসেছিল এখানের হাটে চাঁদা আদায় করার জন্য। ওর সঙ্গে রয়েছে মৈতুল—আরও কিছু লোকজন। ওরা হাটের একদিকে ছাঁচা বাঁশের চালাতে বসে হাক ডাক সুরু করেছে, কিন্তু খবরটা শুনে চমকে উঠেছে কালিপ্রসাদ।

রতনমণির লোকজন এবার বেছে বেছে কিছু মহাজন, জোতদারদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেব বিচার করে দরকার হলে খতমই করে দেবে এবার।

কালিপ্রসাদ তবু অনুচরদের সামনে বেশ বড় গলাতেই বলে, —রাখ ওসব বাজে কথা, রতনমণির দফা এবার গয়া হয়ে যাবে। হুলিয়া বের হচ্ছে ওকেই এবার তুলে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ বেশ শক্ত সমর্থ লোকটিকে দেখে চমকে ওঠে কালিপ্রসাদ। মৈতুলও চিনেছে তাকে। সর্পজয় রিয়াং বেশ ভরাটি গলায় শোনায়,

—কে কারে তুলছে কালিবাবু? এ্যা—তা হাটে এসেছেন চাঁদা তোলার জন্যে?

কালিপ্রসাদের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। মনে হয় এবার যেন তারই পালা। তাকেও চোখ বেঁধে এবার তুলে নিয়ে গিয়ে বোধহয় খতমই করে দেবে। কিন্তু ভয়টা প্রকাশ করতে চায় না সে।

তাই কালিপ্রসাদ বলে—জানেন তো রায়কাঞ্চনের হুকুম। সমাজের কাজ তাছাড়া দরবারের হুকুম আছে লোকজনদের জানাতে হবে।

···সর্পজয় ওদের মাচানের উপর চেপে বসল, দেশী তামাকের পাতা বের করে জামার পকেট হতে আর একটা দশটাকার নোট বের করে তাতে তামাক পুরে জড়িয়ে সিগ্রেট পাকিয়ে সর্পজয় দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে বেশ আরাম করে সিগ্রেট টানতে থাকে।

—ওকি করছো? দশটাকার নোট পুড়িয়ে ফেললে? অবাক হয় কালিপ্রসাদ।

সর্পজয় বলে—রাজার রাজত্বিই থাকছে না আর এ তো বাতিল কাগজই হয়ে যাবে কালিবাবু। তাই বলছিলাম রাজা ও মহারাজার দিন শেষ হয়ে আসবে। আসবে সাধারণ মানুষের রাজ্য। সেই সাধারণ মানুষগুলোর উপর জুলুম বন্ধ করো এবার। কালিপ্রসাদ ওর দিকে চেয়ে থাকে। মৈতুল চুপ করে গেছে। এবার সর্পজয় এক লাথিতে ওদের চাঁদার বাক্সটাকে ছিটকে ফেলে গর্জে ওঠে—এখান থেকে যাবে, না অন্য পথ নিতে হবে? কও দিন?

মানুষটার এ যেন অন্য মূর্তি।

আশেপাশে জুটে গেছে প্রচুর লোকজন। তারাও এবার গর্জে ওঠে—ওদের চাঁদার জুলুম, বেগারির জুলুম আর সইব না।

ভয়ে ভয়ে মৈতুল বাক্সটা তুলে নেয়। কালিপ্রসাদও ঘাবড়ে গেছে। সর্পজয় শাসায়—আজ ফিরে যেতে দিলাম, অন্য কোনদিন হাটে আবার বসতে দেখলে ফিরে যেতে আর দেব না। আর

তোমার ওই বাবুদেরও বলে দিও কোনও হাটে যেন চাঁদা তুলতে কেউ না যায়। তাহলে আর খুঁজে পাবে না তাকে।

কালিপ্রসাদ দলবল নিয়ে কোন রকমে ভিড় ঠেলে বের হয়ে চলে গেল। মনে হয় সারা এলাকার হাটে গঞ্জে ওদের লোকজন পৌঁছে গেছে, সকলের গতিবিধির উপরই নজর রাখছে তারা।

ফিরছে বনের পথ দিয়ে কালিপ্রসাদ, হঠাৎ ঘন শাল বাঁশ বনের ওদিকে কাদের সাড়া পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। বনের মধ্যে একটু ফাঁকা মত, সেই জায়গাতে কয়েক শো জোয়ান সমবেত হয়েছে, ওদের হাতে টাঙ্গাল, ঝকঝকে বল্লম-কঁ্যাচা—ফ্যাসা।

ওপাশে টং এর মত একটা উঁচু ঠাই, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে শক্তি রায়। ওই লোকগুলোকে লড়াই এর কায়দা রপ্ত করানো হচ্ছে।

চমকে ওঠে কালিপ্রসাদ।

ওই লোকগুলো বনের গভীরে এমনি বেশ কিছু ঘাঁটি গড়ে তুলে এবার নিজেরা তৈরী হচ্ছে আঘাত হানার জন্য।

—কালিবাবু!

মৈতুলও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। জানে এ সময় ওদের নজরে পড়লে আর রক্ষা থাকবে না তাদের।

ওরা দুজনে ঘন বেত বনে ঢুকে পড়ে ওই দুর্গম পথেই পালাবার চেষ্টা করছে। সর্বাঙ্গে বেত কাঁটার জ্বালা, পায়ে কয়েকটা জোঁকও রক্ত চুষছে, আজ ওই অবস্থাতেই প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে তারা।

খবরগুলো ওই বন পর্বত পার হয়ে অমরপুর ছাড়িয়ে উদয়পুরেও পৌঁছেছে। রতনমণির লোকজন এবার ক্ষেপে উঠেছে। ওদের দলও তৈরী। আর তারা নাকি এবার অমরপুর শহর দখল করে নেবে।

...রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পেও খবরটা পৌঁছেছে।

নিতাই—তাদের পাশের বসতির জলাই রিয়াং আরও ক'জন তৈরী হয়েছে। ...এর মধ্যে ক্যাম্প থেকে শিবু রিয়াংকে পাওয়া যাচ্ছে না, আরও দু'একজন রিয়াং ছেলেও বেপাত্তা হয়ে গেছে।

তাই ক্যাম্পে এবার খোদ রাজ দরবারের পুলিশের কোন কর্ত্তা এসে সকলকে লাইনে দাঁড় করিয়েছেন। এই শীতে তাদের পরনে হাফ প্যান্ট আর গেঞ্জী, তার মাঝে বৃষ্টিও হয়ে গেছে এক পশলা। ওদের শাস্তি দেবার জন্যই ওই বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কাল রাত্রি থেকে ওই পুলিশের লোকজন এখানের চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পালিয়ে যাওয়া ছেলেদের সন্ধানে। কিন্তু তাদের সন্ধানও মেলেনি। তাই রাগের চোটে কাল থেকেই ওদের বাকী খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ক্যাম্প-এ।

নিতাই, জলাই রিয়াং পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে।

সেই অফিসার এসে ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে হঠাৎ হাতের বেটনটা দিয়ে নিতাই এর মুখে একটা আঘাত করতে অস্ফুট যন্ত্রণায় কঁকিয়ে ওঠে নিতাই। লোকটা গর্জন করে।

—তুমি জানো কোথায় গেছে ওরা?

নিতাই জানে না ওদের গতিবিধি, ক'দিন সেও ব্যস্ত ছিল। পৈরীর ওখানে যেতো বৈকালের পরই। পৈরীর সঙ্গে তার কথাবার্তাও হয়ে গেছে এখান থেকে চলে যাবে তারা। কিন্তু হঠাৎ ক্যাম্প থেকে ওই ছেলেগুলো পালাতে এরা যেন ক্ষেপে উঠল।

নিতাইকে দেখে সেই অফিসার গর্জে ওঠে—তুমি রোজ সন্ধ্যায় কোথায় যেতে? রতনমণির দলের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে?

নিতাই জানায়—ওদের কাউকে চিনি না স্যার।

—তবে কোথায় যেতে? জবাব দাও। অফিসার গর্জে ওঠে।

নিতাই মরীয়া হয়ে বলে ওঠে—চোলাই মদের ভাটিতে যেতাম স্যার। মানে—

চাপা হাসির শব্দ ওঠে লাইনে।

এই অভ্যাসটা এদের সকলেরই আছে। ওই ছ্যাং, দিশি মদ ওরা অনেকেই খায়। অফিসার দেখছে ওকে। মনে হয় সত্যি কথাই বলেছে ছেলেটা।

অফিসার বলে ওঠে—আজ থেকে ক্যাম্পের বাইরে কেউ যাবে না। মার্চ ফরওয়ার্ড মার্চ।

এদিক ওদিক ঘুরে তখনকার মত ছাড়া পেল ওরা।

…চাপা স্বরে গজরাচ্ছে ছেলেগুলো। ওদের কানেও এসেছে নানা কথা।

ক্যাম্পে এসে জলাই গুম হয়ে বসেছিল ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচায়। ও বলে।

—ওরা কোথায় গেছে জানিস?

নিতাই চাইল ওর দিকে। জলাই এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি বলে।

—ওরা বনপাহাড়ে রতনমণির ক্যাম্পে চলে গেছে এখান থেকে বন্দুক-গুলি-বারুদ নিয়ে। তাই এদের এত রাগ।

চমকে ওঠে নিতাই। ওই ছেলেগুলোকে সে চেনে। আজ দেখেছে নিতাই তারা তবু একটা মহৎ কাজেই এগিয়ে গেছে। পৈরীর কথা মনে পড়ে।

মেয়েটা সেদিন কালিপ্রসাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। রোজ রাত্রে মদ গিলে কালিপ্রসাদ ওকে মারধোর করে।

পৈরীর অনাবৃত দেহে সেই মারের দাগও দেখেছে নিতাই। পৈরী কান্নাভেজা স্বরে বলে—এখান থেকে পালাতে পারিস নিতাই, তোর সঙ্গে যাবো। টাকা, গয়নার ভাবনা নাই। কালিপ্রসাদের অনেক লুকোনো টাকার খবর আমি জানি। সব নিয়ে চলে যাবো।

…নিতাই ভাবছে আজ কথাটা।

জলাই বলে—এরা এখানের ক্যাম্প থেকে আমাদের নিয়ে যাবে আগরতলা সদরে। সেখানে আটকে রাখবে।

চমকে ওঠে নিতাই

আর দেখেছে সে একা নয়। জলাই, তিন নম্বরের বিষণ—গোবিন্দ সকলেই আজ বৃষ্টির রাতেই একটা পথ করে নেবে।

…নিতাই কথাটা ভাবছে। ক্যাম্পের নীচেই দেখা যায় উদয়সাগরের বিস্তীর্ণ জলের বিস্তারে কালো মেঘের ছায়া পড়েছে।

ওদিকে গোমতীর বুকে নেমেছে বর্ষার ঢল। পাশেই ঘনবনের সীমানা, নদীর ধারে দেখা যায় ছোট্ট বাড়িটা, ওখানে বন্দী হয়ে আছে পৈরী।

নিতাই আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে।

শুনেছে সে কালই ওদের নিয়ে যাবে উদয়পুর থেকে, সেখান থেকে কোথায় পাঠাবে জানা নেই। জাপানীরা এগিয়ে আসছে।

নিতাই জেনেছে—তাদের জন্য আশ্রয়, আশ্বাস আছে ওই বনের মধ্যে, রতনমণির লোকজনও রয়েছে আশেপাশে।

তাছাড়া একবার বনের মধ্যে ঢুকতে পারলে তাকে আর কেউ ধরতে পারবে না।

…শেষ চেষ্টাই করবে সে। তাই ভাবছে তারা এখান থেকে চলে যাবার কথা।

টিলার এই দিকটা সোজা নেমে গেছে নীচে নদীর দিকে। রাতের অন্ধকারে গোমতীর জলস্রোতের শব্দ ওঠে। চারিদিকে জমাট অন্ধকার, তারার আলোও নেই এতটুকু।

জলাই রিয়াং আগে থেকেই তৈরী ছিল, ওদের বসতি অঞ্চলের কয়েকজন জোয়ান ওদিকের তোষাখানার সেন্ট্রির দিকে এগিয়ে যায়। বৃষ্টির রাত, কনকনে হাওয়া বইছে। সেই গার্ডটাও বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওদিককার চালায় ঢুকেছে, এরা চুপিসাড়ে দু'জন ওই ঘরটার দিকে এগিয়ে যায় সাবধানে।

জলের মধ্যে হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে বের হয়ে এসেছে গার্ডটা;

'জন ওর উপর লাফ দিয়ে পড়ে তার টিপে ধরেছে। লোকটা কোন শব্দ করারও অবকাশ পায় না। ওরা তাকে চেপে ধরে ওপাশের টিলার অনেক নীচে গোমতীর খরস্রোতের আবর্তে ফেলে দেয়, অন্ধকারে একটা শব্দ উঠল মাত্র।

সে শব্দও তক্ষুণিই মিলিয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি ক'জন তোষাখানার সামনের দরজাটা খুলে ফেলেছে। বন্দুক গুলি-বারুদ বিশেষ নেই। যে ক'টা ক্যাপদার বন্দুক, রাইফেল গুলি ছিল ওরা বের করে নিয়ে সরে পড়ে পিছনের পথ দিয়ে।

...নিতাইও জানতো—নৌকাটা গোমতীর এদিকেই থাকবে। পদ্ম রিয়াং নৌকা পারাপারের মাঝি, ওই লোকটাই সাহেবদের, কর্তাদের পারাপার করে। আর তার কাছেই সব খবরগুলো পায় রতনমণির দল। পদ্ম রিয়াং-এর মারফৎই জলুই রিয়াং, নিতাইদের খবর আসতো। কারণ পদ্ম রিয়াং-এর যাতায়াত সর্বত্র। লোকটা এমনিতে মদ খায় দারুণ, আর নিজেই ওর চালাঘরটায় মদের চোলাইও করে কর্তাদের নজরানা দেয় সেই তাজা মাল।

...পদ্ম রিয়াং-এর সঙ্গে তাই কালিপ্রসাদেরও দিলদোস্তি রয়েছে, খগেনবাবুরও তাকে দরকার। ও উদয়পুর ঘাটের শেষ পারানীর যেন কর্ণধার।

পদ্ম রিয়াংও মনে মনে রতনমণির ভক্ত। কিন্তু প্রকাশ্যে তার কোন মতেই প্রকাশ করার উপায় নেই। এটা ওর একটা মুখোসমাত্র, দিনভোর মদ গিলে থাকে তাই মাতাল সেজেই দিব্যি বর্ণচোরা আমের মত রয়ে গেছে।

লোকটা জানতো আজ রাতে একটা কিছু হবে। পদ্ম রিয়াং তাই অন্ধকারে টর্চের আলোটা বার কতক জ্বলে উঠতে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে।

নদীর ঘাটের পাশেই কালিপ্রসাদের চাষ বাড়ি, সেখানে পৈরীও তৈরী হয়ে জাগর রাত্রির মুহূর্ত গুণছিল। আজ সারা মনে কি নিবিড় উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। এত দিনের পর হয়তো আজ তারা দু'জনে ফিরে যাবে তাদের ফেলে আসা বনের শ্যামলিমায়, ওই মাতাল কালিপ্রসাদের অত্যাচারের সব শোধ নেবে তারা।

পৈরী আজ কালিপ্রসাদের লুকোনো টাকার থলিটাও নিয়েছে, আর বন্ধকী বেশ কিছু সোনা-দানা ছিল কালিপ্রসাদের সিন্দুকে —সে সব কিছু নিয়ে তৈরী হয়ে ছিল সে। তিনবার ওই আলোর সংকেত দেখে পৈরী অন্ধকারে বের হয়ে ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে এসে পারঘাটের পদ্ম রিয়াং-এর চালায় পৌঁছেছে।

পদ্ম রিয়াং আজ সন্ধ্যা থেকে মদ গেলে নি। জানে আজ আসল কাজ করতে হবে তাকে। বর্ষার তুফানে গোমতী ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ওর খরস্রোতে হাতি অবাধে ভেসে যাবে। ওই তুফানে তাকে নদী পাড়ি দিতে হবে, ওদের ওপারে পৌঁছে দিয়ে ফিরতে হবে।

অন্ধকারে ছায়ামূর্তিগুলো এগিয়ে আসে। চমকে ওঠে পৈরী।

—তুই !

একা নিতাই নয়, সঙ্গে আরও কয়েকজন রয়েছে। ওদের কাঁধে বন্দুকের বোঝা, মাথায় চট, বাঁশের চাটাই চাপা দেওয়া গুলি-বারুদের বাক্স।

পৈরী অবাক হয়—এসব কি ?

নিতাই ইশারায় ওকে চুপ করতে বলে নৌকায় উঠলো সকলে।

পদ্ম রিয়াং নৌকাটা ছেড়েছে, তীরবেগে নৌকাটা যেন ছিটকে বের হয়ে গেল রাতের জমাট অন্ধকারে খরস্রোতের টানে।

কোন রকমে ওই বৃষ্টির মধ্যে হাল টেনে নৌকা সামাল করে ভাটিতে বেশ কিছু দূর এসে নৌকা ভিড়িয়ে ওরা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ে চলতে থাকে জল-কাদা ঠেলে, সামনেই অরণ্যঢাকা টিলা।

ওরা বনের দিকে চলেছে মালপত্র নিয়ে, অন্ধকারে আর ওদের দেখা যায় না।

পদ্ম রিয়াং ঘাটে এসে পৌছেছে, তখন ঘামছে সে ক্লান্তিতে। ঘাটে নেমে নৌকাটা ওই স্রোতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, তীরে পোতা গোঁজটার সঙ্গে খানিকটা ছেঁড়া রশি বেধে রেখে দেয়, একবার স্রোতে ভেসে যাওয়া নৌকার দিকে চেয়ে পদ্ম রিয়াং গজরায়—নীচে কোথাও ঠেকে থাকিস বাবা। এখন যা।

...হঠাৎ রাতের অন্ধকারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠে। ধাতব ওই শব্দটায় জেগে উঠেছে পুলিশ ব্যারাকের সিপাইরা, উদয়পুর বাজারের দোকানী, কিছু বাসিন্দারাও।

এ ঘটনা এখানে সাধারণতঃ ঘটে না। তাই ওরা সচকিত হয়ে উঠেছে।

দৌড়াদৌড়ি করছে থানা অফিসাররা, রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নাকি ডাকাতি হয়েছে। হুইসিল বাজছে—সেই পদস্থ কর্মচারী, জেলা হাকিমও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব ওঠে সেনট্রিও বেপাত্তা আর বেশ কিছু ছেলে উধাও হয়ে গেছে, ক্যাম্প থেকে মালখানা থেকে গুলি-বন্দুকগুলো উধাও।

ওরা এসে পড়েছে পারঘাটে, ওদের পালাবার পথ এই দিকেই।

কিন্তু পারঘাটে নৌকাটাও বাঁধা নেই, আর ঝুপড়িতে হাঁকডাক করেও কারো সাড়া মেলে না। দরজাটা লাথি মেরে ভেঙ্গে যখন পদ্ম রিয়াংকে বের করেছে সে তখন মদের নেশায় বেহুঁস।

পদ্ম রিয়াং জড়িত কণ্ঠে চোখ খোলার চেষ্টা করে বলে—নৌকা বাঁধি রাখছি। ওই তো। যাঃ শালা। রাত কেটে গেল নাকি? মাইরী—তাজ্জব!

আবার মদের নেশায় ওই জল-কাদার মধ্যেই টলে পড়ে সে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করে কে শুধোয়—কেউ এসেছিল এখানে?

চোখ খোলার চেষ্টা না করেই পদ্ম রিয়াং বিড় বিড় করে।

—মালের নেশাটাও কেটে গেল এমনি বাদলার রাতে। মাইরী ছ্যাং গিলছিলাম, কোন ব্যাটা তো আসে নি।

পদ্ম রিয়াং মালের দোহাই দিয়ে আজও পার হয়ে গেল। দড়ি ছিঁড়ে নৌকাটাও ভেসে গেছে, ওদের পিছু নেবার পথও নেই। নিতাইরা এতক্ষণে বোধহয় বনের মধ্যে ঢুকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে ওদের ঘাঁটির দিকে।

পদ্ম রিয়াং তবু বীর দর্পে টলতে টলতে বলে।

—নৌকা ভেসে গেছে, আমি ধরে আনছি, এখুনিই—

দু'পা টলতে টলতে গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল সে কাদার মধ্যে, তারপর আর ওঠার লক্ষণও দেখা যায় না যেন মদের নেশায় বুঁদ হয়ে গেছে লোকটা।

সারা উদয়পুরের মানুষগুলো কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে।

সকালের আলো ফোটার আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

খগেন রায়, বিনয় চৌধুরীও সতর্কিত হয়ে উঠেছে। কালিপ্রসাদও এসে পড়ে। ওর মুখ-চোখে কি আতঙ্কের ছাপ। ব্যাকুল স্বরে বলছে সে।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে খগেনবাবু, চাষবাড়ি থেকে সেই মেয়েটা পালিয়েছে আর যাবার সময় আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে। ওই ব্যাটাদের দলেরই মেয়ে ওটা। মেয়ে-মদ্দ এক হয়ে এবার আমাদের ধনে-প্রাণে মারবে ওরা।

...চৌধুরীরাও সেটা বুঝেছে। তীর্থহরি বলে।

—কোন হাটেই আমাদের লোকজন যেতে পারছে না। ওদিকে শুনলাম গঙ্গারাম আর কাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। কে জানে ওরা বেঁচে আছে কি নেই।

খগেনবাবু বলে—পুলিশকে খবর দাও। ডাইরী করা

কালিপ্রসাদ জানায়—পুলিশও কি করবে? কাল তুইনানির বনে দেখলাম প্রায় পাঁচ'শো জোয়ান তালিম নিচ্ছে। হাতে টাক্কাল, বল্লম, রামদা, বন্দুকও রয়েছে।

থানা অফিসার মিহিরবাবু এসেছেন আজ ওদেরও সাহায্য দরকার তাঁদের। কিন্তু ওই সব খবর শুনে তিনিও অবাক হন—ওই লোকজন মিলে কি করছে? আর বন্দুকগুলো ওরাই চুরি করে নিয়ে গেছে রক্ষীবাহিনীতে এসে। এসব ওদের প্ল্যান।

খগেন রায় বলে ওঠে—তখুনিই বলেছিলাম বড়বাবু, ওরা জাপানীদের চর। ওৎ পেতে আছে, সুযোগ পেলেই এবার এ রাজ্য দখল করে নেবে। ওদের আবার বন্দুক গুলির ভাবনা? কিন্তু সেদিন আমাদেরও ওরা ছেড়ে কথা কইবে না।

ভাবনার কথা। মিহিরবাবু ভাবছেন কথাগুলো।

হঠাৎ গঙ্গারাম রিয়াং আর কুমারিয়া ওঝাকে ঝড়োকাকের মত ঢুকতে দেখে ওরা চাইল। ওরা যেন নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। খগেনবাবু অবাক হয়—কখন এলে তোমরা?

…গঙ্গারাম রিয়াং এর কথা বলার মত অবস্থা আর নেই। একেবারে দারোগাবাবুর পায়ে আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। ভয়জড়ানো স্বরে গঙ্গারাম আর্তনাদ করে—আমাদের বাঁচান বড়বাবু, ওরা বলেছে এবার আর কিছু শুনলে গর্দান নিয়ে নেবে।

খগেনবাবু গর্জে ওঠে—গর্দান নেওয়া এত সস্তা?

গঙ্গারাম বলে—এলাহি কাণ্ড করেছে খগেনবাবু, ওরা বলেছে—এ রাজ্য আর থাকবে না।

কথাটা সমর্থন করে ওঠে গুপীনাথ তহশীলদার।' সে ছিল দক্ষিণ মহারাণীর হাটে। সেইই বলে।

—এ সব টাকাও বাতিল হয়ে যাবে। সর্পজয় রিয়াংকে দেখলাম ও দশ টাকার নোটে তামাক জড়িয়ে চুটি টানছে। ওরা বলে, সব ক্ষৌত হয়ে যাবে, সেদিনের আর দেরী নাই।

খগেনবাবু ভাবছে কথাটা। তার আসন টলিয়ে দিয়েছে, তাদের উপরও এবার হামলা করতে সাহস যাতে না পায় তার আগেই এবার চরম আঘাত দেবে ওদের। খগেন রায় আইন বোঝে।

তাই বলে সে···চল গঙ্গারাম। তোর কোন ভয় নাই। চলুন মিহিরবাবু জেলা হাকিমের বাংলোতেই যেতে হবে। এই অত্যাচারের লিখিত অভিযোগ করবো আমরা ওখানে, রাজদরবারেও করবো। এর বিহিত করতেই হবে।

বড়বাবু বিপদে পড়েছেন। এবার শুধু চাকরীই নয় প্রাণ নিয়ে টানাটানি সুরু না হয়, তবু মুখের ধাঁচ বজায় রেখে মিহিরবাবু বলেন।

—তাই চলুন।

···রতনমণি ধীর ভাবে সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে চান। তার কাছে একটা সুষ্ঠু গঠনমূলক কাজই বড়, আশ্রম গড়ে চলেছেন কয়েকটা জায়গায়, আর সমবেত করে চলেছেন ছত্রভঙ্গ রিয়াংদের, একটা সমাজকে তিনি সুন্দর করে সার্থকভাবে গড়ে তুলতে চান। ধর্মগোলা গড়েছেন, তিনি চান আর একটা মরশুমের ধান ও গোলায় তুলতে যাতে আরও পোক্ত হতে পারে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

তাইন্দা রায়, শিলারাম রিয়াং—অন্য মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে তার পরিকল্পনাটা শোনান।

—আরও সময় লাগবে। আর আমি চাই—খগেন রায়দের সঙ্গে একটা মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে।

শক্তি রায় ইদানীং এগিয়ে চলেছে। ও জানে একটা পথ, সে ওই বদলা নেবার পথই। তাছাড়া বেশকিছু রক্ষী বাহিনীর ছেলেরাও এসেছে তাদের দলে, বন্দুক—বারুদও এনেছে। তাই শক্তি রায় ভাবে সে পারবে ওদের মহড়া নিতে। শক্তি রায় বলে—আবার মীমাংসা কেন ওদের সঙ্গে ঠাকুর?

হাসেন রতনমণি—নিজেদের এখন তৈরী করো শক্তিরায় আমরা গড়তে চাই—গড়ার কাজে চাই সকলকে। যারা ভুল বুঝে আমাদের বাইরে রয়েছেন—আমাদেরই লোক তারা। তাদেরও বুঝিয়ে ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করতেই হবে। তাদের সঙ্গে পেলে এ কাজ অনেক সহজ হবে, আমরা নোতুন কিছু গড়তে পারবো।

তাইন্দা রায়, শিলানাথ রায়, কানাই রিয়াং, নিধিরাম, বিশ্বমণি এই পাঁচজন মন্ত্রীও রয়েছে। তারা শুনছে রতনমণির কথাগুলো। কি যেন আত্মপ্রত্যয় একটি স্বপ্নের প্রগাঢ়তা ফুটে উঠেছে তাতে।

তবু তাইন্দা রায় বলে—যদি ওরা আমাদের কথা না শোনে? রতনমণি চুপ করে থেকে বলেন—তখন নিজেদেরই এ কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। আমার কথাটা জানালাম—তোমরাও পরামর্শ করে দেখো।

…রামজয় রিয়াং চুপ করে বসেছিল। তার হাতে এখন এই সব ক্যাম্পের হিসাব পত্র, তহবিলের জিম্মাদারী।

ও বলে ওঠে,—শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু কি হবে বলা যায় না। ওরা গোলমাল বাধানোর জন্য বসে আছে।

রতনমণি দেখছেন এদের সকলকে। শক্তি রায় চুপ করে গেছে, কিন্তু সে তার সহযোগী কৃষ্ণ রায়, সর্পজয় কেউ ও কথাটা যেন মনে নেয় নি। রতনমণি বলেন।

—ওরা শক্তিমান, ওদের অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। তাই শেষবার মীমাংসার চেষ্টা করো তোমরা।

কান্ত রায়ও শুনছে কথাটা। ও চুপচাপ শান্তভাবে কথাটা ভাবতে পারে। মনে হয় অন্তত সময়ও পাওয়া যাবে ওই মীমাংসার কথা পেড়ে, আর হয়তো কাজও কিছু হতে পারে। তাই কান্তরায় বলে—তোমরা রাজী হলে কথাটা আমিই ওখানে গিয়ে পাড়তে পারি। তাতে আমাদের সময়ও কিছুটা পাওয়া যাবে, আর কাজও হতে পারে হয়তো।

…ওরাও নিমরাজী হয়। শক্তি রায় কি বলতে চাইছে। তাইন্দা বলে ওঠে - এ নিয়ে কথা বলো না তুমি। মন্ত্রীরা যদি ওই পথ নেবার কথা ভাবে, সেটাকে মেনে নিতে হবে।

…শক্তি রায় বসে পড়লো গুম হয়ে।

তাইন্দা বলে—তাহলে কান্ত রায়, তুমি চেষ্টা করে দেখো। কিন্তু আমাদের এ দিকের সব কাজই চলবে শক্তি রায়, নোতুন লোকজনদের নিয়ে মহড়ার কাজও চলবে। আর হাজাছড়ায় নোতুন ক্যাম্পও খুলতে হবে।

খগেন রায় খবরটা শুনে মনে মনে খুশী হয়, তীর্থহরি, বিজয় চৌধুরী, রাজারাম চৌধুরীদের ডাকিয়ে এনেছে খবর শুনেই। আর এসেছে মিহির বাবু, কোতোয়ালী থানার বড় দারোগা।

কান্তরায় এসেছিল খগেন বাবুর কাছে। কান্তরায়ের সঙ্গে এসেছিল কবি খুশীকৃষ্ণ। বগাফায় খগেনবাবুর বিরাট দশবন্দী টিনের বাড়ি, ওদিকে ধানের গোলা—বাইরে একটা গর্জন গাছের সঙ্গে হাতি বাঁধা রয়েছে দেখে খুশীকৃষ্ণ বলে—এ যে এলাহি ব্যাপার গো দাদা ?

কান্তরায় জানায়—তাহবে বৈকি !

খুশীকৃষ্ণ চোখ মেলে দেখছে চারিদিকে। খগেন রায়কে কান্ত রায় বলে চলেছে কথাটা।

খগেন রায়-এর চৌবন্দী ঘরে ফরাসের উপর জাজিম পাতা, দামী তামাকের খোসবু ওঠে। খগেন রায়ের পরণে ধুতি, মিহি পাঞ্জাবী, হাতে দামী ঘড়ি বাঁধা। খুশীকৃষ্ণ লোকটার দিকে চেয়ে আছে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। ও মানুষ চেনে। এতকাল যাদের দেখেছে এ যেন তেমনি সহজ ধাতের মানুষ নয়। চোখ দুটোয় একটু বাঁকা চাহনি, আর মনের ভাবটা চাহনিতে ফুটে উঠতে দিতে নারাজ।

খগেন রায় শুনছে কথাগুলো। ও জেনেছে যে এবার রতনমণি ভয় পেয়েছে। ওই গারদ থেকে পালিয়ে এসে সে এবার একটু শান্তিতে থাকতে চায়।

তাই রিয়াংরা তাদের সঙ্গে একটা মিটমাট করতে চায়।

খগেন রায় জানায়, বেশ কথা। আমিও তো তাই চাই। সকলে মিলে শান্তিতে বসবাস করি। আমিও রায়কাঞ্চন, রিয়াংদের সকলের কথা আমারও কথা। আলোচনা করে সব ঠিক করতে হবে। বেশ এসো তোমরা। এতো খুব ভালো কথা।

ইতিমধ্যে খাবার এসে গেছে। কাঁসার থালার উপর পেঁপে—আনারস, কলা, লেবু আর চালের মিষ্টি পিঠে সাজানো। সমাদর করে খগেন রায়—খাও খুশীকৃষ্ণ। তুমি তো কবি মানুষ। একদিন বসে তোমার গান শুনতে হবে, এসব ঝামেলা চুকে যাক।

খুশীকৃষ্ণ বলে—সবই গুরুর দয়া বাবু। বেশ তো, গানের আসর হবে সেই দিনই। এ আর এমন কি কথা।

কান্তরায় আর খুশীকৃষ্ণ ফিরছে খুশীমনে। কান্তরায়ের মনে হয় হয়তো এতদিনের একটি ভুল বোঝাবুঝির মীমাংসা হয়ে যাবে এইবার। খগেন বাবুরাও সঙ্গে এলে সকলে মিলে মিশে একটা সত্যিকার ভালো কাজই করতে পারবে। তাই কান্তরায় শুধোয়।

—লোকটার কথাবার্তা ব্যবহার তো ভালোই লাগলো খুশীকৃষ্ণ! তোমার কি মনে হয়?

খুশীকৃষ্ণ বলে ওঠে—লোকটা ঠিক সিধে নয় গো। ওর চাহনিটা হাসিটা সবই কেমন বাঁকা আর মেকি মেকি ঠেকছে।

কান্ত রায় অবাক হয়, ওর এটা মনে হয় নি। তাই বলে সে, —কেনে হে?

খুশীকৃষ্ণ গেয়ে ওঠে—গুরু রত্ন যার মাইয়া—ন ফুনগই রলাং।

গুরু রত্ন যারা অবুঝ তাদেরও দেখিয়ে দেন গো। রতনমণির অজানা কিছুই নাই। দেখা যাক।

ওরা ফিরছে তওখম আশ্রমের দিকে।

খগেন রায়ও এই খবরটা পেয়ে এবার তৈরী হয়ে রয়েছে।

তীর্থপতি চৌধুরী, বিজয় বাবু, কালিপ্রসাদ, অমরপুরের ওদিক থেকে রাজারাম চৌধুরী, ডম্বুর পাহাড়ের চৌধুরীদেরও সে ডেকে আনিয়েছে। এতদিনের সব কিছুর বোঝাপড়া করতে হবে ওই রিয়াংদের সম্বন্ধে।

তীর্থহরি বলে—বড়বাবুকে ও সব কথা জানিয়েছি।

খগেন রায় হাসল, বরং বিনয়ের সঙ্গে বলে—ওদের নামে যা যা অভিযোগ, নালিশ হয়েছে ওসব কথা থাক এখন তীর্থ বাবু, যখন মীমাংসা করতে চাইছে তখন ওসব কথা তুলে লাভ কি?

বিজয় চৌধুরী অবাক হয়, ও বলে—তাহলে সব দাবীই ছেড়ে দোব?

খগেন বাবু বলে—দেখো ওরা কি বলে!

খগেনবাবু আজ ক্ষমাশীল—পরোপকারী স্বজনবৎসল হয়ে উঠেছে। আর ওই মীমাংসার জন্য যারা আসছে তাদের আপ্যায়ন, থাকার জন্যও এর মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

টানা ঘর ক'খানায় খড়ের গদি তার উপর তোষক পাতা হয়েছে, ওপাশে তাদের খাবার দাবার জন্য ভাত পাক হচ্ছে, খগেন বাবুর লোক লাল জবা ফুলের মত মাংস ছাড়াচ্ছে কলাপাতায়। রাশিকৃত মাংসের ব্যবস্থা হয়েছে। ওরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে অতিথিদের।

রতনমণি সব কথাই শুনেছেন কান্ত রায়ের মুখে। খুশীকৃষ্ণ দুচার কথা বলেছে, শক্তি রায় বলে—আমিও যাবো ঠাকুর।

রতনমণি ভেবেছেন কথাগুলো।

তিনি বলেন শক্তি রায়ের কথায়—কে কে যাবে বলে দোব। দরকার হলে তুমি যাবে, দরকার না বুঝলে তোমাকে যেতে হবে না। বরং এ দিকের নোতুন ক্যাম্পগুলোয় তোমার কাজ রয়েছে।

তাইন্দা বলে—তাহলে আমিই যাই?

রতনমণি কি ভাবছেন? বলে ওঠেন তিনি—না। তুমি, রামজয় থাকবে এখানে। শিলারাম, কান্তরায়, কানাই, আর কিছু লোক যাবে। সঙ্গে চিন্তামণিও যাবে ও বরং মাথাঠাণ্ডা করে কথা

বলতে পারবে। সঙ্গে খুশীকৃষ্ণ যাক ও নাকি আবার গান শোনাবে বলে এসেছে। আর তৈন্দুলকেও নিয়ে যাও। একটু সাবধানে থাকবে তৈন্দুল। তৈন্দুল মাথা নোয়ায়।

রতনমণির নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য ওদের নেই। তিনিই বেছে বেছে প্রায় পঁচিশ জনকে পাঠালেন বগাফায় খগেনবাবুর ওখানে।

...খুশীকৃষ্ণ বলে—তাহলে আমিও যাবো ঠাকুর?

রতনমণি হাসলেন, বলে ওঠেন—যাও। নিজে নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছো, না গেলে খারাপ দেখাবে।

খগেন রায়ের কাছে সব খবরই আসে। সে জানে ওদের দলের কোন কাজের ভার কার উপর। আর মাথাও কে কে? তাই ওদের দলকে মীমাংসার জন্য আসতে দেখে সাগ্রহে এগিয়ে আসে আপ্যায়ণ করতে। বিজয় চৌধুরী, তীর্থহরি, রামজয়ও রয়েছে সঙ্গে।

ওই পঁচিশ জনের মধ্যে কে কে এসেছে তাই দেখে নেয় আগে খগেন রায়। বলে ওঠে তীর্থহরি।

—শক্তি রায় রিয়াং আসেনি?

কান্ত রায় দেখছে ওদের। খুশীকৃষ্ণ চুপ করে ছিল। ও বলে —ওর কি সব কাজ রয়েছে, আটকে গেল।

—আর তাইন্দা রায়কে দেখছি না? খগেন রায় তাকে না দেখে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেটা বোঝা যায় ওর কথার স্বরে।

মুকুন্দ বলে—আমরাই এলাম। আপনার সঙ্গে যা সর্তে মীমাংসা হবে সেগুলো উভয় পক্ষেই মেনে নোব। রতনমণি ঠাকুর তাতে অমত করবেন না।

খগেন রায় নিজেকে শোধরাবার জন্য বলে—না, না। সে কথা কেন? অনেক দিন দেখা নেই, এলে ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হতো আর কি। যাক্‌গে—চলো। খাবার তৈরী। আগে খেয়ে দেয়ে

বিশ্রাম করো। আজ সন্ধ্যায় কথা হবে। সন্ধ্যায় হাট ফেরৎ আরও সকলে আসবে।

খুশীকৃষ্ণ বলে ওঠে—আবার রাতে কেন? ওসব আলোচনা এখনই সুরু হলে ভালো হয়।

কান্ত রায় বলে—রাতে ফিরতে হবে আমাদের।

—সেকি! খগেন রায়ও অবাক হয়।

তবু সে কথা বাড়াতে না দিয়ে ওরা কাজের কথাতেই আসতে চায়। খাবার দাবার তৈরী।

ওই লোকগুলো দীর্ঘপথ এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, হঠাৎ বাড়ির চারিদিকে বন্দুকধারী পুলিশ ক'জনকে দেখে অবাক হয় কান্ত রায়। মুকুন্দও চমকে উঠেছে। এসব কি কান্ত দা?

খুশীকৃষ্ণ বুঝেছে ব্যাপারটা। কিন্তু আর পালাবার উপায় নেই। সামনে সদর কোতোয়ালীর বড়বাবুকে পোষাক পরে হাতিয়ারবন্ধ হয়ে আসতে দেখে চাইল সে।

কান্ত রায় গর্জে ওঠে—কি ব্যাপার খগেন বাবু? দলবেঁধে ডেকে এনেছেন মীমাংসার জন্যে আর রাজার পুলিশকে ডেকেছেন ধরিয়ে দেবার জন্য?

খগেন রায় বলে ওঠে—এ সবের বিন্দুবিসর্গও জানি না কান্ত রায়, ঈশ্বরের নামে দিব্যি দিয়ে বলছি। আমি ডেকেছি ওদের বড়বাবু! হঠাৎ আপনি এলেন?

বড় বাবু বলে ওঠে—আসতে হ'ল। কোতোয়ালীতে বহু নালিশ জমা হয়েছে কান্তরায়, কানাই রিয়াং—আর সকলের বিরুদ্ধে। মার দাঙ্গা—খুন খারাপি সব অভিযোগই আছে এদের নামে, তাই এদের থানায় যেতে হবে খগেন বাবু, দরবারের হুকুম।

শিলারাম গর্জে ওঠে—যদি না যাই আমরা?

বড়বাবু বলে ওঠে—এ তোমাদের রতনমণির রাজত্বি নয়, মহারাজার হুকুম—যেতে হবে। না গেলে অন্য ব্যবস্থাই করবো।

কান্তরায় বুঝেছে ব্যাপারটা। তাই বলে।—চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন আমাদের।

কানাই রিয়াংরা জালে পড়েছে, ওরা ভাবতে পারেনি যে এমনি একটা কাণ্ড ঘটে যাবে।

বড়বাবুর দলবল ওদের নিয়ে চলে যাচ্ছে। খগেন বাবু বলে ওঠে—খাবার সব তৈরী। না খেয়ে যাবেন ওরা?

কান্তরায় বলে—তোমার বাড়িতে জল গ্রহণ করাও পাপ খগেন বাবু। রিয়াংদের অতিথি সৎকারের যা নমুনা তুমি দেখালে তার কথা রিয়াংরা কেউ ভুলবে না। চলুন—বড়বাবু।

ওদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ বাহিনী।

বিজয় চৌধুরী, তীর্থহরি চৌধুরীর দল অবাক হয়। রাজারাম বলে ওঠে—কৌশলটা দারুণ করেছেন খগেন বাবু। তবে সবক'টা জালে পড়লো না এই যা।

খগেনবাবু বলে যে ক'টা পড়েছে তারা তো এখন বুঝুক। বাকী গুলোকেও দেখে নোব এবার।

ওই গোলমালের মধ্যে তৈন্দুল রিয়াং একবার বাইরে বের হয়ে এসে পুলিশদের দেখে ছনের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সে দেখেছে ওদের সকলকে দলবল সমেত ধরে নিয়ে যেতে। তখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

তৈন্দুল শুনেছে সবকথা, সেও বুঝেছে খগেন রায়দের কৌশলটা তারা আগে বুঝতে পারেনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে একফাঁকে তৈন্দুল ওই ছনের গাদা থেকে বের হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে চলতে থাকে। বেশ খানিকটা পথ তাকে যেতে হবে।

তবু কোমরের টাক্কাল বের করে বাঁশ দুটো কেটে—চলবার মত এক জোড়া রণ পা তৈরী করে নিয়ে তৈন্দুল বনের মধ্য দিয়ে দৌড়তে থাকে। এতবড় সর্বনাশের খবরটা আশ্রমে পৌঁছে দিতে হবে রাতের মধ্যেই।

বড়বাবু মোহরলাল কারতকমা লোক, আর খগেন রায়ও আগে থেকেই কয়েকটা হাতির ব্যবস্থা করেছিল, যাতে আসামীদের নিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি এই এলাকা থেকে চলে যেতে পারে। কারণ খগেন রায় জানে সময় পেলে রতনমণির দল ওদের উপর চড়াও হতে পারে।

বড়বাবুও ওদের নিয়ে সোজা উদয়পুরের দিকে রওনা দিয়েছে হাতির পিঠে। ওখান থেকে কড়া পাহারায় ওদের সদরে পাঠিয়ে দেবে।

ওদের কয়েকজনের নামে ইতিপূর্বেই কয়েকটা মামলা দায়ের করা হয়েছে, আর মুকুন্দ, কান্তরায় এর আগেই জেল পলাতক আসামী, সুতরাং ওদের বিচার হবে ওখানেই।

অবশ্য এতবড় কাজটা এত সহজে উদ্ধার করার জন্য খগেনবাবুর দলের কাছে সেও বেশ কিছুটা গণ্যমান্য হয়ে উঠেছে। ওরাও খুশী করতে ত্রুটি করেনি মিহিরবাবুকে।

তাই বিশেষ কারণেই কোতোয়ালীর বড়বাবুও জেলা শাসককে বলে কয়ে আসামীদের সোজা সদর আগরতলায় চালান দিয়েছে।

বন্দীদেরও সদরে নিয়ে চলেছে হাতিয়ারবন্ধ ওই প্রহরীর দল। হাতিগুলো দুলকী চালে চলেছে, চড়িলাম ছাড়িয়ে ওরা বিশ্রামগঞ্জ পার হয়ে চলেছে আগরতলার দিকে।

বিশ্রামগঞ্জ বাজারে দুচারজন রাজ্য পুলিশবাহিনীর লোকজন পাহারা দিচ্ছে। একটা থমথমে ভাব রয়েছে ছোট্ট পাহাড়ী নদীর ধারের ওই গঞ্জে।

কে বলে—স্বদেশীদের খোঁজ করা হচ্ছে এখানে কেউ থাকলে ধরে নিয়ে যেতে হবে। খাস দরবারের হুকুম। সদ্য গড়ে ওঠা স্বদেশী দলকে রাজদরবার শায়েস্তা করতে চায়।

পুলিশবাহিনীর একজন বলে—এখন স্বদেশীদের খুঁজে বের করা প্রধান কাজ। এরা কারা।

রিয়াংদের নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশবাহিনীর লোক। তারা জানায়, —অমরপুর অঞ্চলের ডাকাত দল।

এ কথা শুনে চটে ওঠে শিলারাম রায়—আমরা ডাকাত নই।

পুলিশ অফিসার ধমকে ওঠে—ওসব পরে দেখা যাবে। এখন চুপ করে থাকবে। কথা বলার হুকুম নেই। চলো—

হাতিগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তারা চলতে শুরু করে ওদের নিয়ে আর পরে কোথাও থামার হুকুম নেই। তাই ওরা চলেছে আবার। পিছনের কে একজন পুলিশের লোক বলে—

এখন স্বদেশী লোকজনদের নিয়েই যতো ভাবনা তারাও স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু করেছে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যে।

চারিদিকে যুদ্ধের আসন্ন কালো ছায়া পড়েছে। বার্মায় ইংরেজ সরকার মার খেয়ে পিছু হটছে। এদিকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছে। গান্ধীজি নিজে ডাক দিয়েছেন।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মানুষ গর্জে উঠেছে। ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে তারা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেমেছে।

ত্রিপুরারাজ্য যদিও ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকারে নয়, তবু ত্রিপুরার মহারাজাকে ইংরেজের নির্দেশ মেনে চলতে হয়, আর ত্রিপুরার তিনদিকেই ভারতবর্ষের বাংলা দেশ। তখন আর পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে বিপ্লবী, পাশেই চট্টগ্রাম। যার মাটিতে লেগে আছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর পুণ্যরক্তধারা।

ত্রিপুরা রাজ্যেও মাথা তুলেছে স্বদেশীদের প্রভাব। বেশ কিছু তরুণ এই আন্দোলনের আয়োজন করছে। ইংরেজের কাছেও সে সংবাদ পৌঁছে গেছে। তাই ইংরেজকে খুশী করার জন্য ত্রিপুরায় কংগ্রেসকে

বেআইনী ঘোষণা করে এবার তন্ন তন্ন করে কংগ্রেসের সভ্যদের খুঁজে বের করে তাদের বিতাড়িত করা হচ্ছে, কাউকে পাঠান হচ্ছে জেলখানায়।

চারিদিকে তারই কর্ম ব্যস্থতা। বাইরে এগিয়ে আসছে জাপানী সৈন্য দল, আর ভিতরে ওই কংগ্রেসের আন্দোলন এই দুটোকেই বাধা দিতে চায় সর্বশক্তি দিয়ে ত্রিপুরা দরবার।

এমনি সময় আগরতলায় ওই ছিন্নবাস পরিহিত বিচিত্র অরণ্যচারী মানুষগুলোকে নিয়ে আসতে দেখে কোতোয়ালীর বড় সাহেব ব্যঙ্গ ভরে বলে ওঠে।

—আর লোক পেলে না? এরা স্বদেশী দলের কেউ না। ওরা তো সব লেখাপড়া জানা ছেলে। ।

ওদের সঙ্গে ছিল উদয়পুরের ছোট দারোগা আর ক্যাম্প জমাদার, তারা বলে—অমরপুর অঞ্চলের ডাকাতির আসামী এবং ধান-গরু-মোষ লুঠ করেছে, মারধোর করেছে।

বড় সাহেব বলে ওঠে—সাক্ষী প্রমাণ আছে? তাহলে রেখে দেব। এসবের ব্যাপারে এখন মাথা না ঘামিয়ে স্বদেশী দলের লোকজন পাও তো ধরে আনো। চুরি ডাকাতি তো মামুলী ব্যাপার।

থানাদার সাহেব শেষ কালে যেন দয়া দেখিয়ে বলে।

—এনেছো ওদের, রাখছি। কাল কোর্টে হাজির করা হবে। তখন সাক্ষী প্রমাণ মজুত রেখো।

ব্যাপারটা ভুবনজয়ের চোখে পড়েছে। ইদানীং সে চাকরীতে একটু উপরে উঠেছে দরবারের দয়ায়। ভুবনজয় ওই কান্তরায়, মুকুন্দকে দেখেই চিনেছে। সেই রতনমণির খবরও সে রাখে।

আর থানাদার সাহেবের কথায় ভুবনজয় বলে—যা বলেছেন স্যার। ওই বনের জুমিয়াদের ধরে এনেছে এখন! উদয়পুরের কোতোয়ালের মাথা খারাপ হয়ে গেছে স্যার।

ভুবনজয় ভাবছে কথাটা। এইভাবেই মামলাটা হালকা হয়ে যাক, ভালোই হবে।

তৈন্দুল রিয়াং রাতের অন্ধকারে রণপায়ে ভর করে ছুটছে বনের মধ্য দিয়ে, লুঙ্গা টিলা রাতের ঘুমনামা বসতি পার হয়ে সে চলেছে।

পরিশ্রান্ত ছেলেটা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মাঝরাতে পৌঁচেছে আশ্রমে। টিলার নীচে বনের ধারের পাহারাদার রিয়াং ওকে দেখে চিনতে পারে।

—তুই! একা ফিরলি তৈন্দুল? ওরা সব কোথায়?

তৈন্দুল বলে ওঠে হাঁপাতে হাঁপাতে—খুব জরুরী খবর আছে। ঠাকুরের ওখানে যেতে হবে এখুনিই।

পাহারাদার রিয়াং ওকে দেখছে।···কিন্তু তৈন্দুলের দাঁড়াবার সময় নেই। সে এগিয়ে চলে রতনমণির আশ্রমঘরের দিকে। শক্তি রায় ও বের হয়ে এসেছে ওর গলার শব্দ শুনে।

রতনমণি স্তব্ধ হয়ে খবরটা শোনেন।

ঘুম জড়িত চোখে উঠে এসেছে তাইন্দা রায়, সে চমকে ওঠে। —এযে সর্বনাশ হয়ে গেল ঠাকুর? কান্তরায়, মুকুন্দ, শিলারাম, কানাই আরও বেশ ক'জন কাজের লোককে ডেকে নিয়ে গিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিল মিথ্যা মামলার দায়ে ওই খগেন রায়ের দল!

শক্তি রায় গর্জে ওঠে—ওদের আমি কখনই বিশ্বাস করি নি।

রতনমণি বলেন—এমনি কিছু হতেও পারে ভেবে নিয়েই তোমাদের যেতে দিই নি। শেষ চেষ্টা করলাম মীমাংসার, এটা সকলেই জানবে। এরপর শেষপথই নিতে বাধ্য হবো আমরা। ওই খগেন রায়, চৌধুরী মহাজনদের বিচার করবো আমরাই।

শক্তি রায় গর্জে ওঠে—তাহলে এই রাতেই খগেন রায়, ওই বিজয় চৌধুরী তীর্থহরি চৌধুরীদের এক-একটাকে তুলে আনি। ওদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাই করে দিই।

রতনমণি দেখছেন ওকে। বলে ওঠেন তিনি।

—শান্ত হও শক্তি রায়, এখনও আমাদের পঁচিশজন লোক ওদের হাতে, কিছু গড়বড় হলে, তাদের আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই বলছি, এই শেষপথই নোব আমরা, তবে ক'দিন দেখার পর। ওই লোকগুলো ফিরে আসুক আগে। তারপর তোমাকে অনুমতি দোব।

তাইন্দা রায় ভাবনায় পড়েছে। তাই বলে সে—ওদের ছাড়ানো যাবে?

রতনমণি বলেন—চেষ্টা করতে হবে। তৈন্দুল—তুমি কাল ভোরেই একটা চিঠি নিয়ে সদরে চলে যাবে। সেই লোকের হাতে চিঠি দিয়ে চলে আসবে। আগরতলায় দুর্গা চৌমুনীর কাছেই পাবে তাকে।

তৈন্দুল হাঁপাচ্ছে। তবু কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পেলে আবার সে দীর্ঘপথ দৌড়তে পারবে।

নয়ন্তীও শুনেছে কথাটা। আজ আশ্রমে খুশীকৃষ্ণ নেই। তার সুরও ওঠে না আর। রাতের অন্ধকারে সারা আশ্রমে নেমেছে থমথমে ভাব। বাইরের টিলায় ওই ক্যাম্পে একটা উত্তেজনার আভাষ জাগে।

লোকগুলো ভেবেছিল আজ রাত্রি থেকেই ওরা তাদের বিজয়াভিযান চালাবে কিন্তু তা হয় নি।

...নয়ন্তী একা চুপ করে এসে দাঁড়ালো তাইন্দার কাছে। তাইন্দা রায় ওকে দেখে আশ্বাস দেবার স্বরে বলে—ভয় কি। ঠাকুর সব ব্যবস্থা করছেন। তোর বাবা শীগগিরই ফিরে আসবে। ওরা সবাই ঘরে ফিরে আসবে।

নয়ন্তী চুপ করে চেয়ে থাকে জমাট তারাজ্বলা রাত্রির অন্ধকারের দিকে। বলে ওঠে নয়ন্তী—এরপরও ওই খগেনবাবুদের এই বেইমানির জবাব দেবে না রায়জী?

তাইন্দা রায় ওর দিকে চাইল। আজ সে অবাক হয়েছে।

মেয়েরাও আজ চায় একটা বিহিত হোক। পৈরীও এসেছে, খবরটা শুনে। ও বলে ওঠে।

—ওই শয়তানদের আমি চিনি রায়জী। দরকার হয় আমাদেরও ডেকো, টাঙ্গাল, বল্লম নিয়ে আমরাও যাবো সেদিন, ওদের ঘরগুলোকে, ওই পাপের বাসাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে তবে শান্তি পাবো।

পৈরীর দুচোখে আগুনের জ্বালা ফুটে ওঠে। উদয়পুরের ঘৃণ্য জীবনকে সে ভোলে নি।

ওরা সকলেই যেন এক একটি রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির জ্বালা নিয়ে ফুঁসছে। তাইন্দা বলে।

—যা, শুয়ে পড়গে টং এ গিয়ে। রাত হয়েছে।

ও চলে গেল, জরুরী পরামর্শ করে খবর পাঠাতে হবে ভোরেই। নয়ন্তী আর পৈরী ফিরছে ওদের ঘরের দিকে। পৈরী বলে।

—তৈন্দুলকে আবার যেতে দিলি কেন নয়ন্তী?

নয়ন্তী দেখছে ওকে। আজ নয়ন্তীর বাবা—ওই তৈন্দুল সবাইকে যেন এই গগন রায়ের দল কেড়ে নিতে চায়, তার সব কেড়ে নিতে চায় তারা।

নয়ন্তী বলে ওঠে—ওরাই গেল পৈরী। আমার জন্য কে ভাবে বল? আমার মত মেয়ের দাম কি ওদের কাছে! এ ভালোবাসার কোন দাম নেই।

পৈরী চুপ করে শুনছে কথাগুলো।

হয়তো তাই।

এমনি অন্ধকার দুর্যোগভরা চারিদিক। যেখানে ওদের বাঁচার সংগ্রামই বড়, সেখানে ভালবাসা, ঘর বাঁধার কোন স্বপ্ন নেই। হয়তো সেও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কি গভীর বেদনায় দুটি নারী মন গুমরে ওঠে। ওরা ভালবাসতে চেয়েছিল, ঘর বাঁধতে চেয়েছিল এই অরণ্যভূমির প্রশান্তির গভীরে, কিন্তু সেই আশ্বাসটুকুও অতল অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

বসতির মুরগী ডাকছে রাতের শেষ প্রহরে, হাওয়া কাঁপে পুরানো রবার গাছের বনে, বেতকাঁটার শেষপ্রান্তে জমেছে রাতের শিশির বিন্দু, হাওয়ায় ঝরে ঝরে পড়ছে চোখের জলের মত।

…নয়ন্তী ওর শূন্য ঘরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভ্রমর দেববর্মা খবরটা পেয়েছিল আগেই। এর মধ্যে রতনমণির সম্বন্ধে শহরের বেশ কিছু শিক্ষিতমহল কৌতুহলী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কংগ্রেস সমর্থক মহলে রতনমণির এই আন্দোলনের খবর পৌঁছে গেছে। লোকমুখে প্রচারিত হয়েছে এই বনপর্বতের স্বদেশী দলের কথা।

বনমালীপুর, কৃষ্ণনগর, দুর্গাচৌমুনীর মোড়ের অনেকেই শুনেছে ওদের কথা। আর এই সময় কংগ্রেসের ওপর রাজতন্ত্রের আক্রমণটা তাদের বিক্ষুব্ধ করে রেখেছিল। রাজতন্ত্র—তা ইংরেজ রাজতন্ত্রই হোক আর ত্রিপুরার রাজতন্ত্রই হোক সব যেন একসুরে বাঁধা। তাই তার বিরুদ্ধে সক্রিয় এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য চারিদিকে সরব প্রতিরোধ চলেছে, কিছু দেশপ্রেমিক মানুষকে তাই এই অত্যাচার নির্বাসন মেনে নিতে হয়েছে।

তাই এরা আজ রতনমণির এই আন্দোলনকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। ভ্রমর ভুবনজয়ের দল এখানেও গড়ে উঠেছে। বিধুবাবু নামকরা উকিল। তার কাছেই এসেছে ভ্রমর দেববর্মা তৈন্দুলের আনা রতনমণির চিঠি পেয়ে।

বিধুবাবু সব শুনে ভাবছেন কথাটা। শুধোন তিনি।

—তবে যে বার লাইব্রেরীতে শুনছিলাম ডাকাতি করে ওরা।

ভুবনজয় বলে—একটা কিছু বদনাম তো দিতে হবে। এই খগেন রায়ের খবর সবাই জানেন, চৌধুরীদেরও দু'একজনকে চেনেন। ডম্বুর তীর্থের ব্যাপারটা দেখেছেন সেবার নিজে গিয়ে। এখন বুঝে নিন কেন এসব কথা ওদের বলতে হয়। এই বনপাহাড়ের মানুষও

স্বৈরাচারি, মুষ্টিমেয় একদল স্বার্থপর শোষক মানুষকে সহ্য করতে পারছে না। তাই এই আন্দোলন।

আর ওদের এই চেষ্টা!

বিধুবাবু তবু বলেন—রাজার বিরুদ্ধে এসব আন্দোলন করছে না তো? মানে অ্যান্টিস্টেট মুভমেণ্ট নয় তো?

ভুবনজয় ঠা ঠা করে হেসে ওঠে। ও জানায়।

—এখন ছ্যাং গিলে আপনার কাছে আসিনি স্যার। আমার আবার ওসব বদভ্যাস একটু আছে।

বিধুবাবুও সেটা ভালোই জানেন। ভুবনকে চেনেন তিনিও। ভুবন বলে ওঠে—ওরা রাজা রাজদরবার এসব চেনে না, ওই মানুষ ক'টার বিরুদ্ধেই ওদের জেহাদ। আমিও রাজদরবারে চাকরী করি বিধুবাবু, তাই জানি ওসব কিছু না। রতনমণি সন্ন্যাসী মানুষ—এসব ব্যাপারে নেই। গরীবদের হয়ে কথা বলেন—এই যা দোষ।

বিধুবাবু লোকটা ভালোমানুষ। তাই তিনিই এই মামলায় দাঁড়িয়েছেন। কোর্টে আসামীদের আনা হয়েছে। পুলিশ কোতোয়ালী থেকে রিপোর্ট করা হয় ওরা নাকি ডাকাত। লুটপাট করে। বিধুবাবু বলে ওঠেন—সাক্ষ্য প্রমাণ কোথায় হুজুর? কার বাড়িতে ডাকাতি করেছে, কে দেখেছে, কবে ঘটেছে সেই ঘটনা, কে ধরেছে ওদের এসব সাক্ষ্য প্রমাণ তো দরকার।

দারোগাবাবু একটু ঘাবড়ে যায়। ওরা ভেবেছিল এই কথাতেই কাজ হবে। তাই সাক্ষ্য প্রমাণের আঁটসাট ব্যাপার কিছু ছিল না। বাধ্য হয়ে পুলিশ জানায়—সময় দিলে ওসব যোগাড় হয়ে যাবে স্যার।

বিধুবাবু বনেদী উকিল। ফৌজদারী কেসে নামডাক আছে। তাই বলেন তিনি—অর্থাৎ ওসব চার্জ এইবার আটঘাট বেঁধে বানানো হবে। মাই লর্ড—এফ আই আর যা দাখিল করা হয়েছে, তাতে মাত্র দু-তিনটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। আসামীরা সেইসব ক্ষেত্রে

দোষী না নির্দোষ তারই উপর এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ভর করছে।

উকিলের এই যুক্তি মানতে হয় বিচারককে। ওদের অপরাধ ওই ক'টি ক্ষেত্রেই সীমিত। তাই বলেন তিনি—কারেক্ট।

বিধুবাবু বলে ওঠেন—এক নম্বর ফরিয়াদী গদাধর রিয়াং এখানে হাজির আছেন। তাকে সওয়াল করা হোক।

উদয়পুরের দারোগাবাবু রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেন। ওই চার্জের কোন ভিত্তি নেই। খগেনবাবুরা রাতারাতি কয়েকটা কেসের ডাইরী করেছিলেন। আর সেই ব্যাপারটা যে এমনি একটা গোলমালের সৃষ্টি করবে তা ভাবে নি।

গদাধর রিয়াংও ঘাবড়ে গেছে।

বিধুবাবু এরকম সাজানো মামলার গন্ধ পান আজীবন।

ফৌজদারী কোর্টে মামলা লড়ে তাই এর ছিদ্রগুলোও চেনেন একনজরে। সেই মিথ্যা ঘটনাগুলোকে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আর জোরালো বক্তব্য দিয়ে খান খান করে দিতে পারেন।

এবার সেই ব্যাপারই শুরু করেন তিনি।

রতনমণি সব খবরই পান। বৈকালে আশ্রমের চাতালে বসে আছেন। রামজয় হিসাবপত্র নিয়ে ব্যস্ত। এখন কাজ তার অনেক বেড়ে গেছে। বাড়ি ঘর ছেড়ে রামজয় রিয়াং এখন আশ্রমবাসী হয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষ, প্রাণায়াম মন্ত্র সাধনা করে।

রতনমণি বলেন—এ কি করলে রামজয়? সব বিষয় আশয় তুলে দিলে আশ্রমের হাতে, নিজেও সংসার ছেড়ে দিলে?

রামজয় বলে—এত লোক যদি সব ছেড়ে আসতে পারে ঠাকুর, আমিও এলাম। তাছাড়া সংসার তো এতকাল করেছি, কি পেলাম? হারালাম সবকিছু।

রতনমণি বলেন—এবার যে প্রাণটুকুও যেতে পারে গো?

হাসছে রামজয়—ওর আর দাম কি!

ওরা দিকে দিকে এবার তৈরী হচ্ছে, এবার আর আপোষ নয় ওই অত্যাচারী ধূর্ত মানুষগুলোর সঙ্গে শুরু হবে তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

সর্পজয় গেছে এই রাজ্যের বাইরে থেকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র আনার চেষ্টায়, কিছু বন্দুক গুলিবারুদ তারা পেয়েছে।

আজ শক্তি রায়ও তৈরী হয়ে উঠছে। রতনমণি ওকে বাধা দিতে চান না। একটা জাতির মধ্যে এই ক্ষাত্রশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে, তবে তিনি নজর রাখবেন যাতে এই শক্তি দুর্বলের উপর না অপচয়িত হয়।

…টিলার ওদিকের সমতল জমিটা বাইরে থেকে দেখা যায় না। চারিদিকে ঘন বাঁশ-বেত-শাল বনঢাকা পাহাড় শ্রেণী, জায়গাটা সুরক্ষিত। ওই সমতলে এখন সারবন্দী সৈন্যবাহিনীকে কুচকাওয়াজ করাচ্ছে শক্তিরায়। সৈন্য শুধু ওরাই নয়, চারিপাশের গ্রামের নারীপুরুষ এখন বুঝেছে তাদের বাঁচতে হলে এই পথই নিতে হবে। আর ওদের সৈন্যবাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

ডম্বুর, দক্ষিনমহারাণী—বগাফা—হাজাছড়া চারিদিকে। খগেন রায়ের লোকজন, চৌধুরীদের তহশীলদারেরা—মায় সরকারী চৌকিদার অবধি এলাকায় ঢুকলে গ্রামের মেয়েরা শাঁখ না হয় মোষের শিঙ্গা বাজিয়ে সংকেত করে, আর সেই সংকেতের শব্দ ছড়িয়ে পড়ে নিমেষের মধ্যে দূর দূরান্তরে। ওদের রক্ষীবাহিনীও সজাগ হয়ে ওঠে।

রতনমণি দেখছেন ওই রক্ষীবাহিনীকে। আজ অনেকেই আগরতলায় আটকে রয়েছে বেশ কিছুদিন। মামলায় উনি স্থানীয় কিছু মানুষের সাহায্য পেয়েছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষও শক্তিমান।

তাই নানা আইনের মারপ্যাঁচের লড়াই চলেছে আর আটক রয়েছে তার বিশ্বস্ত কর্মীদল। এখনও প্রতিঘাত হানতে পারে নি তারা।

রতনমণি চুপ করে কি ভাবছেন।

খুশীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে। হাসিখুশী মানুষটা—গান বাঁধে আর আপন মনে সুর তুলে আনন্দের জগতে হারিয়ে যায়, সেও যেন স্বেচ্ছায় এই দুঃখকে বরণ করেছে। সব ছেড়ে এসেছে রামজয়, আরও কতজন। কতো তরুণ।

নয়ন্তী পৈরীকে দেখেছেন তিনি। সন্ন্যাসী হলেও মানুষের চিরন্তন কামনা বাসনা স্বপ্নকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কিন্তু অবাক হন, ওরা ঘর বাঁধার স্বপ্ন, ভালোবাসার স্বাদ ভুলে এই সংগ্রামে মেতে উঠেছে।

অথচ তাঁর সাধ্য সীমিত। জানেন না এতগুলো মানুষকে তিনি কোন পথে নিয়ে যাবেন।

সন্ধ্যা নামছে বনপর্বতে, আকাশ শেষ সূর্যের আভায় রক্তস্নাত—পাখীগুলো কলরব করছে। রতনমণি ওই ধ্যানমগ্ন রক্তিম পর্বতশীর্ষের পানে চেয়ে থাকেন। তার জীবনদেবতার কি নির্দেশের প্রতীক্ষায় যেন তিনি ধ্যানমগ্ন।

হঠাৎ স্তব্ধতার মাঝে কয়েকটা তীক্ষ্ণ সংকেত ধ্বনি ভেসে আসে, চমকে ওঠেন তিনি।...ওই শব্দটা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ব্যস্ত হয়ে ওঠে নীচের উপত্যকার সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী।

পাহাড় কন্দরে ধ্বনিত হয় টিকারার শব্দ।

আক্রমণ নয়—এ যেন কোন আনন্দের সংবাদ। ওই বনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে কিছু মানুষ।

শক্তি রায়—তাইন্দা, ওরা ছুটে যায়। কলরব ছাপিয়ে জয়ধ্বনি ওঠে—জয় গুরু! রতনমণির জয়।

ওরা আগরতলা থেকে ফিরে এসেছে, বেশ কিছুদিন মামলা চলার পর ওই মানুষগুলো আটক অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরছে।

খুশীকৃষ্ণ কান্তরায় ওরা সকলেই এসে রতনমণির পায়ে লুটিয়ে

পড়ে। গুরুর দয়াতেই তারা এই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে।

ছুটে এসেছে নয়ন্তী, পৈরী ক্ষেতের কাজ ছেড়ে। তৈন্দুলও ফিরেছে। নয়ন্তী ওর দিকে নিশ্চিন্ত চাহনি মেলে দেখে ওর বাবা কান্তরায়কে জড়িয়ে ধরে। এক নিমেষের জন্য ওদের সব আন্দোলনের কাঠিন্য যেন মুছে গেছে। প্রিয়জনকে ওরা বুকে তুলে নিয়েছে। খুশীকৃষ্ণ জয়ধ্বনি দেয়—জয়গুরু। লোকটা এতটুকুও বদলায়নি। তেমনি কলকলিয়ে ওঠে।

—ক'দিন দালানকোঠায় বাস করে এলাম ঠাকুর, খেতে টেতেও দিতো ঠিক সব। আর অনেক নোতুন গান বাঁধছি। সরেস গান।

শক্তিরায় ধমকে ওঠে—থামো দিকি! এখন কাজের কথায় আসা যাক।

রতনমণি দেখছেন ওদের! তিনি বলেন—হ্যাঁ। 'এবার কাজের কথাই হবে শক্তিরায়। ওরা বিশ্রাম করে সুস্থ হোক এতটা পথ হেঁটে এসেছে। এরপর সেই সিদ্ধান্তই নিতে হবে।

ওর কথার স্বরে একটা গাম্ভীর্য ফুটে ওঠে। এ যেন ঠাকুরের অন্তরেরই নির্দেশ। উপস্থিত জনতা স্তব্ধ হয়ে ওই বজ্র নির্ঘোষ শুনছে। রতনমণি বলেন—তুইছার বুহায় সকলকে ডাকা হোক, সেখানেই আমাদের কর্মপন্থা—সিদ্ধান্ত—কর্মীদল সব কথাই ঘোষণা করে কাজে নামবো তাইন্দা! সময়ক্ষেপ করা ঠিক হবে না।

উদয়পুর অঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় ওদের প্রধান ক্যাম্প গড়ে উঠেছে তুইছার বুহার অরণ্যপ্রদেশে। বিরাট এলাকা জুড়ে সেখানে তৈরী হয়েছে ঘর বাড়ি। টিলাগুলোকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সারা অঞ্চলে খবর ছড়িয়ে গেছে, রতনমণি আসছেন। কাতারে কাতারে লোকজন, দুর দুরান্তরের অধিবাসীরা এসে সমবেত হয়েছে। এসেছে কর্মীদের প্রায় সকলেই।

রাত্রি নেমেছে অরণ্য পর্বতে।

মশালের আলো জ্বলে ওঠে, জমাট অন্ধকারে এই লালাভ প্রকম্প আলোগুলো আজ আদিম আরণ্যক অন্ধকারকে যেন ভীষণতর করে তুলছে। ওই আলোর আভা পড়েছে ইস্পাতকঠিন মানুষগুলোর মুখে। রতনমণি আজ ওই হাজার হাজার নিপীড়িত মানুষের সামনে প্রদীপ্তকণ্ঠে যেন ঘোষণা করেন, ওর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এই স্তব্ধ জনতার মনে এনেছে উদ্দাম শক্তিপ্রবাহ।

রতনমণি বলেন—অনেক চেষ্টা করেছিলাম আমরা ওই চৌধুরীদের, সর্দারদের নিয়ে চলতে। নোতুন একটি সমাজ গড়তে যেখানে সাধারণ মানুষ শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা পদে পদে আমাদের বাধা দিয়েছে। শত্রুতা করেছে—আমাদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছে। তাই আমরা এই মন্ত্রীসভা—কার্যপরিষদ গঠন করে সেই কাজ সফল করার চেষ্টা করবো। এই মন্ত্রীসভায় থাকবে পাঁচজন সদস্য। তুইছারবুহার তাইন্দা রায়, দক্ষিণমহারাণীর শিলারাম, হেজাছড়ার কাচাই রিয়াং, কুর্মার নিধিরাম রিয়াং, কালাঝুরির বিশ্বমণি রিয়াং, আর রক্ষীবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন শক্তিরায়, ওর সঙ্গে থাকবেন তুইছারবুহার কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, দক্ষিনমহারাণীর কান্তরায়, সর্পজয় আর বগাফার হান্দাই সিং।

আর কোষাধ্যক্ষ হবে পূর্ব বগাফার রামজয় রিয়াং।

তুমুল জয়ধ্বনি দিয়ে জনতা সমর্থন জানায় এই কর্ম পরিষদকে।

রতনমণির কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—আমরাই অন্যায়কারী ওই খগেনবাবু, চৌধুরীদের, সর্দারদের বিচার করবো। তাঁরা যদি নিজেরা না আসেন তাদের জোর করে ধরে আনা হবে। দরকার হলে অমরপুর উদয়পুর শহর থেকেও ধরে আনবো তাদের।

আর আমাদের সৈন্যবাহিনীর রসদ-পত্রও যোগাতে হবে ওই ধনী মহাজনদেরই। আমাদের কারোও সঙ্গে শত্রুতা নেই—শুধু নিজেরা

শান্তিতে মানুষের অধিকারে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বনে পাহাড়ে ওই প্রদীপ্ত ঘোষণা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে কি বজ্র নির্ঘোষের কাঠিন্য আর ব্যাপ্তি নিয়ে।

তাই ওদের কাজ সুরু হয়েছে। শক্তি রায় এর দলবল এখন অনেক সংহত। আর তাইন্দা রায় তার মন্ত্রীসভার বৈঠকে কর্মপন্থা গ্রহণ করে। ওই মিথ্যা অভিযোগ যারা করেছিল তাদের উপরই সুরু হয় প্রথম পালা।

কাঞ্চনবাড়ী মৌজায় এক চকে খগেন রায়ের অনেক ধানজমি আছে, ভালো লুঙ্গা জমি। আর ধানও হয়েছে প্রচুর। খাসা ধান-এর সোনালী মঞ্জরীতে ধানগাছগুলো নুইয়ে পড়েছে। হঠাৎ খগেনবাবুর লোকজন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি সুরু করে, কিছু চাষীও ধান কাটতে তৈরী হচ্ছে। তারা খগেনবাবুর অনুগৃহীত জন। হঠাৎ বন থেকে কয়েকশো লোক এসে ধানক্ষেতে পড়ে সেই পাকাধান কাটতে সুরু করে।

খগেনবাবুর লোকজনকে দেখে শক্তি রায় গর্জে ওঠে। ওদের হাতে বন্দুক দেখে সে বলে—বন্দুক নামাও নাহলে তোমাদের উপরই গুলী চালাবো। ওই ধান আমরা নিচ্ছি। বাধা দিতে এসো না।

রক্ষীবাহিনীও ওই জমির মালিকের লোকজনদের ঘিরে ফেলে ওদের বন্দুকটাও ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল ধান এর বিরাট বোঝাগুলো সমেত।

...গঙ্গারাম রিয়াং-এর উপরও হামলা হয়ে যায়। তার বাড়ির গরু বাছুর ছাগল শূয়োর এবং ধান অবধি তুলে নিয়ে চলে গেল ওরা!

শাসিয়ে যায় তৈন্দুল গঙ্গারামকে—ওই চৌধুরীদেরও বাদ দেব না। এক একটাকে তুলে নিয়ে যাবো।

গঙ্গারাম ভয়ে কাঁপতে থাকে ওদের হাতের উদ্যত অস্ত্র দেখে, মনে হয় প্রতিবাদ করলে প্রাণটুকুও শেষ করে দিয়ে যাবে ওরা।

কুমারিয়া ওঝা চতুর ব্যক্তি, সে এর মধ্যেই তার হাজাছড়ার বাড়ি ঘর থেকে মালপত্র উদয়পুরের মোকামে সরিয়ে ফেলেছে।

রাতের অন্ধকার নামে। ওই স্বদেশী দলের রক্ষীবাহিনী এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

গ্রামের জোতদার মহাজনদের অনেকেই এবার বুঝেছে তাদের বিপদের গুরুত্ব। মোহিনী রিয়াং লক্ষ্মীছড়ার সঙ্গতিপন্ন মহাজন। ঘরে ধানের সঞ্চয় ও অনেক, পাট তামাক-এর বড় মহাজন।

এতকাল সে নিরুপদ্রবে যেন এখানের সাম্রাজ্য চালিয়েছে সর্দার পদবী নিয়ে। আর আশেপাশের বস্তির টিলার চাষীদের সব জমি গ্রাস করেছে। মোহিনী সর্দার খগেনবাবুর বিশ্বস্ত অনুচর। চৌধুরীদেরও বন্ধু-বান্ধব।

মোহিনী রিয়াং গর্জে ওঠে সেদিন লক্ষ্মীছড়ার হাটে—এসব জুলুম সইবো না। আমি গুলি করে ওদের খতম করে দেবো ওখানে এলেই।

মোহিনী সর্দারকে এলাকার সকলেই ভয় করে। লোকটা নিষ্ঠুর আর নির্মম। ওর খাতকদের ধরে নিয়ে গিয়ে দিনভোর বেঁধে রাখে এক ফোঁটা জল অবধি খেতে দেয় না। সেবার একটা লুঙ্গা জমির দখল নিয়ে তিনজন রিয়াং চাষীকে খুন করে ফেলেছিল।

খগেনবাবুদের কিছু টাকা দিয়ে মোহিনী সর্দার সদরে সেসব মামলা খারিজ করিয়েছিল। অনেক অন্যায় নৃশংসতার প্রতীক ওই লম্বা পাকানো চেহারার লোকটা। তাই তার স্পর্দ্ধাও বেড়ে গেছে। ওর সঙ্গী দু-চারজন ও বলে—ঠিক কথা কইছেন সর্দার। ব্যাটা ডাকাতদের সিধা কইরা দিমু।

হঠাৎ হাটের মধ্যেই কলরব ওঠে।

লোকজন ভীত ত্রস্ত হয়ে মালপত্র ফেলে দৌড়াদৌড়ি করছে। হাওয়ায় খবরটা জড়িয়ে পড়ে, স্বদেশী দল এসেছে এখানে।

শক্তিরায় নিজে এসেছে আজ মোহিনী সর্দারের সঙ্গে মোকাবিলা

করতে। সে গর্জে ওঠে—কোথায় যাচ্ছো তোমরা? যে যার মালপত্র নিয়ে বসো, কেনা বেচা করো। কোন ভয় নাই। গরীবের জন্যই আমরা লড়ছি।

…মোহিনী রিয়াং-এর আশপাশের সেই বীরপুরুষরা কর্পূরের মত উবে গেছে এক নিমিষে। শক্তি রায় দাঁড়িয়েছে মোহিনী রিয়াং-এর মুখোমুখি। ভয়ে কাঁপছে মোহিনী রিয়াং। শক্তি রায় বলে।

—তাহলে সর্দার, ভয় পাও আমাদের? তোমাকে স্বদেশী সভা থেকে পাঁচশো টাকা আর পঞ্চাশ মণ ধান জরিমানা করা হয়েছে! আর শেষবারের মত তোমাকে জানিয়ে গেলাম খাতকদের সব খৎ ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে। অনেক খেয়েছো আর নয়।

মোহিনী রিয়াং সেই লোকসানের খবরে শিউরে ওঠে।

—মরে যাব রায়জী!

শক্তিরায় ওর সামনে বাঘের থাবার মত হাতটা বের করে বলে —জরিমানা না দিলে অবশ্য এখুনিই তোমাকে শেষ করে দিতে হবে। ভেবে দেখো—বাঁচতে চাও না টাকা ধান চাও।

ওরা মোহিনী সর্দারকে নিয়ে চলেছে তার বাড়ির দিকে। হাটের সাধারণ মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেছে, তাদের সামনে ওই দোর্দণ্ড প্রতাপ সর্দার আজ কেঁচো হয়ে গেছে ওদের ভয়ে।

…খগেনরায়, তীর্থহরি চৌধুরী, রামজয় চৌধুরীরা এবার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। কালিপ্রসাদ বলে—খুব খারাপ অবস্থা বড়বাবু, গ্রামে গঞ্জে টিলার আর যাবার উপায় নাই।

তীর্থহরি চৌধুরী বলে—অমরপুরের টাউনের দিকে ওরা এগোচ্ছে শুনলাম। ওরা আমাদের এবার শেষ করে দেবে। তখনই বলেছিলাম ওদের ঘাঁটাবেন না।

খগেনবাবুও রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। খগেনবাবু বলে।

—আমার সর্বনাশ ওরা আগেই করেছে। বগাফার এত জমির

সব ধান চলে গেছে, আমার বাড়িঘরে অবধি হামলা করেছে। উদয়পুর চলে আসতে বাধ্য হয়েছি।

গঙ্গারাম, কুমারিয়া ওঝা, ওদেরও সমূহ বিপদ। বিজয় চৌধুরীই খবরটা আনে—চৌধুরীদের কেউ কেউ ওদের দলেও গেছে শুনেছেন খবরটা? রাজপ্রসাদ চৌধুরী, সেই ছোকরাও লেখাপড়া শিখে ওদের ওখানেই নাকি চলে গেছে।

চমকে ওঠে খগেনবাবু—তছলম্ফা এখন ওখানে?

বিজয় চৌধুরী বলে—তাই তো শুনছি।

...ওদের সামনে যেন একটির পর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। খগেনবাবু রাজারাম চৌধুরী তীর্থহরিদের দেশের বাড়িতে ও যাবার উপায় নেই। এইভাবে ঘরবাড়ি ছেড়ে পলাতকের মত তারা উদয়পুর শহরে এসে রয়েছে।

আর খবর আসছে, নানা বিচিত্র সংবাদ।

মৈতুল ওই অবস্থাতেও সেদিন গিয়েছে অমরপুরের দিকে, কিন্তু অতদূর এগোতে পারে নি। গোমতীর ওদিকের জঙ্গলে দেখেছে বেশকিছু লোককে, হাতে টাক্কাল, খড়গ, বল্লম দু-চারটে বন্দুকও আছে। কোথায় হানা দিয়ে মালপত্র নিয়ে ওরা ফিরছে।

মৈতুল ঘন বেতবনের ভিতরে ঢুকে পড়েছে ওদের ভয়ে, এসময় ওদের সামনে পড়লে খতম করে দিয়ে যাবে তাকে। মশা জোঁক লেগেছে, কিন্তু নড়ার উপায় নেই।

ওখানে বসেই শুনেছে কথাগুলো ওরা এবার নাকি অমরপুর টাউন, উদয়পুর টাউনে হানা দেবে।...তাদের দল ক্রমশঃ ওই দিককার অঞ্চল মুক্ত করে এবার এই দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা হাজারে হাজারে এসে ঘিরে ফেলবে এই অঞ্চলকে।

লোকগুলো একটু জিরিয়ে গাঁজার ছিলাম টেনে চাঙ্গা হয়ে আবার চলে গেল, মৈতুল বের হয়ে সোজা উদয়পুরে ফিরে এসেছে, পায়ে গায়ে জোঁকের কামড়ের ঘাগুলো বেড়ে উঠেছে।

মৈতুল ওই অবস্থাতেই খবরটা জানাতে বিজয়বাবু ঘাবড়ে যায়। বলে সে—এর প্রতিকার না হলে ওরা অমরপুর দখল করবে, উদয়পুরেও এ্যাটাক করবে। ওদের লোকবল হাজার হাজার, তাছাড়া বিদেশী অস্ত্র মেশিনগানও পেয়ে গেছে। রাজদরবারে সব কথা জানান রায়কাঞ্চন।

খগেনবাবু ভাবছে আজ রায়কাঞ্চন হবার সাধ আর তার নেই। তবু খগেন রায় আজ প্রতিশোধ নেবার জন্য চেষ্টা করবেই। দেশ বাড়ি ঘর সব গেছে। এবার ওই প্রতিপক্ষ তাদের খুঁজেই বেড়াচ্ছে, দরকার হলে এই শহরেই হানা দেবে এমন খবরও আসছে।

মিহিরবাবু বিপদে পড়েছেন। বেশ কয়েকবারই চেষ্টা করে-ছিলেন ওই রতনমণির দলকে সমুত করার জন্য, আর যে ভাবেই হোক ওরা জাল কেটে বের হয়ে এসেছে, আর দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আজ আঘাত হেনেছে। তার উপর চাপ আসছে, এবার গঙ্গারাম রিয়াং—আরও অনেকে দরখাস্ত দিয়েছে জেলা সদরে। তাদের উপরে রতনমণির দলের অত্যাচারের কথা লিখিতভাবে জানাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে এর সরেজমিনে তদন্ত করতে হুকুম দিয়েছেন।

মিহিরবাবু জানেন ওরাও তাকে পেলে ছেড়ে দেবে না।

খগেনবাবুও মিহিরবাবুকে দেখে বলে—আপনারা এইবার বিহিত করুন। ওরা অমরপুর দখল করে নেবে উদয়পুরেও এ্যাটাক করবে শুনলাম।

মিহিরবাবু ঘাবড়ে যান। তবু সেই ভয়টা প্রকাশ করে না। বলে ওঠে—এতই সোজা? দরকার হলে মিলিটারী নামিয়ে দেবেন মহারাজা। রতনমণি তো চুনোপুটি!

বিজয়বাবু বলে তাদের হাত থেকে নিরীহ মানুষদের বাঁচাতে পারছেন? তাদের ধান, টাকা, ঘরবাড়ি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। আমাকেই তো অমরপুর ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ওরা অমরপুর দখল করে স্বাধীন স্বরাজ গড়ে তুলবে।

মিহিরবাবু বলে ওঠেন বীরদর্পে –ওসব কথা ছাড়ুন। কাল পরশুই নিজে যাচ্ছি সরেজমিনে তদন্ত করতে তুইনানীর ওদিকে। ওসব গুজবে কান দেবেন না।

তবু এরা আশ্বস্ত হতে পারে না। তাছাড়া চৌধুরীদেরও বেশ কিছু লোকজন এখন প্রকাশ্যে রতনমণিকে সমর্থন করছে। এ খবরটায় তারা আরও ভাবনায় পড়েছে।

রাজপ্রসাদ চৌধুরীকে এ এলাকার সকলে তছলাম্ফা বলেই চেনে। চৌধুরী পরিবারটা এ অঞ্চলে বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার। আর রাজপ্রসাদ লেখাপড়াও করেছে, কিন্তু আরও পাঁচজনের মত এক ছাঁচের মানুষ সে নয়। দেখেছে চোখ মেলে আশপাশের এই অত্যাচার, গরীব রিয়াং—ত্রিপুরী চাষীদের উপর মহাজনদের জুলুম, সর্দারদের অত্যাচার, চৌধুরীদের দাপট। মাঝে মাঝে জোতদারদের ধান চাষের সময় দেখেছে কয়েকশো মানুষকে বিনা মজুরীতে কাজ করতে।

ওদের অঞ্চলের জমিতে জলসেচের অসুবিধা নেই। ত্রিপুরার লুঙ্গা জমিতে সোনা ফলে, আর জল। মাটির অতলের সঞ্চিত জল পাইপ দিয়ে আপনা হতেই দিনরাত তোড়ে বের হয় আর্টেজীয় কূপের আকারে। তাই বছরে দুবার তিনবার ধানও এখানে সম্ভব। কিন্তু দেখেছে ওই মানুষগুলোকে দিনমজুরীতে বেগার দিতে হচ্ছে সর্দারদের ঘরে, চৌধুরীদের জমিতে, মহাজনের খেতে।

আর ক্রমশঃ ওই অত্যাচার-এর নীরব প্রতিবাদ আজ মুখর হয়ে উঠেছে। রাজপ্রসাদ চৌধুরী ওদের নিয়ে সামান্য আন্দোলন গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে অনেকে বিশ্বাস করতে হয়তো দ্বিধা করেছিল।

আজ তাই এই আন্দোলনের সামিল হবার জন্যই সে এসেছে রতনমণির কাছে। তরুণ তেজস্বী একটি যুবক।

রতনমণি এর আগেও দেখেছেন ওকে। ওর কথাগুলো শুনেছেন।

তিনি বলেন—কিন্তু এপথে বিপদ পদে পদে। আর তোমার পরিবারের অনেকেই এটা অপছন্দ করবেন।

তরুণ রাজপ্রসাদ চৌধুরী বলে—এ আমার নিজের বিবেকের নির্দেশ ঠাকুর।…এই রাজতন্ত্রের দিন ফুরিয়ে আসছে, নোতুন দিন আসবে সাধারণ মানুষের সামনে, তারাই আনবে সেই পরিবর্তন। পিছিয়ে থাকতে রাজী নই। রতনমণি বলেন—

—ভেবে দেখো তছলাম্ফা পরে আলোচনা করা যাবে।

খুশীকৃষ্ণ দেখছে ওই তরুণটিকে। ওর ভালো লাগে রাজপ্রসাদকে। তাই আড়ালে সে রতনমণিকে বলে। —ও কিন্তু সাচ্চা মানুষ ঠাকুর। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ গো ভাবের মানুষ।

রতনমণি চাইলেন খুশীকৃষ্ণের দিকে। উনিও সেটা বুঝেছেন, জানেন লেখাপড়া জানা ছেলে রাজপ্রসাদ। ওকে দিয়ে কাজ হবে। ওর কথাগুলোও শুনেছেন রতনমণি। মনেহয় দূরদৃষ্টি আছে রাজপ্রসাদের। আজ না হোক সেই দিন আসবেই। এই শোষণের নাগপাশ ছিঁড়ে এদেশ স্বাধীন হবে, সাধারণ মানুষের দেশ হবে। রাজপ্রসাদ হয়তো সেদিন বেঁচে থাকবে সেই স্বাধীন রাজ্যের কাজে এগিয়ে আসবে। তাই অন্ততঃ একজনকেও তিনি তার স্বপ্নের উত্তরাধিকারী করে যাবেন।

রতনমণি বলেন—ওকে আরও সময় নিয়ে ভাবতে বলেছি খুশীকৃষ্ণ। নিজেকে তৈরী করুক রাজপ্রসাদ।

(অবশ্য রতনমণির স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। স্বাধীনতার পর ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন এই রাজপ্রসাদ চৌধুরী ওরফে তছলাম্ফা।)

…এই রাজপ্রসাদকেই রতনমণি দিয়েছিলেন তার অর্থদপ্তরের ভার। রামজয় বলে—এবার কাজের লোক পেলাম ঠাকুর। একদিকে নিশ্চিন্ত।

আর খুশীকৃষ্ণ তবু তার কাজ করে চলেছে।

উদয়পুরের হাটে সেদিন জমজমাট কেনা বেচা চলেছে। দিন বেলাবেলি সকলেই কেনা বেচা শেষ করে ঘরে ফিরতে চায়। কারণ চারিদিকে খবর ছড়াচ্ছে এখানে হানা দেবে স্বদেশী দল। আর চৌধুরীরাও প্রাণভয়ে এখানে এসেছে—তাই স্বদেশীদের রাগ রয়েছে।

একতারায় সুর ওঠে।

নন্ লুক জাগানো ওয়াইছা।

হরিমুং লাই খুক্সা কুরুই।

বাঘালাই বুকচাছা।

ইয়াথিয় জুতা কাখা।

হুয়াগ ঘড়ি খাকা।

ধকুরম থক মুতুম ফুলই

তামা থাতুং খাকা।

হাটে লোকজন কমে গেছে, খুশীকৃষ্ণের পরণে গেরুয়া আলখাল্লা মাথার লম্বা চুলগুলো বাঁধা।

ওর গান শুনে লোকজন ভিড় করেছে।

খগেনবাবু ও হাটে এসেছে কালীপ্রসাদ রয়েছে সঙ্গে, আর মৈতুল এখন দিনরাতের সঙ্গী।...ওই গান শুনে চমকে উঠেছে খগেনরায়। তাকে নিয়েই গান বেঁধে ওরা হাটে হাটে গাইছে। কক্বরক রিয়াং ভাষায় ও গানের মানে সকলেই জানে এখানে। তারাও হাঁসছে। ওরা প্রকাশ্য হাটে গঞ্জে এবার খগেন রায়কে ও শাসাচ্ছে। আর এসেছে খাস উদয়পুর অবধি। ওরা গাইছে।

এবার তুমি এর ফলভোগ করবেই!

হরিনামও নাও না।

তোমার হৃদয় শূন্য!

পায়ে জুতো পরেছো,

হাতে ঘড়ি বেঁধেছো,

মাথায় খোসবু তেল মেখে কি আনন্দ পেলে?

হাতি ঘোড়া চড়ে রথী মহারথী সেজে,

আর সুন্দর হতে চেয়ো না।

মাংস হাড় আলাদা হয়ে

ভগ্নস্তূপে পরিণত হবে।

…খগেনরায়ের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে।

—মৈতুল।

মৈতুলও চিনেছে ওই বাউলকে। ও রতনমণির চেলা খুশীকৃষ্ণ, আর ভাবতে পারেনি যে এখানে এসে প্রকাশ্যে এইভাবে তাকে শাসাবে। মৈতুল বলে—সব ক'টাকে ধরে আনবো বাবু?

খগেন রায় চতুর লোক। ও জানে এতে গোলমালই বাধবে। হয়তো ওদের দলের লোক আশেপাশেই তৈরী হয়ে আছে। এখুনি তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। নয়তো একটা গোলমালই হবে।

তাই বলে—থাক! একটু নজর রাখিস ওর দিকে।

খগেনবাবু ক্রুদ্ধ অপমানিত হয়ে সরে এল। ভয়ও হয়, মনে হয় হাটের ৫৬ হাজার মানুষের মাঝে ওই লুটেরার দল এসেছে এখানে।

তাই কোতোয়ালীতেই এসে হাজির হয়েছে খগেনবাবু।

মিহিরবাবু ওর হাঁকডাকে বের হয়ে আসেন। ইদানীং তিনি বাইরে বেরোনো কমিয়ে দিয়েছেন। খগেনবাবুকে দেখে মিহিরবাবু বলেন।

—কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তা খবর কি?

খগেনবাবু চটে উঠে জানান ওরা হাটে এসে পড়েছে—জানেন না?

—ওই রতনমণির দল? হাটে রতনমণির দল এসেছে?

বড়বাবু একলাফে তিনটে সিঁড়ি টপকে কোতোয়ালীর বারান্দায় উঠে পড়ে হাঁকডাক সুরু করেন—কোই হ্যায়! জলদি হাতিয়ার লাও। বন্দুক লাও। ডাকু আগিয়া!

গলা সপ্তমে তুলে চেঁচাতে সুরু করেন বড় দারোগাবাবু।

থানায় হৈ হৈ পড়ে যায়।

চারিদিকে দুমদাম দরজা বন্ধ হচ্ছে; পথে ঘাটে হাওয়ায় ওই চীৎকার, ওই সাংঘাতিক খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। সারা শহরে নিমেষের মধ্যে রটে যায় রতনমণির দল পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে হানা দিয়েছে। দোকানপশার বন্ধ হচ্ছে, রাস্তার লোকজন দৌড়াচ্ছে ভয়ে।

খবরটা হাটে এসে পড়েছে। পশারী—লোকজন সবাই দৌড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। মৈতুল কালিপ্রসাদও নজর রেখেছিল খুশীকৃষ্ণের দিকে, কিন্তু ওই খবর পাবামাত্র দুজনেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। মুক্তকচ্ছ অবস্থায় দৌড়াচ্ছে কে, পায়ে কাছাটা আটকে ছিটকে পড়েছে, তাকে ধরতে দৌড়াল কয়েকজন লোক।

যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে, খুশীকৃষ্ণ অবাক! ওর সঙ্গে কেউ ছিল না। একাই ও যত্রতত্র ঘোরে, কিন্তু এখানের বিচিত্র কাণ্ড দেখে মুক্ত হাটের আঙ্গিনায় প্রাণভরে হেসে নিয়ে সে গোমতীর খেয়াঘাটের দিকে এগোলো। সেখানে বিচিত্র কাণ্ড ঘটে চলেছে। নৌকায় ওঠার লোক নেই, সবাই দৌড়াচ্ছে মাঠের পথ ধরে, কেউ বা মাতাবাড়ির দিকেই দৌড়াচ্ছে। রতনমণির দল মন্দিরে নরহত্যা করবে না, তাই ওই ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের দিকেই আশ্রয়ের সন্ধানে চলেছে তারা।

…কিন্তু কোথায় কি? ক্রমশঃ লোকে একটু সাহসে ভর করে দাঁড়ালো। তেমন কিছুই ঘটতে না দেখে আবার গুটি গুটি ফিরে আসে তারা, আবার দোকানপাট-এর দরজা খোলে, লোকজনও পথে বের হয়।

বড়বাবু থানায় তখনও আস্ফালন করছেন।

—এখানে এলে শেষ হয়ে যাবে তা জানে ওরা। তাই ল্যাজ গুটিয়ে গর্তে সেঁদিয়ে গেছে। এবার টেনে বের করবো এক একটাকে।

রিপোর্টগুলোর তদন্ত করা হয় নি। এবার আগরতলা থেকে তাড়া এসেছে। মিহিরবাবুর মনে হয় ওই খগেনবাবু নাহয় চৌধুরীরাই আগরতলায় দরখাস্ত দিয়েছে। এবার ওই গঙ্গারাম রিয়াংদের দরখাস্তের রিপোর্ট পাঠাতেই হবে সরেজমিনে তদন্ত করে। মিহিরবাবু হঠাৎ বুদ্ধিটা বের করে।

ওর গিন্নীও অবাক হয়, কর্তাকে এসে সটান একটা লাইসাম্‌পি মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে দেখে। মিহির গাঙ্গুলী সাধারণতঃ বিছানা নেয় না।

সে আজ বলে—দারুন পেটের যন্ত্রণা।

—ডাক্তার ডাকবো! ডাক্তার ডাকার কথা শুনে বড়বাবু বলে।

—খামোকাই ওসব করা। যোয়ানের আরক—সোডা খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর খবর দাও ছোটবাবু থানায় এলে যেন বাসায়···এসে দেখা করে। জরুরী দরকার। থানায় বলে পাঠাও।

গিন্নী বাড়ির ঝিটাকে দিয়েই থানায় খবর পাঠালো।

বড়বাবুর মনটা ভালো নেই। আজকের হাটে মাংস এসেছিল। কে দিয়ে গেছে খানিকটা। আর জেলেরা বড়বাবুকে গোমতীর টাটকা পাবদা মাছ ভেট দিয়ে গেছে। গিন্নী ঘরের গরুর দুধের পায়স করেছে কচি লাউ দিয়ে, মিহিরবাবু অবশ্য নজরানা হিসেবে বেশ কিছু আমদানী করেন হাট থেকে, জেলেদের কাছ থেকেও। ওগুলোর জন্য আর তদ্বির করতে হয় না, আপনা হতেই আসে। তাই একটু ভোজন বিলাসী হয়ে পড়েছেন. আর খাদ্য রসিকও।

কিন্তু আজ কিছু করার উপায় নেই, স্রেফ বার্লি জল পাতিলেবু দিয়ে কিছুটা বোদামুখ করে গিলে ছোটবাবুকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন।

ছোটবাবু দীনেশ দাশ থানায় এসে বড়বাবুর খবর পেয়ে ওর বাসাতেই এলেন। বড়বাবু কান পেতে ছিলেন। বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে আগা-পাশতলা মুড়ি দিয়ে টানটান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েন। দীনেশবাবু ভিতরে এসে অবাক হয়ে বলেন—শরীর খারাপ স্যার?

বড়বাবু কোন রকমে বিছানায় উঠে বসে বলেন—দারুণ যন্ত্রণা পেটে, কে জানে কি হল। বসতে পারছি না। এদিকে ওই গঙ্গারাম রিয়াং, রাজপ্রসাদ চৌধুরীদের কেসের তদন্তে যাবো, সব রেডি, কেস দুটোর রিপোর্ট দেবার জন্য জরুরী নোট এসেছে খাশ দরবার থেকে, কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল। কি করে স্পটে যাই ?

দীনেশ দাশ সজ্জন ব্যক্তি। বড়বাবুর শরীরের অবস্থা দেখে তিনিও ভাবনায় পড়েন। তিনিও জানেন কেসগুলো জরুরী, তিন দিনের মধ্যে সদরে রিপোর্ট পাঠাতেই হবে। আর দেরী করা চলবে না। চাকরীর ক্ষতি হবে, থানার উপর বদনাম আসবে।

তাই দীনেশবাবু বলেন—এ নিয়ে ভাববেন না। আপনি বরং ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে বিশ্রাম নেন।

—কিন্তু এদিকে চাকরী সামলাই কি করে ? বড়বাবু কঁকিয়ে ওঠেন।

দীনেশবাবু বলেন—আমিই যাচ্ছি ওগুলোর তদন্তে, ফিরে এসে সব দেখে-শুনে রিপোর্টটা খাড়া করা যাবে। আজই ঠিকঠাক করে বাদীদের সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরেই রওনা দেব।

বড়বাবুর ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে। তবু চিন্তিত মনে কি ভেবে বলেন—কিন্তু কি বিপদে পড়লাম বলুন তো ? যাক্, আপনি সব দেখে শুনে আসবেন। মনে হয় অনেকখানিই ফাঁকা আওয়াজ ওদের। ফিরে এসে রিপোর্ট দেবেন, আমি গুছিয়ে সব লিখে দোব। হ্যাঁ—গঙ্গারাম, রাজপ্রসাদও সঙ্গে যাবে বলেছে। কই গো ! ওষুধটা দাও।

গিন্নী ততক্ষণে দীনেশবাবুর জন্যে চা নিয়ে এসেছেন, দীনেশবাবু বলেন—এসময় আবার চায়ের হাঙ্গামা কেন বৌদি ?

কোন রকমে চা পর্ব শেষ করে দীনেশবাবু বড়বাবুর কাছ থেকে ফাইলটা দেখে শুনে নিয়ে বলেন—তাহলে চলি, ওই গঙ্গারাম, রাজপ্রসাদ চৌধুরীও সঙ্গে যাবার কথা বলেছিল, দেখি ওদের। দিন তিনেকের মধ্যেই ফিরে আসবো। দীনেশবাবু বের হয়ে গেলেন।

বড়বাবু বিছানায় পড়ে তখনও ছটফট করছেন যন্ত্রণায়।

দীনেশবাবু দায়িত্বটা নিয়ে এবার কাজে এগোবার সব ব্যবস্থাই করেছেন। বন-জঙ্গলের পথ, আর সেসব জায়গায় তেমন কিছু মিলতে নাও পারে। তাই এখান থেকে চাল, ডাল, ঘি কিছু মশলাপত্র, বিছানা ইত্যাদি বয়ে নিয়ে যেতে হবে। তার জন্য ওখানকার একজন নোয়াতিয়া আদিবাসীকে দিন-মজুরীতে ঠিক করে নেন। ওরা এসে পড়ে দীনেশবাবুর বাসায়, দীনেশবাবু গঙ্গারাম রিয়াং ও রাজপ্রসাদ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কুলির মাথায় মালপত্র উঠিয়ে বের হলেন, তখন উদয়পুরের আকাশে সূর্যের আলো জেগেছে। গোমতীর জলরেখা পার হয়ে টিলার গা দিয়ে ওরা গিয়ে বনের দিকে এগিয়ে চললেন।

...বড়বাবু দেখেছেন ওদের এগিয়ে যেতে। ওপারে টিলার গা বেয়ে চলেছে ক'টা মানুষ। তারপর ওরা বনে ঢুকে গেল। বাতাস বইছে, নদীর গুঞ্জরণ কানে আসে।

—কেমন আছো?

হঠাৎ গিন্নীর ডাক শুনে চাইলেন বড়বাবু। কালকের সেই অসুস্থ মানুষটা ঝেড়ে-ঝুড়ে বিছানায় উঠে বসে বলে।

—ভালোই আছি। তা চা হ'ল?

—চা খাবে? কাল পেটের যন্ত্রণায় কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছিলে।

বড়বাবু ধমকে ওঠেন—কালকের কথা কাল চুকে গেছে। এমন হয়। দাও, চা দাও, আর সঙ্গে খান চারেক পরোটাও দিও, কালকের সন্দেশ আছে না সব গেছে? তাহলে দু-চারটে দাও!

গিন্নী অবাক হয়ে দেখছে মানুষটাকে। বড়বাবুর পেট জ্বালা করছে, কাল-রাত-ভোর উপোস দিয়ে থাকতে হয়েছে। তাই মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। বেশ চড়া স্বরে বলেন তিনি।

—কথা কানে গেল না ?

গিন্নীও চটে উঠে বলে—এনে দিচ্ছি! যতো খুশী গিলবা!

দীর্ঘ বন পাহাড়ের পথ। ঘন বাঁশ বনের বুক চিরে সরু পায়ে চলা পথটা ধরে চলেছে ওরা রতনমণির ক্যাম্পের দিকে। দীনেশ-বাবুর পুলিশের চাকরীতে এসব কষ্টকর অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে, কিন্তু এ পথের যেন শেষ নেই। পথের ধারে শূন্য হাটতলার চালায় একটু বিশ্রাম করে দুপুরের আহার সেরে আবার চলতে শুরু করেছে তারা।

গঙ্গারাম বলে—আর একটু দূরেই কুমারিয়া ওঝার বাড়ি, ব্রহ্মছড়া বসতিতে। আজকের রাতটা ওখানেই কাটিয়ে কাল বেরুবো।

বন অঞ্চল এখানে গভীর। মাঝে মাঝে বুনো হাতির পালও বের হয়। বাঁশবন, শাল গর্জন গাছগুলোর ছাল-বাকল তোলা, গাছগুলো ভেঙ্গে পড়ে আছে। যেন বনে তাণ্ডব বয়ে গেছে। তিরতিরে জলের ধারা বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে দু'একটা ছড়া। দূরে টিলার গায়ে দু-চারটে বসতি দেখা যায়। হঠাৎ ওদের স্তব্ধতার বুকে একটা তীক্ষ্ণ স্বর ওঠে। থমকে দাঁড়ালো ওরা।

বাতাসে সেই শব্দটা উঠেছে। দীনেশবাবু বলেন—কিসের শব্দ ?

গঙ্গারাম থমকে দাঁড়িয়েছে। কান করে সেও শুনেছে শব্দটা। বলে—বোধহয় কেউ মোষের শিঙের তৈরী শিঙা বাজাচ্ছে। রাখালরা বাজায় বনে।

কেমন একটু বিচিত্র ঠেকে। ওরা এগিয়ে গেল বসতির দিকে।

কুমারিয়া ওঝা ব্রহ্মছড়া গ্রামেই রয়েছে। তার জমির ধান লুট করে নিয়ে গেছে। খামারের ধানও গেছে। দুটো মোষ আর একশো টাকা নজরাণা দিয়ে কোন রকমে ভয়ে ভয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ওই খাকি পোশাক পরা দুজন কনেষ্টবল আর থানার

ছোটবাবুকে দেখে সে বুকে বল পেয়ে দৌড়ে এল শুদের অভ্য-
র্থনা জানাতে—আসুন স্যার। কি ভাগ্যি আমার!

দীনেশবাবুর সঙ্গী কনেষ্টবল শরৎ দাস আর বিধু মজুমদার
পুরোনো লোক। ওরা দেখছে গ্রামের কৌতূহলী লোকদের ভীতত্রস্ত
চাহনি। ওরা আসায় যেন সাহস পেয়েছে গ্রামের লোক।

শরৎ দাস বলে এদিকে গোলমালের খবর পেয়ে তদন্তে এলাম
আমরা। আজকের রাতে এখানেই থাকবো।

কুমারিয়া ওঝা সঙ্গতিপন্ন চাষী, আর গ্রামের মানুষের সামনে
নিজের প্রতিষ্ঠা দেখাবার জন্য বলে—গরীবের ঘরেই থাকবেন।
চলুন।

হুকুম করে একজনকে—হুজুরদের জন্যে চেয়ার পাত, আর জল
গুয়া-পান দে।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ওরা সব আয়োজন করতে থাকে। বিরাট
চালাঘর, মাটির দেওয়াল, একটা তক্তপোষ পাতা ওদিকে নীচু চালায়
বড় উনুন পাতা, মাটির হাড়িগুলোয় ওদের ভাত, ছ্যাং—শবজী সব
রাঁধা হয়।

ওদিকে কয়েকটা পোড়া বাড়ির কাঠামো ধ্বসে পড়ে আছে।

হঠাৎ তারাজ্বলা অন্ধকারে আবার সেই তীক্ষ্ণ শব্দটা ভেসে
আসে। চমকে ওঠেন দীনেশবাবু। শুধোন—ওটা কিসের শব্দ হে?

কুমারিয়া ওঝা বলে—ওসব রক্ষীবাহিনীর সংকেতের শব্দ
ছোটবাবু। রাতে এমন আওয়াজ ওঠে। এসব তো ওই স্বদেশী দলেরই
এলাকা। ওদের কাজে বাধা দিলে ফল খারাপই হবে। ওই দেখুন।
ওই পোড়াবাড়িগুলোর দিকে দেখায় কুমারিয়া ওঝা। ওরা বাড়িঘর
পুড়িয়ে দিয়েছে। আজ সে যেন এতদিনের জমানো প্রতিবাদের
কথাগুলো বলে হাল্‌কা হতে চায়। কুমারিয়া গলা নামিয়ে বলে।

—ওদের ভয়ে কাঠ হয়ে আছি ছোটবাবু, এবার এসেছেন,
প্রতিকার কিছু করেন আপনারা।

…রাত্রির অন্ধকারে দূর দূরান্তরে ভেসে চলেছে সেই শিঙার তীক্ষ্ণ শব্দটা, কি অজানা ভাষায় ওরা বোধহয় খবর আদান প্রদান করছে। বনে পাহাড়ে সেই শব্দটা কি আতঙ্ক আনে এদের মনে।

সারাদিনের ক্লান্তির ফলে ঘুম আসতে দেরী হয় না। ঘুম ভাঙ্গে সেই সকালে পাখ-পাখালির কলরবে। টিলার বুকে গাছ গাছালির বুকে প্রথম সূর্যের আভা পড়েছে।

দীনেশবাবু বলেন—বেরুতে হবে গঙ্গারামবাবু, ওঝাজি তুমিও সঙ্গে চলো। তবু চেনা জায়গা তোমার।

রাজপ্রসাদ চৌধুরীও দল বাড়াতে চায়। তাই বলে সে—ও যাবে বলেছে।

ওরা আবার চলেছে। হঠাৎ পথের ধারে টিলার নীচের জমিতে কলরব শুনে চাইল ওরা। বহুলোক পাকা ধানের ক্ষেতে নেমে ধান কাটছে। আরও অবাক হয় দীনেশবাবু, লোকগুলো তাদের দেখে ধান কাটা ফেলে বনে ঢুকে গেল।

—কি ব্যাপার হে?

কুমারিয়া ওঝা বলে—ওরা রতনমণির দলের লোক, জোর করে এ এলাকার মহাজনদের জমির ধান কাটছিল। সরে আসুন ছোটবাবু। চলুন! এগোই আমরা!

সারা এলাকা কেমন যেন থমথমে। বসতির লোকজনও তাদের দেখে এগিয়ে আসে না। ওরা যেন কোন এক বিচিত্র রাজ্যের পথ ধরে চলেছে।

শরৎ দাস বলে—গতিক ভালো বুঝছি না ছোটবাবু?

দীনেশবাবু বলেন—এসেছি যখন দেখাই যাক শেষতক্ কি হয়। ওরা চলেছে বনের পথ ধরে। বৈকাল নাগাৎ গঙ্গারাম রিয়াং-এর বসতিতে এসে পৌছোল।

গঙ্গারাম এখান থেকে আগেই সপরিবারে চলে গেছে। তাই ওর খালি ঘরটাই পড়ে আছে মাত্র। জিনিষপত্র কিছুই নেই। শূন্য

ঘরটায় ওরা ঢুকলো। রান্নাপত্র করতে হবে। বাসনকোসনের দরকার। গঙ্গারাম ওদিকের এক জমাতিয়ার বাড়ি থেকে বাসন কিছু নিয়ে এসেছে। সঙ্গের নোয়াতিয়া কুলিটা রান্নার আয়োজন করছে।

কুমারিয়া ওঝা রাজপ্রসাদ চৌধুরীও চুপচাপ রয়েছে। কি অজানা ভয়ে ওরা যেন কথা বলতে ভুলে গেছে। গঙ্গারাম রিয়াং তখনও বলে চলেছে—ওরা আমাকে পথের ভিখারী করেছে ছোটবাবু।

…হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দে চাইল ওরা।

গঙ্গারাম রিয়াংকে দেখে লোকটা ককবরক্ ভাষায় কি বলে যায়। গঙ্গারামের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কনেষ্টবল শরৎ দাস রিয়াং ভাষা বোঝে। সে রান্নার কাজ ফেলে এগিয়ে এসে বলে দীনেশবাবুকে—স্যার, ওরা এখুনিই এখান থেকে পালাতে বলছে। নাহলে নাকি ওই স্বদেশী দলের লোকেরা আমাদের উপর হামলা করবে। ওদের গ্রামের লোকদের ও ছেড়ে কথা বলবে না।

দীনেশবাবু কি ভাবছেন। এতদূর এসে বিনা তদন্তে ফিরে যেতে চান না। তাই তিনি শরৎ দাস আর বিধু মজুমদারকে বলেন। তোমরাই বরং তুইনানী ক্যাম্পে যাও, ওখানকার কর্তাদের গিয়ে খবর দাও। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বিধু মজুমদার একটু ঘাবড়ে যায়—ওখানে যেতে হবে ?

দীনেশবাবু বলেন—ডিউটি করতে এসেছি, যেতে হবে। কি আর করবে তারা ? যাও, এত ভয় কিসের ?

জমায়েত লোকজনের সামনে খাকি পোষাকপরা পুলিশের ভীত হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বাধ্য হয়েই ওরা দুজনে বের হয়ে গেল টিলার ওদিকে তুইনানী ক্যাম্পের দিকে।

তুইনানী ক্যাম্প-এর বনঢাকা টিলাটা কাছেই, এখানের টিলার নীচে কিছু ধান জমির ওপারেই তুইনানী ক্যাম্পের সীমানা ঘনবনে ঢাকা, তাই তেমন কিছু দেখা যায় না বাইরে থেকে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে, ওরা দুজনে ধানজমি পার হয়ে ক্যাম্পের টিলার দিকে চলেছে। হঠাৎ স্তব্ধতা খানখান্ করে ওই রহস্যময় সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্যাম্পের দিক থেকে চীৎকার, কলরব শোনা যায়, আর চারিদিক থেকে শিঙার আওয়াজ ভেসে আসে। শান্ত আরণ্যক পরিবেশটা কি রহস্যময় আবেশে বদলে যায়।

কয়েকজন পাহাড়ী আদিবাসীও ছুটে এসে হাজির হয়েছে দীনেশবাবুর এখানে। ওদের একজন বলে—ক্যাম্প থেকে লোকজন তৈরী হয়ে আসছে। একেবারে শেষ করে দেবে। ওই কনেষ্টবল দুজনকে আটকে রেখেছে, আপনাদেরও ধরে নিয়ে যাবে। শীগগির পালান যদি প্রাণে বাঁচতে চান।

দীনেশবাবু বিপদে পড়েছেন। একেবারে নিরস্ত্র, তাছাড়া কনেষ্টবল দুজন এখন ওদের হাতে। তাই তাঁর চলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি ভাবনায় পড়েছেন। তবু বলেন অন্য উপায় না দেখে—যা করার ওরা করুক, আমার লোকদের ফেলে পালাবো না।

…কিন্তু গঙ্গারাম ভয়ে কাঁপছে! সে জানে ওই স্বদেশী দলের স্বরূপটা। তাই সে বলে—আমাকে পেলে ওরা কেটে ফেলবে স্যার। আমি চলে যাই।

সে তখুনিই পিছনের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। ওর দেখাদেখি বাকী কয়েকজনও রান্নার কাজ ফেলে রেখে বনে পালালো। শুধু মাত্র রাজপ্রসাদ, কুমারিয়া ঝা আর দীনেশবাবু এই তিনজনেই পড়ে রইল এই নির্জন বনরাজ্যে। সন্ধ্যার অন্ধকার জমেছে কি দুঃস্বপ্নের মত। এ যেন এক অর্থহীন প্রতীক্ষা।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চাইল। কনেষ্টবল্ দুজন ফিরছে। দীনেশবাবু এবার ভাবছেন যে স্বদেশী দল তাদের এভাবে শেষ করে দেবে না, তাহলে ওদের ফিরতেই দিত না। শরৎ দাস শুকনো স্বরে বলে।

—ওরা কাল সকালে এখানে আসবে তদন্তের ব্যাপারে, নাহয় আমাদের নিয়ে যাবে।

এবার একটু নিশ্চিন্ত হন দীনেশবাবু। রাত্রিটা তবু ওরা কোনরকমে খাওয়াদাওয়া সেরে ওই পরিত্যক্ত ঘরখানায় শোবার আয়োজন করে। শরৎ দাস, বিধু মজুমদার বলে দীনেশবাবুকে —তুইনানী ক্যাম্পটা নাকি ছোট, তবু বিরাট ব্যাপার করেছে স্যার। মনে হয় পাঁচ সাত হাজার মানুষ রইছে, আর অস্ত্রশস্ত্রও আছে ওগোর। আমার তো গতিক ভালো বোধহয় না স্যার।

দীনেশবাবু কি ভাবছেন। ঘুম আসে না। অন্ধকারে ওই সংকেতের শব্দ, কাদের সাবধানী পায়ের চলাফেরা—ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ যেন অন্ধকারে ভেসে আসে।

ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে ওরা দেখে তাদের আশ্রয়ের চারিপাশ ঘিরে রেখেছে ওই স্বদেশীদলের লোকজন। ওদের হাতে টাক্কাল, কাতান, বল্লম, তরোয়াল সব রকম অস্ত্রই রয়েছে।

ওরা এগিয়ে এসে রাজপ্রসাদ চৌধুরী আর কুমারিয়া ওঝাকে দেখে গর্জে উঠে—শালা কুকুরের দল আইছস? বাঁধ এগুলারে। নিই চল!

একজন হুকুম দিতে ওরা এগিয়ে এসে ওদের বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে। রাজপ্রসাদ বলে ওঠে।

—জুলুম করছো কেন?

লোকটা ওর মুখে একটা থাবড়া কসে গর্জে ওঠে—চুপ মাইরা রও। জুলুম! এতকাল ওটা তোমরাই করেছো। চলো।

টানতে টানতে নিয়ে চলেছে ওদের। সেই সর্দার বলে ওঠে দীনেশবাবুকে, আপনারাও চলেন।

ওদের অবশ্য গায়ে হাত দেয় না, কিন্তু দীনেশবাবু বুঝেছেন ওদের কথার প্রতিবাদ করলে ওই দলবল অন্য মূর্তি ধরবে। তাই বাধ্য হয়েই চলেছেন ওদের সঙ্গে।

ওদের টিলার দিকে এগোবার সরু পথের ধারে মাচাংঘর, সেখানে বন্দুকধারী পাহারা রয়েছে, নজর করতে দেখা যায় ওদিকেও

মাচাংঘর, উঁচু টং-এর উপর, এগুলো ওদের সেন্ট্রি ঘর-এর মত। সবগুলোতেই বন্দুকধারী পাহারাদার রয়েছে।

আর টিলাটা বেশ বড়, এদিক ওদিকে দশপনেরোটা বড় বড় হলঘর মত, তাতে লোকজন সৈন্যরা থাকে। একটা কাঁঠাল গাছের নীচে মোষ কাটা হচ্ছে। কলাপাতায় রাখা হচ্ছে গাদা গাদা মাংস।

মোষের মাংস ওদের প্রিয় খাদ্য। অনুমান হাজার দুয়েক লোককে দেখা যায় এদিক ওদিকে। তারা নানা কাজে ব্যস্ত।

দীনেশবাবুদের একটা ঘরের সামনে নিয়ে গিয়ে তল্লাসী করা হল কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা। ওদের চাল-ডালের ঝুড়ি, সঙ্গের থলিগুলোও দেখা হ'ল।

ওরা সকলেই রুদ্রাক্ষ পরে আছে। রতনমণির দীক্ষিতদের রুদ্রাক্ষ ধারণ করতে হয়। দীনেশবাবুর হাতে একটা রুদ্রাক্ষ দেখে একটু অবাক হয় তারা। ওদের বসিয়ে রেখে নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা শুরু করে ওরা।

বেলা বেড়ে উঠেছে। ভয়ে চিন্তায় দীনেশবাবুও একটু ঘাবড়ে গেছেন। বেশ বুঝেছেন এখান থেকে ফেরাটা আর তাদের হাতে নেই। একজন এসে জানায়—গুরুদেব রতনমণি আছেন তুইছারবুহা ক্যাম্পে। হুকুম এসেছে আপনাদের সেখানেই পাঠাতে হবে।

...এই অল্প সময়ের মধ্যে কি ভাবে যোগাযোগ হয়েছে বোঝা যায় না। কিন্তু বুঝেছেন দীনেশবাবু, এদের হাতে আপাততঃ তারা বন্দী হয়েই পড়েছেন।

...বনজঙ্গলের দীর্ঘ পথ। এখান থেকে তুইছারবুহা আন্দাজ বারোমাইল দূরে। ঘনবনের মধ্য দিয়ে ওরা এ ক্যাম্প থেকে প্রধান ক্যাম্পে যাবার জন্য নিজেরাই কোদাল টাঙ্গানা দিয়ে পথ বানিয়েছে। অবশ্য ছোট পাহাড়ী নদীগুলোর উপর সাঁকো নেই। ওদের ওই পথ দিয়ে নিয়ে চলেছে।

সঙ্গের পাহারাদারদের একজন কোত্থেকে পেঁপে আনারস এনেছে। পথের ধারে বসে ওই লোকটা দীনেশবাবুদের আনারস পেঁপে ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে কলাপাতায় এনে বলে—খেয়ে নিন বাবু।

দীনেশবাবুরা পরিশ্রান্ত। দুদিন ধরে হাঁটছেন, তার চেয়ে বেশী বিচলিত হয়েছেন নানা ভাবনায়। লোকটা বলে—তুইছারবুহা ক্যাম্পে গিয়ে কারোর সঙ্গে কথা বলার সময় 'জয়গুরু' বলে নমস্কার জানাবেন বাবু, প্রথমে আপনাদের মন্ত্রীদের কাছে নিয়ে যাবে ওরা।

দীনেশবাবুর শোনা কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। তিনি শুধান,

—ক'জন মন্ত্রী আছেন তোমাদের?

লোকটা বলে—পাঁচজন। ওদের কিছু নজরাণা দেবেন। এইটা রেওয়াজ। তারপর হয়তো গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তিনিই বিচার করবেন।

বিচারে কি হবে তা অনুমান করে নেন দীনেশবাবু।

তাই বলেন—বিচার আর কি হবে? প্রাণটাই যাবে।

লোকটা বলে ওঠে—গুরুদেব মানুষ নন বাবু, দেবতা। সব বুঝতে পারেন। ওর ভাই চিন্তামণিও থাকবেন। খুব ভালো লোক। মন্ত্রীদের মধ্যেও লেখাপড়া জানা লোক আছেন। তছলস্ফা ও খুব ভালো লোক।

পাহারাদার আশ্বাসের সুরে বলে,

—অবিচার হবে না বাবু। গুরুদেব অন্যায় পথে যান না।

সর্দার তাড়া দেয়—হল তোমাদের? চলো—দেরী হয়ে যাচ্ছে।

তুইছারবুহার দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। মাঝে মাঝে টং ঘর। ক্ষেতের এদিক ওদিকে মাচা বাঁধা যেন ফসল পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আসলে ওরা পাহারাদার স্বদেশী সৈন্য। দলের লোকদের সঙ্কেত পেয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

বেলা তখন দুপুর। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত লোকগুলোকে নিয়ে ওরা ওদের হেড কোয়ার্টারের এলাকায় ঢুকলো। সেখানে টিলার নীচেই

দাঁড়াতে হল তাদের। ওল্লাসীর পালা চুকলে তবে ঢোকার অনুমতি মিলবে।

খবরটা হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ে। তুইনানী ছাড়িয়ে বগাফা অমরপুর থেকে ওদিকে বিলোনীয়া মায় উদয়পুর অবধি গ্রাম-গঞ্জে রটে যায় রতনমণির স্বদেশীদল এবার মহারাজার খাস দারোগা কনেষ্টবলদেরও বন্দী করে তুলে নিয়ে গেছে।

হাটে কেনা বেচা বন্ধ রেখে এই আলোচনাই চলে। ব্রহ্মছড়া বসতির রাজপ্রসাদ চৌধুরী, কুমারিয়া ওঝাকেও বন্দী করে নিয়ে গেছে তারা তুইছারবুহা ক্যাম্পে। রতনমণির সামনে ওদের বলি দেওয়া হবে।

রাধাকিশোরপুরের হাটে সকলেই সন্ত্রস্ত।

ঝড়োকাকের মত গঙ্গারাম রিয়াং আর কয়েকজন জামাতিয়া সেই সন্ধ্যায় প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এতখানি পথ বনপর্বত পার হয়ে ওরা এসে পড়েছে রাধাকিশোরপুরে।

কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী খবরটা শুনে চমকে ওঠেন।

—ওরা রাজপ্রসাদকে ধরে নিয়ে গেছে?

গঙ্গারাম রিয়াং জানায়—এইবার সারা এলাকায় ওদের ফৌজ তাদের রাজ্য কায়েম করবে। আর আপনাদের ও বেঁধে নিয়ে গিয়ে ওই রতনমণির সামনে বলি দেবে।

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে যায়। শুধু তাদের বাড়িতেই নয়। বিজয় চৌধুরীও এসে পড়ে। গ্রাম বসতের লোকজনের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

গাঁওবুড়ো বলে—এখান থেকে আপাততঃ চলে যান চৌধুরীবাবু। আপনাদের ওরা নিশ্চয়ই এখানে খুঁজতে আসবে। তারপর কাউকে বাদ দেবে না। সবাইকে ওরা শ্যাষ কইরা যাবে নি।

গঙ্গারামও বলে—এ জায়গাটা নিরাপদ নয় চৌধুরীমশায়। তার চেয়ে উদয়পুর নাহয় আগরতলার বাড়িতেই চলে যান। তারপর

এদিকটা শান্ত হলে ফিরবেন। খগেনবাবুও বগাফা থেকে ছেলে-মেয়েদের সব বিলোনিয়া টাউনে রেখেছেন।

কথাটা ভাবছেন কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী। চারিদিকে যে অরাজকতা চলেছে তার প্রতিকার চাইবেন এবার মহারাজের কাছেই।

তিনি বলেন—তাই ভাবছি গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম কোন মতে ভয়ে ভয়ে রাতটা কাটালো এখানে। ওর মনে হয় যে কোন মুহূর্তে ওই ডাকাতের দল হানা দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। আর প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে না তাকে। রাতটা পার হতে সে উদয়পুরের পথ ধরে প্রাণপণ বেগে চলতে থাকে। তখন রাজার লোককে বন্দী করে বলিদান দেবার খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে।

বড়বাবু প্রথম থেকে ভাবেনি যে এমনি একটা কাণ্ড বাধবে। দীনেশবাবুদের ফেরার কথা ছিল কাল দুপুর নাগাদ, তারা ফেরেনি। একটা দিন গত হয়ে গেছে, তবু দেখা নেই। আর খবর এসেছে রতনমণির লোকজন তাদের বন্দী করে তুলে নিয়ে গেছে তুইনানী থেকে তুইছারবুহার ক্যাম্পে, তাদের বলি দেবে রতনমণির সামনে।

উদয়পুরের আকাশে থমথমে আতঙ্কের ভাব নেমে আসে। ওদিক থেকে গোমতী পার হয়ে দলে দলে লোকজন, গরু-বাছুর নিয়ে চলে আসছে। কারা হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে—ডাকাতদল নাকি অমরপুর দখল করে নিয়ে সারা অঞ্চলে এগিয়ে আসছে।

একজন বলে—আট দশ হাজার স্বদেশী সেনা আসছে। উদয়পুর দখল করে নেবে। এদিকে চককে চক স্বাধীন রাজ্য গড়বে। এই রাজত্ব নাকি শেষ হয়ে আসছে।

উদয়পুরের কর্তারা জরুরী মিটিং ডেকেছেন। আর কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী এর মধ্যে ওর ঘোড়সওয়ার মারফৎ মহারাজার খাস দপ্তরে আর্জি পাঠিয়েছে। খবর গেছে এ এলাকায় মুক্তাঞ্চল গড়ে তুলে ওই ডাকাতদল অমরপুর বিলোনিয়া দখল করে উদয়পুরের দিকে এগিয়ে

আসছে। অন্তত: পাঁচ হাজার লোক এই আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটও ভাবনায় পড়েছেন।

ওই শতশত শরণার্থী ভীত ত্রস্ত মানুষগুলো যেন শহরে এনেছে জমাট আতঙ্কের ভাব।

...ওরাও মহারাজের খাস দপ্তরে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছেন। রাজ্য বিপন্ন—চারিদিক থেকে তারা আক্রান্ত হতে পারে, ওরা উদয়পুরেও হানা দেবে এইবার।

আগরতলাতেও খবরগুলো এসে পৌঁছেছে। খগেন রায়কে দেশের বাড়ী ছেড়ে পালাতে হয়েছে বিলোনিয়ায়, সেখান থেকে ট্রেনে করে বাংলাদেশের আখাউড়া হয়ে আগরতলা আসা নিরাপদ। ওরা আগরতলায় এসেছে সেই ভাবে।

কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরীর পরিবারবর্গও এসেছে এখানে প্রাণভয়ে।

রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর তখন ত্রিপুরার মন্ত্রী। তার কানেও সব খবর এসেছে। আরও গোপন খবর এসে পৌঁছেছে যে ওই চৌধুরী, রায়দের কথা কিছুটা সত্যি। জাপানীদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো আছে রতনমণির, নাহলে যখন বাইরে থেকে ওরা এগিয়ে আসছে ঠিক সেই সময় এই বর্ষাকালেই রতনমণিও আক্রমণ শুরু করেছে কেন!

চারিদিক দুর্গম, এখুনিই ওরাও চরম আক্রমণ করতে চায়। তাই কালবিলম্ব না করে মহারাজ বীর বিক্রমের কাছেই সব জানিয়ে ওরা আদেশ চাইল। ওই ডাকাত বাহিনীকে শায়েস্তা করতেই হবে।

মেঘঢাকা আকাশ, সহরের মানুষগুলোর, মুখে চোখে অজানা ভয়ের ছায়া। ওই শত্রুরা হয়তো এগিয়ে আসছে। মহারাজ বীরবিক্রম ওদের ফাইলে তার মত জানিয়ে দস্তখৎ করে ছাপ দেন, 'প্রস্তাব মঞ্জুর করা যায়।'

আর এই ডাকাতের দলকে সায়েস্তা করার ভার অর্পিত হল

মেজর বি-এল দেববর্মার উপর। তিনিই মহারাজার দেহরক্ষী সৈন্য-দলের প্রধান।

সেইদিনই লেফ্‌টেন্যাণ্ট নগেন্দ্র দেববর্মাকে পাঠানো হল উদয়পুরে ওঁর সঙ্গে রইল সেকেণ্ড ত্রিপুরা জং ইন্‌ফ্যান্ট্রির একনম্বর প্ল্যাটুনের বেশি ফৌজ। তাছাড়া রইল অতিরিক্ত রাজ্য রক্ষীবাহিনীর অফিসার সর্দাররা, আর পুলিশ কর্মচারীরা। ওদের করণীয় কাজ হল সমস্ত ডাকাত দলকে শায়েস্তা করা। তাদের অধিকার দেওয়া হল প্রয়োজন বোধে তারা গুলী চালাতে পারবে। সন্দিগ্ধ ব্যক্তি বা দলের উপর গুলি চালাতে পারবে। ডাকাতদলের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করবে, আর ডাকাতদলকে না পেলে তাদের বসতি সব জ্বালিয়ে দিয়ে ওদের বাবা-মা স্ত্রী-পুত্রদেরও ধরে আনতে পারবে।

আর একদল সৈন্য পাঠানো হল উদয়পুরের দিকে, পর দিনই লেফটেন্যাণ্ট হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার নেতৃত্বে অন্য আর একটি সৈন্য বাহিনীকে পাঠানো হল বিলোনিয়ার দিকে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হল দুটি সৈন্য বাহিনী দুদিক থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ করে এগিয়ে এসে মুহুরীপুরের কাছে দুদলে মিলিত হবে। সৈন্যবাহিনী দুদিকে রওনা হয়ে গেল। ওই বনপর্বতের কিছু সংগ্রামী বিক্ষুব্ধ সর্বহারা মানুষের প্রতিবাদকে পিষে দেবার জন্য রাজকীয় বাহিনী এবার এগিয়ে চলেছে পূর্ণ উদ্যমে।

উদয়পুরের হাট সেদিন জমেনি। আকাশ ছেয়ে ঘনিয়ে এসেছে বর্ষার কালো মেঘের দল, দেবতামুড়া পাহাড়শীর্ষে ঘা খেয়ে নীচের অরণ্য টিলায় আছড়ে পড়েছে মেঘের দল। ওই বর্ষণে ধারাপ্রবাহ নেমেছে গোমতীর বুকে গেরুয়া জল-এর রূপ নিয়ে। ছাই পাংশু আকাশ কোল ছেয়ে বৃষ্টির ধারা নামে, জনহীনপ্রায় পথ। হাটে লোকজন আসেনি বিশেষ। বাতাসে জেগে আছে গোমতীর ক্রুদ্ধ গর্জন।

ওই বাতাসের হাহাকার ছাপিয়ে শোনা যায় দীনেশবাবু, শরৎ

দাস বিধু মজুমদারদের বাসার থেকে চাপা কান্নার শব্দ। লোকগুলো আর ফেরেনি তদন্ত সেরে। কে জানে তারা বেঁচে আছে কি নেই।

বড়বাবু চুপসে গেছেন।

চৌধুরীদের অনেকেই উদয়পুর থেকে আগরতলা সদরে চলে গেছে, খগেনবাবু আশ্রয় নিয়েছে বিলোনিয়া সহরে। পাশেই বাংলামুলুক, ইংরেজের রাজ্য। সেখানটা নিরাপদ। সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে, মিহিরবাবু এবার ভাবনায় পড়েছে।

গিন্নীর ডাক শুনে চাইল।

থানাতেও যেতে ভরসা হয় না, কে জানে ওই স্বদেশীদলের লোকজন নাকি সহরেও এসে গেছে। তারা আগে একে একে এসে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করছে।

ওদের কেউ তাকেও হয়তো তুলেই নিয়ে যেতে পারে। তাই হঠাৎ ওই ডাকটা শুনে আঁৎকে ওঠে মিহিরবাবু। ওর স্ত্রী সেই পেটের অসুখের ব্যাপারটা থেকেই চিনেছে মানুষটাকে। একনম্বর ভীতু, শুধু ভীতুই নয় নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অপরকেও বিপদে ফেলতে পারে অনায়াসেই ওই মিহিরবাবু।

তাই বলে ওঠে ভদ্রমহিলা মিহিরবাবুকে।

—ওদের খবর পেলে? লোকগুলোকে ডাকাতের খপ্পরে পাঠিয়ে নিজে তো অসুখের ছল করে পড়ে রইলে, এখন খবর নাও! বাড়ির মেয়ে বৌ-গুলো যে কেঁদে মলো। বড়বাবু জ্বলে ওঠে—আমি গেলে খুব খুশী হতে, না? গিন্নী ওর দিকে চেয়ে থাকে। বলে ওঠে সে।

—সে পরের কথা। এখন কিছু তো করা দরকার।

হঠাৎ একজন কনেষ্টবল ওই বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে জানায়—সদর থেকে মিলিটারী এসে গেছে স্যার।

মিলিটারীর নাম শুনেই মিহিরবাবুর চুপসে যাওয়া মূর্তিটা এবার বেলুনের মত ফুলে ওঠে। ও বলে স্ত্রীকে।

—দেখলে তো, মিহির গাঙ্গুলী বসে থাকার লোক নয়, এমন

জরুরী মেসেজ পাঠিয়েছি যে খোদ মিলিটারী এসে হাজির। এবার দেখ ব্যাপারটা। যাই প্ল্যানট্যানগুলো করতে হবে।

বড়বাবু এরমধ্যে খাঁকি প্যান্ট সার্ট পরে হাতিয়ারবন্দ হয়ে চড়া মেজাজে বের হয়ে গেল। দূর থেকেই লেফ্টেন্যান্ট সাহেবকে দেখে ওই জলকাদার মধ্যে দুপা ঠুকে মিহিরবাবু মিলিটারী কায়দায় স্যালুট জানায়, আর অনভ্যস্ত পায়ের চট্কানিতে কাদাজল চলকে উঠে তার ধোপদুরস্ত পোষাকে মায় গোলমত মুখখানাও কাদায় বিকৃত করে তোলে। তবু দমে না বড়বাবু।

এগিয়ে যায়। লেফ্টেন্যান্ট নগেন্দ্র দেববর্মা দেখছেন ওকে।

উদয়পুর একমুঠো জায়গা। একদিকে ওই গোমতীর খাদ, ওর বুক ছাপিয়ে বয়ে চলেছে জলপ্রবাহ, অন্যদিকে কয়েকটা বড় বড় দিঘী, মধ্যে কয়েকটা টিলাকে কেন্দ্র করে সহর।

কিন্তু বিস্তীর্ণ অরণ্য পর্বত এলাকায় ওই স্বদেশী দলের প্রতাপ, আর ওদের ঘাঁটিগুলো দুর্গম হয়ে উঠেছে বর্ষার জন্যে। ছোট্ট ছড়াগুলোও এখন দুর্গম। বনপাহাড়ের বুকে পায়ে চলা পথগুলো ধুয়ে মুছে গেছে, পথ ঢেকে গেছে আগাছায়।

...রতনমণির দলও খবর পাচ্ছে।

তাদের তুইনানী, তুইছারবুহা, হাজাছড়া, বগাফা ক্যাম্প থেকে সাংকেতিক খবর যাচ্ছে। আর তারাও বুঝেছে এবার তাদের চুপ করে থাকা চলবে না।

তারাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে এক একদিকে বের হচ্ছে, চারিদিকে তাদের আক্রমণের খবর ছড়িয়ে পড়ে, যাতে উদয়পুরেও পৌঁছে সে খবর।

তৈন্দুল এবার করণীয় কাজ পেয়েছে।

তৈন্দুল সেদিন বলে ওঠে—উদয়পুরেই একবার যাব সর্দার? একটা ঘা মেরে আসি।

শক্তি রায় ওর দিকে চাইল। খাস উদয়পুরে এসময় যদি কিছু করে আসা যায় তাতে ওই সৈন্যরাও ভয় পাবে, হয়তো কাজ হবে তাতে। কিন্তু কঠিন কাজ।

তাই শক্তি রায় বলে ওঠে—বিপদ যে অনেক তাতে।

তৈন্দুলও ভেবেছে কথাটা। উদয়পুরের খবর কিছুটা জানে। আর কালিপ্রসাদের সেই অত্যাচারের জবাবও দিতে পারে নি।

ওদের পালিয়ে আসতে হয়েছিল। পৈরী এখনও বলে কথাটা।

এবার ওকেই একহাত দেখে আসবে। তৈন্দুল বলে।

—বিপদ তো সবখানেই সর্দার। দেখা যাক না একবার।

শক্তি রায় ভাবছে কথাটা।

সর্পজয় বলে—তা মন্দ নয়। যাক একবার।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল। রাতভোর ওরা কাল দক্ষিণমহারাণী লক্ষ্মীছড়া অমরপুরের ওদিকে হানা দিয়ে বেশ কিছু সর্দার চৌধুরীদের বাড়ি থেকে ধান, মোষ, শূয়োর, তুলে এনেছে। কয়েকজন রিয়াং সর্দারকে জরিমানাও করেছে।

…সকালেও ফেরার পথে কূর্মা বসতির সঙ্গতিপন্ন মহাজন রামানন্দ রিয়াং, শ্রীচরণ রিয়াং-এর বাড়িতে বসে ওদের সামাজিক দস্তুর আদায় করেছে দুকুড়ি টাকা, রামানন্দ রিয়াং বাধ্য হয়েই তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। আরও লাভ হয়েছে, দুটো বন্দুক ওরা নিয়ে এসেছে ওদের বাড়ি থেকে।

…শক্তি রায়ের দলবল পালা করে এমনিভাবে ঘুরছে' আর চৌধুরীদের শাসায় তারা—কোন খবর থাকলে আমাদের লোকদের জানাবে। নাহলে প্রাণটুকুও রেখে যাবো না।

সেই সর্দার আর চৌধুরীরাই লোক মারফৎ খবরটা জানিয়েছে যে, উদয়পুরে মিলিটারী এসেছে' থানা গেড়েছে সেখানে। আর একদল সৈন্য নাকি গেছে বিলোনিয়ার দিকে। তারাও বনের এই দিকেই আসবে।

ক্যাম্পে পাহারায় ছিল গিরনি ওঝা, ওই খবর দেয় উদয়পুরের ছোট দারোগা দুজন পুলিশ সমেত ধরা পড়েছে, ওদের এখানে আনা হয়েছে। ওদের সঙ্গে রাজপ্রসাদ চৌধুরী ব্রহ্মছড়ার কুমারিয়া ওঝাকে আনা হয়েছে।

শক্তি রায় গর্জে ওঠে—ব্যাটাদের বাঁচিয়ে রেখেছিস কেন? মিলিটারী এনেছে ওর বাবারা, আর আমরা ওদের হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবো? কোথায় তারা?

শক্তি রায় যেন ওই শুভকাজটা এখুনিই সেরে ফেলতে চায়। পাহারাদার বলে—ওদের মন্ত্রীসভায় হাজির করা হচ্ছে।

শক্তি রায় শিকার ফসকে যেতে গজগজ করে—ওখানে কেন?

তবু প্রকাশ্যে কিছু প্রতিবাদ করার কানুন নেই। সে সেনাপতি মাত্র, ওসব নীতি নির্ধারণের ভার মন্ত্রীসভার উপর। তাই বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকে শক্তি রায়।

তৈন্দুস তখনও উদয়পুরের কথাটা ভাবছে। তাই বলে সে।

তাহলে আমরা ক'জন একবার ঘুরে আসি। খবরসবরও আনতে হবে। শক্তি রায় আজ ওদের সেই উদয়পুরেই হানা দিতে চায়, তাই ওদের কথা শুনে বলে—হুঁ যা। তবে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে।

ওরাও তা জানে।

শক্তি রায় বাঁশের জাফরি করা বারান্দা থেকে দেখছে ওই মন্ত্রীসভার হল ঘরের বারান্দার দিকে। ওই সদ্য আনা লোকগুলোকে নিয়ে চলেছে চিন্তামণি মন্ত্রীসভার দিকে।

শক্তি রায়-এর চাপা রাগটা ফুলে ওঠে। ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। ও দরকার হলে কঠিন ব্যবস্থাই নেবে লোকগুলোর জন্য।

মন্ত্রীসভায় নিয়ে যেতে যেতে—দীনেশবাবুকে চিন্তামণিই বলে।

—মন্ত্রীসভার সামনে কিছু নজরাণা দেবেন। ওখানে দরবার এর পর ওরা দরকার ভাবলে আপনাকে রতনমণির কাছে পাঠাবেন।

দীনেশবাবু চিন্তামণিকে চিনেছেন, রতনমণির ভাই। আর লোকটিও ভালো। এদের অনেকের তুলনায় অনেক ভদ্র। তাই দীনেশবাবু বলেন—রতনমণির সঙ্গে যাতে আজই দেখা হয় তার ব্যবস্থা করে দেন।

চিন্তামণি কথাটা ভাবছে।

…বিরাট ঘরখানা, ওদিকে বেদী মত করা তাতে গদি পাতা, পাঁচটি তাকিয়া পাঁচজন মন্ত্রীর। ওদের পরণে সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় সিল্কের পাগড়ী। পিছনের দেওয়ালে মহারাজা বীর বিক্রমের একটা ফটোতে মালা পরানো দেখে দীনেশবাবু একটু অবাক হল।

ওখানেই নজরাণা দিয়ে ওদের সামনে দাঁড়াতে হল।

ওদের একজন বলেন—আপনি এখন স্নানাহার করে বিশ্রাম করুন। পরে কথা হবে।

…কদিন ধরে ক্লান্তি আর দুঃসহ উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। তবু ওখানে খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়, বিশ্রামের জন্য ঘরও একটা মেলে দীনেশবাবুর দলের।

ছড়ার দুদিকের টিলায় সারবন্দী ছোট বড় বহু ঘর, এক সারির মুখ পূর্ব দিকে, অন্য সারির মুখ পশ্চিম দিকে। তার জন্য এদিক থেকে ওদিকের সবকিছু দেখা সম্ভব নয়। তবু একনজর ওদিকে চাইতে দেখা যায় বহু লোকের আসা-যাওয়া চলেছে। ওরা ধান, গরু, ছাগল, টাকাকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে হিসাব ঘরে, কোষাগারে। আর টিলার নীচে ছড়ার জলে ওরা দল বেঁধে স্নান পূজা সারছে।

দূরে বিরাট বিরাট কড়াই হাঁড়িতে রান্নার আয়োজন চলেছে।

…চিন্তামণি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

দীনেশবাবু ওর দিকে এগিয়ে যায়। চিন্তামণি ওই লোকগুলোর জন্য সমবেদনা বোধ করে। রতনমণির মত সে জানে। রাজার সঙ্গে তাদের দলের কোন বিরোধ নেই। এরাও তাদের কোন ক্ষতি করেনি। তাদের আক্রোশ ওই চৌধুরী আর রিয়াং সর্দারদের বিরুদ্ধে।

দীনেশবাবু ব্যাকুলভাবে শুধান—ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার কি হল?

চিন্তামণি বলে—আজ বৈকালেই দেখা হবে। লোক এসে নিয়ে যাবে। সকাল আটটা থেকে এগারোটা আর বৈকাল চারটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখা করার সময়। ওই সময় ঘণ্টা বাজবে, আর মন্ত্রীসভার ওদের বলে-কয়ে রাজী করিয়েছি যাতে দেখা হয়। এখন স্নান-আহার সেরে বিশ্রাম করুন।

…শ্রান্ত দেহ ছেয়ে ঘুম নামে দীনেশবাবুদের। তবু ঘণ্টা শোনার জন্য যেন কান পেতে থাকে ওরা। ক'দিন হয়ে গেল বেশ বুঝেছে উদয়পুরে সকলেই ভাবছে হয়তো তারা প্রাণেই বেঁচে নেই।

তাই দীনেশবাবু ঘরে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তবু একটা কথা মনে হয়—রতনমণির সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার। লোকটিকে নোতুন করে আর একবার দেখতে চান তিনি। এটা বুঝেছেন দীনেশবাবু বিরাট এই সংগঠনের পুরোধা ওই রতনমণিই।

আজ তাই তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না করে পারেন না তিনি। ঘণ্টা বেজে ওঠে। দীনেশবাবু উঠে বসলেন।

এদিককার টিলার পথে কয়েকটা গেট, পাহারা রয়েছে। আর দীনেশবাবুকেও জবাব দিতে হয়—গুরুজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

ওর সঙ্গের পাহারাদারকেও দেখে শুনে তবে যাবার অনুমতি দেয় ভিতরে। কয়েকটা ফটক পার হয়ে একটা উঁচু বাঁশের মাচার উপর মাচাং ঘরের মধ্যে নিয়ে এল তাকে। ঘরটা বারো চৌদ্দ হাত লম্বা ও চওড়া আন্দাজ আট হাত। ওদিকে ফরাস পাতা—এদিকে চাটাই বিছানো। ঘরে ঢুকে দীনেশবাবু 'জয়গুরু' বলে নমস্কার জানাতে স্মিতহাস্তে ছোটখাটো মানুষটিও প্রতিনমস্কার জানিয়ে…বসতে বললেন।

দীনেশবাবু সঙ্কোচভরে ঘরের এদিক ওদিকে চাইলেন, দুপুরের দেখা সেই মন্ত্রীরাও রয়েছেন। ঘরের মধ্যে বাঁশের কয়েকটা তাকে

গীতা, রামায়ণ, মহাভারত আরও কিছু বই রয়েছে। ওপাশে রা কিছু আপেল, কিসমিস, খেজুর অন্যান্য ফল। কোন ভক্ত বোধহয় রেখে গেছে। রতনমণিই শুধোন—এখানে এসেছিলেন কেন?

দীনেশবাবু লোকটিকে দেখছেন। সহজ একটি মানুষ। মুখে মৃদু হাসির আভাষ, লোকটির সম্বন্ধে যে সব নিষ্ঠুরতার গল্প শুনেছিল সে সব মিথ্যা বলেই বোধ হয়। দীনেশবাবু জানান।

—সরকারের চাকরী করি সরকারের হুকুমে তদন্ত করতে এসেছিলাম তুইনানীতে। কারণ গঙ্গারাম রিয়াং নালিশ করেছে, আপনার নামে।

দীনেশবাবু একটু ভয় পেয়ে যান। মন্ত্রীদের দু'একজনের মুখে ফুটে উঠেছে কাঠিন্য। রতনমণির মুখে কিন্তু হাসির হাল্‌কা ছোঁয়াটুকু মিলোয় নি। তিনি বলেন—নালিশ করেছে আমাদের নামে? তাহলে ওদের নালিশটা শোনান।

দীনেশবাবু প্রকম্প স্বরে দরখাস্তখানা পড়ে যান। সারা ঘরে থমথমে ভাব ফুটে ওঠে। দীনেশবাবু দরখাস্তখানা পড়া শেষ করে চাইলেন রতনমণির দিকে। সকলেই নির্বাক কিন্তু ওদের চাহনিতে যে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে এটা বেশ বোঝা যায়।

রতনমণি বলেন—আমার নামে এই অভিযোগের কারণ আমি জানি। ওদের এতকালের অত্যাচার, শোষণে আমি বাধা দিয়েছি। আদিবাসীদের অধিকাংশই গরীব, নিরীহ প্রকৃতির। ধর্ম-ঈশ্বর এসবের জ্ঞানও সীমিত, নেই বললেই হয়। তাদের মধ্যে সেই ধর্মচেতনা, মানবিক বোধটা আমি জাগাতে চেয়েছি মাত্র। এ নিয়ে কাজ করে চলেছি, তাই ওদের রাগ।

ওই সর্দার-রায়রা-চৌধুরীর দল জরিমানা করে গরীবদের কাছ থেকে আদায় করেছে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা, তার একটি কপর্দকও তারা এদের ভালোর জন্য খরচা না করে সবটা আত্মসাৎ করেছে। তা করার অধিকার তাদের নেই।

গরীবকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় ধর্ম, আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি। তাই আমার লোকজন শিষ্যদেরও জানাই—তারা যেন ভুল করে কোনও নিরীহ-গরীব-সৎ-মানুষের উপর অত্যাচার না করেন।

মহারাজার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই, তিনি এই অত্যাচারীদের হাত থেকে যদি না বাঁচাতে পারেন, বাঁচার পথ বাধ্য হয়ে আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে। সত্যবদ্ধ রিয়াং প্রজারা রাজার বিদ্রোহী হবে না কোন দিন। এটা সদরেও জানাবেন।

দীনেশবাবু ওর কথাগুলো শুনছেন। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

দীনেশবাবু মুক্তি পেতে চান। তাই বিনীত ভাবে বলেন।

—তাহলে আমরা এখন যেতে পারি এখান থেকে ?

রতনমণি বলেন—রাত্রি হয়ে আসছে। কালই যাবেন।

চিন্তামণি এগিয়ে আসে। রতনমণি বলেন—এদের কোন অসুবিধা না হয় দেখবে।

দীনেশবাবু প্রণাম করে উঠছেন, রতনমণি ওদিকে রাখা ফলগুলো থেকে কিছু আপেল, কিসমিস দীনেশবাবুর হাতে দিয়ে বলেন—বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাবেন এগুলো।

দীনেশবাবু অবাক হয়ে ওই বিচিত্র মানুষটির দিকে চেয়ে থাকেন। ওর হৃদয় ভরা ভালোবাসা, তাই হতদরিদ্র আদিবাসীদের জন্য মমতায় তার মন কেঁদে উঠেছে, সর্বত্যাগী সাধু এদের পাশে দাঁড়িয়েছেন পথ নির্দেশের ব্রত নিয়ে। সেখানে কোন ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই।

তছলক্ষা, চিন্তামণিও বের হয়ে এল ওদের সঙ্গে। সেই আগেকার ঘরটা থেকে ছড়ার পূর্ব পাড়ে অপর টিলার একটি ঘরে ওদের স্থান হোল।

এর মধ্যে জামাতিয়ারা তুইনানী বসতি থেকে দীনেশবাবুদের বিছানাপত্র নিয়ে এসে গেছে। দীনেশবাবুর নোয়াতি কুলিরা এর মধ্যে রান্নার আয়োজন করেছে। সব জিনিষপত্রও দিয়ে গেছে ক্যাম্প-এর

ভাঁড়ার থেকে। আর জলখাবারের জন্য এসেছে টাট্‌কা পেঁপে, কলা চিঁড়ে, গুড়।

নোয়াতিয়া কুলিটা এর মধ্যে কয়েকজন ক্যাম্পবাসীর সঙ্গে গাঁজার আড্ডায় বসে গেছে। হাতে হাতে কল্কে ফিরছে। অন্ধকারে ওদের গাঁজার কল্কের লালচে আভা দেখা যায়।

ওদের আসতে দেখে সরে গেল তারা। নোয়াতিয়া কুলিটাও এসে ভাতের হাঁড়িতে হাতা ডুবিয়ে কাজের ভান করে।

…চিন্তামণি বলে—রাতে বের হবেন না ঘরের বাইরে। কোথাও যাবার চেষ্টা করবেন না। পাহারাদার রয়েছে ক্যাম্পের চারিদিকে, ওরা গুলি করতে পারে।

রাতে খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করুন। কাল যাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। জয়গুরু।

---জয়গুরু, দীনেশবাবু ওর সম্ভাষণের উত্তর দেন ওদেরই মন্ত্র দিয়ে।

রাত্রি নেমেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়েছেন দীনেশবাবু। কিন্তু ঘুম আসে না।

অন্ধকারের বুক চিরে ফিকে জ্যোৎস্নার আলো উঠেছে শাল বাঁশ বনে। বর্ষার মেঘগুলো ভেসে ভেসে ফিরছে। কখনও চাঁদের আলোটুকু ঢেকে যায় আবার জেগে ওঠে।

ওই আবছা আলোয় দেখা যায় ক্যাম্প থেকে দলে দলে লোকজন রামদা, খড়্গ, বল্লম কেউ বা বন্দুক নিয়ে বের হচ্ছে। ওই রহস্যান্ধকারে লোকগুলোকে বীভৎস দেখায়।

—কোথায় চলেছে ওরা? শরৎ দাস ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে।

দীনেশবাবুরা ওদের কর্মব্যস্ততা আর দলবদ্ধ অভিযান দেখে মনে ভাবে ওরা কোথাও আক্রমণ করার জন্যই চলেছে। ওদের ব্যবস্থা—প্রস্তুতি সবই যেন নিখুঁত। দুটো ক্যাম্পেই বোধহয় চার পাঁচ হাজার লোককে দেখেছেন তাঁরা।

বিধু মজুমদার বলে—ওরা নাকি অমরপুর দখল করে এবার উদয়পুরের দিকে চলেছে। এরা যাচ্ছে তাদের দলে যোগ দিতে।

নোয়াতিয়া কুলিটাও তখন থেকেই গুম হয়ে গেছে। ওকে রতনমণির দলের কয়েকজন প্রথমে ধরে আনার সময় ছুচার ঘা দিয়েছিল, এখনও কপালটা ফুলে আছে। লোকটা বলে ফিস্‌ফিসিয়ে—গতিক সুবিধের নয় ছোটবাবু। ওই লোকগুলোর মুখে শুনছিলাম ওরা আমাদের ফিরে যেতে দেবে না, আমরা নাকি ওদের অনেককিছু দেখে ফেলেছি। তাই আমাদের শ্যাষ করে দিবে।

চমকে ওঠেন দীনেশবাবু। রাতের অন্ধকারে দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসে। আরণ্যক পরিবেশে কোথায় তীক্ষ্ণ স্বরে শিঙা বেজে ওঠে। মুখর হয়ে উঠেছে আদিম অরণ্য পর্বত।

তাই মনে হয় এদের কথা হয়তো সত্যিই হতে পারে। ওদের ব্যবহার বিচিত্র ঠেকে। হয়তো আর ফিরে যেতে দেবে না এখান থেকে! এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে, মেঘে পাহাড় ঢেকে গেছে।

কি এক অজানা ভয়ে মানুষগুলো কাঠ হয়ে গেছে এই বনরাজ্যের বন্দীশালায়। অন্ধকারে কাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসে। এই দিকেই আসছে ওই শব্দগুলো, যেন ঘাতকের দল বোধহয় ওদের এবার শেষ করে দিয়ে প্রাণহীন দেহগুলো অরণ্যে কোথায় ফেলে দেবে। দীনেশবাবু কান পেতে ওই শব্দটা শোনেন।

কালিপ্রসাদও খবরটা পেয়ে কোতোয়ালীর মাঠে এসেছে। উদয়পুর ব্যারাকে খাঁকি পোষাকপরা মিলিটারী, ওদিকে সেন্‌ট্রি পাহারা দিচ্ছে। আর বড়বাবুকে দেখে এগিয়ে যায়। বড়বাবু এখন কর্মব্যস্ত। কালিপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হয়ে বলে।

—তাহলে এবার ব্যাটাদের টিট করা হচ্ছে বড়বাবু?

বড়বাবু বলেন—হুকুম আছে তিন দিনের মধ্যে সব গোলমাল

থামিয়ে দিতে হবে। সবকটাকে মায় রতনমণিকেও এবার ধরে সদরে চালান দোব।

কালিপ্রসাদ খুশী মনে ফিরছে। বর্ষার দিন, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে। কালিপ্রসাদ আজ তাই মাংস নিয়ে ফিরছে চাষ বাড়িতে। সাথে রয়েছে মৈতুল। লোকটা কোত্থেকে তাজা মদ যোগাড় করে এনেছে।

…কিছুদিন ধরে তারা ভয়ে গুম হয়ে গেছল, আজ আবার ভরসা পেয়েছে। জানে শহরে মিলিটারী রয়েছে এবার ওই রতনমণির দল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাই ওরা দুজনে আজ রাতে যুৎ করে বসেছে মদ আর মাংস নিয়ে। মনে হয় আবার খগেনবাবুরা এখানে ফিরে আসবে। চৌধুরীরাও জাঁকিয়ে বসবে এখানে, আগরতলা থেকে এসে। তাদের রাজ্যপাট আবার বহাল হবে।

মৈতুল বলে—এবার ঠাণ্ডা হলে বসতি থেকে নয়ন্তীকে টেনে আনবো। কালিপ্রসাদের বুকটাও খাঁ খাঁ করে। তাই বলে—সেই বৈরীটাকেও আনতে হবে। পথে বসিয়ে চলে গেল। আর সেই নিতাইটাকে কেটে ফেলবো। কালিপ্রসাদের ঘর থেকে মেয়েছেলে নিয়ে পালানো ঘুচিয়ে দোব।

…ওরা মনে মনে এবার প্রতিশোধের স্বপ্ন দেখে।

রাত হয়েছে। অরণ্য পথে চলেছে তৈন্দুল, নিতাই-এর দল। ধারে কাছে বসতির কোন লোকজনের দেখা নেই। ওরা চলেছে।

সামনে উদয়পুরের শহর এলাকা। পার ঘাটের মাঝির দেখা নেই। নৌকাটা অবশ্য বাঁধা রয়েছে। ওরা অন্ধকার রাতে ওই ঘাটেই পার হয়ে এগিয়ে আসে।

ঘাটের মাঝিটা তাদের দেখে এগিয়ে আসে। চেনা লোক নিতাই-এর, গুনাই রিয়াং চাপাস্বরে বলে ওঠে—জয়গুরু।

জয়গুরু! নিতাই এগিয়ে এল। ঝিম ঝিম বৃষ্টির তেজ বেড়ে

উঠেছে। ওরা তার চালায় একটু দাঁড়িয়ে বন্দুকের গুলি কটাকে একটু ভাল করে সামলে নিল, যাতে বৃষ্টির জল না লাগে।

ঘাটের মাঝি গুণাই রিয়াং বলে—তাহলে এসেছে নিতাই?

—এবার দলবল নিয়ে আসবো। মিলিটারীরা কোথায়?

তৈন্দুল শুধোল তাকে। গুনাই ফৌজী টিলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দু'একটা টিমটিম করে জ্বলা বাতি দেখিয়ে বলে।

—ওইখানে। শুনছি দু'একদিনের মধ্যেই ওরা বনে ঢুকবে। প্রায় পঞ্চাশজন বন্দুকধারী সৈন্য আর পুলিশের লোকও আছে তাদের সঙ্গে।

…ওরা শুনছে খবরটা।

—আমিই ওদের নাকের সামনে তাই একটা কাণ্ড ঘটিয়ে দেব। তারা জানবে যে ওই স্বদেশী দলও তাদের পরোয়া করে না।

তৈন্দুল বলে—কালিপ্রসাদ চাষ বাড়িতে আছে?

গুনাই একটু আগেই সেখান থেকে ফিরেছে। দেখেছে তাদের মদের আড্ডা, তাই বলে—এতক্ষণ বোধহয় মাতাল হয়ে গেছে লোকগুলো। মৈতুল ও রয়েছে।

তৈন্দুল আর নিতাই কি ভাবছে। ওই দুটোকেই আজ শিক্ষা দিয়ে যাবে। তারা চুপিসাড়ে অন্ধকারে এগিয়ে চললো।

মৈতুল স্বপ্ন দেখছে, পুলিশ মিলিটারীর দাপটে পাহাড় বনে শান্তি নেমেছে। সে আবার ফিরে গেছে তাদের টিলার জুমে. সে আর নয়ন্তী বনের দিকে চলেছে, নয়ন্তীর গানের সুর ভেসে উঠে। আর তৈন্দুল নেই। তাকে শেষ করেছে পুলিশ।

…হঠাৎ সামনে কাকে দেখে মৈতুল চোখ মেলে চাইল। ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না—তুই! তৈন্দুল!

তৈন্দুল ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওই মৈতুলের উপর বনের বাঘের মত। তার চুলের মুঠি ধরে দুইবার ঝাঁকুনি দিতেই মৈতুলের নেশা ছুটে

যায়। ওদিকে কালিপ্রসাদকে লাথি মেরে দেওয়ালে দাঁড় করিয়েছে নিতাই। কালিপ্রসাদ চিনতে পেরেছে তাদের। রতনমণির দল তাহলে শহর আক্রমণ করেছে।

তোরা! কালিপ্রসাদ বিড় বিড় করে—আমি কিছু করিনি?

—করিসনি? গরীবের রক্ত শুষেছিস। বেইজ্জৎ করেছিস তাদের মা বোনদের। একটা প্রচণ্ড ঘুঁসিতে ছিটকে পড়ে কালিপ্রসাদ। মৈতুলকেও এবার তৈন্দুল সযুত করেছে, গজরাচ্ছে তৈন্দুল।

তোরা বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। বড় লোকের পা চাটা কুকুর। আজ সেই শয়তানগুলোর সঙ্গে তোদেরও ঝাড়ে বংশে শেষ করে যাবো।

রাতের অন্ধকারে তারা দুটো বেইমানকে সযুত করে বের হয়ে এল। তখনও আকাশে বৃষ্টির ধারাস্নান চলেছে। ঝড়ো হাওয়ার দাপটে কাঁপছে গাছ-গাছালি।

অন্ধকার নদাতে তুফান বইছে, ওরা সাবধানে টিলার নীচে নৌকাটা এনে দাঁড় করিয়েছে। নদীর গর্জন উঠে, ছায়ামূর্তির দল এগিয়ে চলে টিলার গা বেয়ে।

হঠাৎ দূরে দুজন পাহারাদারকে দেখে গাছের আড়ালে দাঁড়াল। অন্ধকারে পাহারাদার দুজন বুঝতে পারে না, কিন্তু তারা দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ পিছন থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নিতাই ও তৈন্দুল তাদের উপর। নিমেষের মধ্যে তাদের গলা টিপে ধরেছে। ছটফট করছে লোক দুটো। কিন্তু তৈন্দুল আর নিতাই এর কঠিন হাতের চাপে ওদের দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ছিটকে পড়ে প্রাণহীন দেহগুলো।

ওরা বন্দুক গুলির বেল্টটা খুলে নিয়ে কোট টুপি দুটোও নেয়। কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু মত্ত হাওয়ার শব্দ উঠে। তাতে মিশেছে গোমতীর গর্জন। ওরা মালপত্র নিয়ে চুপিসাড়ে ফিরে এল।

গুনাই রিয়াং নৌকার কাছি ধরে বসেছিল। ওদের উঠতে দেখে

। ছেড়ে দেয়। স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত নৌকাটা ঐ তুফানে ভেসে চলেছে ওপারের দিকে। সেখানে আদিম আরণ্যক অন্ধকারের অতলে ওরা হারিয়ে যাবে।

…ভোর হবার আগেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। খাস ফৌজী দপ্তরেই হানা দিয়ে দুজন গার্ডকে খুন করে গুলি বন্দুক নিয়ে সরে পড়েছে স্বদেশীরা।

লেফটেনান্ট দেববর্মা রাগে ফেটে পড়েন, তাঁর অধস্তন হাবিলদারকেই শাসান—তোমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে। কেন চেকআপ করোনি কাল রাত্রে। ঘুমিয়ে কাটাতে এসেছো এখানে?

বড়বাবু খবরটা পেয়ে চমকে উঠেছেন। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসার কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন তিনিও। খাস মিলিটারীর গায়ে হাত তুলেছে। খবর আসে নদীর ধারে চাষ বাড়িতে কালিপ্রসাদ আর মৈতুলকে আধমরা করে ফেলে রেখে গেছে ওই রতনমণির দলের লোকজন।

ওদের রক্তাক্ত অর্দ্ধঅচেতন দেহগুলো তুলে এনেছে হাসপাতালে। চীৎকার করছে মৈতুল ভাষাহীন অব্যক্ত আর্তনাদ। কালিপ্রসাদকে চেনা যায় না, প্রাণে মারেনি। তবে মুখের চেহারাটাই বদলে যাবে যদি সুস্থ হয়ে ওঠে।

সারা শহরে সাড়া পড়ে যায়। ভীতত্রস্ত লোকজন চমকে উঠেছে। কেউ কেউ বলে মিলিটারী দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল কিনা, তাই এবার ওরাও নমুনা দেখিয়ে গেছে।

হাটের পশারীরা বলে—বনে বনে হাজার হাজার মানুষ বন্দুক নিয়ে জমায়েত হচ্ছে বাবু, মনে লয় এবার শহরের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

…বড়বাবু ঘাটের মাঝি—নৌকার খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন গুনাই যথারীতি ছ্যাং গিলে বেঁহুস হয়ে পড়ে আছে, আর

নৌকাটা অনেক নীচে ওদিকের টিলার গায়ে একটা গাছের সঙ্গে জড়ানো।

তাকেই তুলে নিয়ে এল থানায়।

…এমন সময় নীরবতা ভঙ্গ করে ওদিকের বনে যেন কলরব ওঠে। গোমতী এখানে খরস্রোতা। ওদিকের অরণ্য অঞ্চলেই ছিল মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের আমলের রাজধানী, তাঁর আরাধ্যদেবী ভুবনেশ্বরীর মন্দির। এখন সেই বিরাট প্রাসাদ ভগ্নস্তূপে পরিণত, ভুবনেশ্বরী মন্দির জরাজীর্ণ—ওখানে ঘন দুর্ভেদ্য অরণ্য!

কে বলে ওঠে—ওই বনেই ওরা থানা গাড়ছে। ছাখো না আর রাত কাবার হইব না, শহরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়বো।

হঠাৎ কলরব শুনে চাইল। লোকজন দৌড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। কলরব ওঠে—স্বদেশীদল আইয়া গেছে গিয়া!

—কিন্তু তা নয় পুলিশ মিলিটারীই ঝাঁপিয়ে পড়েছে শহরের মানুষের উপরে। আজ তাদের মনে হয় এখানেই ওই স্বদেশীদলের চর অনুচর ঘাঁটি সবই আছে। তাই এখান থেকেই তারা বিদ্রোহী-দের সব ঘাঁটি চূর্ণ করে দেবে।

হুঙ্কার ছাড়ে—হাত উঠিয়ে দাঁড়াও। থানায় যেতে হবে সবাইকে।

শহর সেঁধিয়ে ওরা এবার সাধারণ মানুষকে তুলে আনছে। থানা চত্বর ভরে গেছে ভীত ত্রস্ত মানুষের ভিড়ে।

লেফটেন্যাণ্ট দেববর্মাও একটু ঘাবড়ে গেছেন, মুখে অবশ্য সেটা প্রকাশ করেন না। আর হাবিলদার সাধারণ সিপাহীরাও প্রথম চোটেই কোম্পানীর দুজন যুবককে ক্যাম্পের মধ্যে এভাবে খুন হতে দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে। চারিদিকে দুর্গম অরণ্য, আর বর্ষাকাল। পথঘাট নেই, তাদের কাছে ঠিক চেনাও নয়। অথচ ওই স্বদেশীদল ওই পরিবেশেই বাস করছে। তারাও নিশ্চয় ওৎ পেতে বসে আছে বনের মধ্যে, বেকায়দায় পেলে তাদের শেষ করে দেবে।

তাই ওরাও সার্চ করতে ইতস্ততঃ করে। জমাদার বলে।

—একটু দেখে শুনে খবর নিয়ে তবে সার্চ করতে নামা ঠিক হবে স্যার! লেফটেন্যান্ট দেববর্মাও কথাটা ভাবছেন। তাই প্রথম দিকেই সারা এলাকার মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করতে চান, আর যদি কেউ ধরা পড়ে তাহলে ওদের দলের কোন খবরও পাওয়া যাবে।

—চৌধুরীদের লোকজনও আর খবর দিচ্ছে না। তারা অনেকেই পালিয়ে গেছে এলাকা ছেড়ে। খগেন রায় বিলোনিয়া শহরে গিয়ে রয়েছে। তাই খবরা-খবরের সূত্রগুলোও নেই।

—অজানা পথে কোন খবর না পেয়ে এগোতে তিনিও ভয় পান। দুদিনের মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করার কথা, কিন্তু কোন খবরই নেই রাজধানীতে। বরং খবর এসেছে একজন ছোট দারোগা দুজন কনেষ্টবল ডিউটি করতে গিয়ে ওদের হাতে বন্দী হয়ে গেছে। তাদেরও কোন খবর নেই। আর চারিদিক থেকে আসছে ওই স্বদেশীদলের সক্রিয়তার খবর। মিলিটারীর কোন খবর নেই রাজধানীতে।

ওদিকে চৌধুরীরা পালিয়ে আসছে শহরের দিকে। আগরতলা। তাঁরা অনেকেই সপরিবারে চলে এসেছে প্রাণের ভয়ে। রাজার মনোনীত রিয়াংদের রায়কাঞ্চন খগেনরায় ওই বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে এসেছে।

খগেনরায় ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত শহর বিলোনিয়ায় গিয়ে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে রাজ দরবারে আবেদন করেছে। এতেই রাজ দরবারে খবরগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে। সারা অঞ্চলে ডাকাত দল এখন স্বেচ্ছাচার সুরু করেছে। তাদের সমুত করার জন্য মিলিটারী পাঠানো হয়েছে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তারা বনপর্বতের ভিতরের দিকে ওই উপদ্রুত এলাকায় যেতে পারে নি।

মহারাজা বীরবিক্রম মাণিক্য বাহাদুর সুশাসক। তিনি তার সৈন্যদলের সুবিধা অসুবিধার কথা, প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। তাই তিনি নিজেই চলেছেন উদয়পুরের দিকে।

ওই উপক্রুত অঞ্চলে তিনিই ঘুরে আসবেন।

সৈন্যদলের খবরটা পৌঁছে যায় উদয়পুরেও। লেফটেন্যান্ট দেববর্মা ও তৈরী হয়েছেন। মহারাজ নিজ দেহরক্ষী বাহিনীদের নিয়ে অমরপুরের দিকে চলেছেন।

তুইছারবুহা ক্যাম্পে দীনেশবাবুদের ঘুম ভেঙ্গেছে ভোরেই।

বৃষ্টির ধারা একটু থেমেছে। ঘন ও ছাই ছাই মেঘের দল আকাশ ছেয়ে আছে। থেকে থেকে বৃষ্টি নামছে। তবু ওই দুর্যোগের মধ্যেই বের হতে হবে তাকে। পথও অনেকখানি। পাহাড়ী নদীগুলো ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ছোট ছড়াগুলোয় বয়ে চলেছে জলস্রোত। তবু যেতে হবে তাদের। এই বন্দী অবস্থায় এদের হাতে থাকার কোন নিরাপত্তাই নেই।

তাই দীনেশবাবু সঙ্গী কনেষ্টবল দুজন আর নোয়াতিয়া কুলিটাকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। দুদিনের পথ, তবু যেতে হবে তাদের। কুমারিয়া ওঝা, রাজপ্রসাদ চৌধুরীদের ওরা ওদিকের টিলায় আটকে রেখেছে।

চিন্তামণি বলে—এখুনিই চললেন?

দীনেশবাবু বলেন—দূরের পথ। সকালেই বের হয়েছি। ‘জয়গুরু’। ওরা সম্ভাষণ জানিয়ে বের হয়ে গেল।

বনের মধ্য দিয়ে রতনমণির শিষ্যরা দল বেঁধে ফিরছে। ওদের মাথায় বহু ধানের বস্তা; গরু-মোষ-ছাগল ও আনছে। হাতে খড়গ, বল্লম-বন্দুক। রাতভোর সারা এলাকা চষে বিভিন্ন সর্দারদের বাড়ি থেকে জোর করেই নিয়ে আসছে ওসব।

দীনেশবাবুরা সরে দাঁড়ালো, ওরা পার হয়ে যায়। আবার পথে ওঠে ওরা। ভয়ে বুক কাঁপছে।

বেশ কিছুদূর আসার পর হটাৎ একটা বড় দলকে ফিরতে দেখে ওরা পথের ধারে সরে যায় না, দীনেশবাবুদের ক্রমশঃ সাহস এসেছে।

আর ওরা কিছু করবে না। তাই পথের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। রতনমণির চেলারা কলরব করে ফিরছে। পেছনে রয়েছে স্বয়ং সেনাপতি শক্তি রায়।

হঠাৎ লোকটা ওদের দেখে এগিয়ে আসে। অবাক হয়েছে সে। লোকটার চোখ মুখে ক্লান্তি ছাপিয়ে একটা জ্বালা ফুটে ওঠে। গর্জে ওঠে শক্তি রায়।

—পালাচ্ছো তোমরা আমার চোখে ধুলো দিয়ে? ধর ব্যাটাদের। দীনেশবাবুকেই ধরে ফেলে একজন লোক। সঙ্গী শরৎদাস বলে ওঠে—পালাবো কেন? তোমাদের রতনমণিই যেতে বলেছে আমাদের।

গুরুর নাম ওই ভাবে উচ্চারণ করতে দেখে একজন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওর মুখেই সপাটে আঘাত করতে শরৎদাস ছিটকে পড়ে। গজরাচ্ছে লোকটা—তোর এতবড় মুখ।

পালাবি আবার ওইভাবে কথা কইবি?

দীনেশবাবু ঘাবড়ে গেছে। শরৎদাস এর নাক মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। দীনেশবাবু বলেন—আমাদের উনি ছেড়ে দিয়েছেন।

চুপ! শক্তি রায় গর্জে ওঠে—ধরা পড়ে মিছে কথা বলছিস তোরা। এ্যাই নিয়ে চল সব কটাকে। ওরা রক্তাক্ত শরৎদাস সমেত ওদের সবাইকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে আবার ক্যাম্প-এর দিকে। দীনেশবাবু বুঝেছেন এবার আর ছাড়বে না তাদের। বিশেষ করে শক্তি রায়-এর আদিম নিষ্ঠুর হিংস্র সত্বাকে তিনিও চিনেছেন।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে ওরা। আবার এতটা পথ ওদের টেনে হিঁচড়ে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে ক্যাম্পে।

তখন দুপুর হয়ে গেছে।

সেই ঘরে এনে এদের ঠেলে পুরে দিয়ে পাহারা বন্দী করে রেখে, শক্তি রায় দীনেশবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। তখনও মন্ত্রীরা ঘরে রয়েছেন, ওদের সামনে গিয়ে শক্তি রায় শুধোলো।

—কে এদের যেতে দিয়েছে? আমার লোকদের ওরা এবার মিলিটারী দিয়ে সযুত করবে, শুনছি মহারাজ নিজে আসছেন। আর এ সময় ওদের পোষা কুত্তাগুলোকে ছেড়ে দেবে এমনি? কেউ যেতে হুকুম দিয়েছে না পালিয়ে গিয়েছিল এরা? তাহলে কুচিকুচি করে এখুনিই কেটে ফেলবো।

মন্ত্রীদের সকলেই ব্যাপারটা জানেন তাই বলেন তারা।

—গুরুদেব নিজেই ওকে যেতে দিয়েছেন। ওরই আদেশ।

শক্তি রায় চুপসে গেল। তবু চাপা রাগে গোঁ গোঁ করে। মনে হয় এখুনিই যেন ফেটে পড়বে সে। কিন্তু রতনমণির হুকুম অগ্রাহ্য করার সাহস তার নেই। তাই চুপ করে সরে গেল সে।

দীনেশবাবু ঘরে ফিরে আসছেন। চিন্তামণিও শুনেছে খবরটা। সে দীনেশবাবুকে দেখতে পেয়ে বলে।

—এসব এড়াবার জন্যই আপনাদের বেলায় যেতে বলেছিলাম।

দীনেশবাবুরা ক্লান্ত ক্ষুধার্ত। তবু বলেন তিনি।

—এখুনিই বের হবো আমরা!

...কিন্তু শক্তি রায় অন্য পথ ধরেছে। ওর দলে কিছু শিক্ষিত সৈন্য এবং কর্মীর দরকার। তাই সে ফিরে এসে বলে দীনেশবাবুকে।
—ফিরে যাবার কি দরকার। চাকুরী ওখানে করেন, আমাদের এখানেই করবেন। একশো টাকা মাইনে দেব, খাওয়া থাকা ছাড়া, আর আপনার কনেষ্টবলদের দোব পঞ্চাশ টাকা হিসেবে। বাকী সব খরচ আমাদের। তবু গরীবদের সেবাই করুন।

দীনেশবাবু অবাক হন।

তিনি জানান—বাড়ীতে সবাই ভাবছে। গুরুদেব যেতে অনুমতি দিয়েছেন আপনিও যেতে দিন আমাদের।

শক্তি রায় চুপ করে রইল। বেশ বুঝেছে ওরা তার কথায় রাজী নয়। তাই আর কিছু না বলে শক্তি রায় চলে গেল। গুরুদেব

যেতে অনুমতি দিয়েছেন, তাই মেরে ফেলতে পারে না। তবে ও যে রেগেছে সেটা বোঝা যায়।

এরাও বের হয়ে পড়েন তখুনিই।

কোথায় থাকবে জানে না, রাত কাটাবে কোথায় এই দীর্ঘ পথে তাও অজানা। তবু যেভাবে হোক এখান থেকে পালাতেই হবে। তাই দীনেশবাবুরা বের হয়ে পড়েন ক্যাম্প থেকে।

এবার ঘন বনের মধ্য দিয়ে চলেছে তারা, প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে। বেশ কিছুটা পথ এসে গেছে, হঠাৎ বিধু মজুমদার ফিসফিসিয়ে ওঠে।

ওদের কানে আসে বনের মধ্যে কাদের পায়ের শব্দ। ওরা ঘন বেতবনে ঢুকে বসে পড়ে।

কয়েকজন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে খুঁজছে তাদের, ওদের মধ্যে একজন বলে ওঠে।

—ব্যাটারা গেল কোন দিকে? শক্তি রায়ের হুকুম ওরা যেন ফিরে যেতে না পারে। সবকটাকেই শেষ করে দিতে হবে।

চমকে ওঠে দীনেশবাবুর দল।

...ওদের কে একজন বলে ওঠে—গিয়াছড়ার দিকেই গেছে বোধহয় ওই পাশের টিলা দিয়ে। এ পথে আসবে না তারা।

ওরা এদিক ওদিক দেখে ফিরে গেল। বনের গভীরে যেন একপাল হায়না নখ দাঁত বের করে শিকারের সন্ধান করছে, দেখতে পেলেই তাদের উপর লাফ দিয়ে পড়ে তাদের শেষ করে দেবে।

ভীতত্রস্ত মানুষগুলো ওই গহন বনের ভিতর দিয়ে পালাচ্ছে। ক্ষুধা তৃষ্ণায় তারা শ্রান্ত-ক্লান্ত।

কোন রকমে সন্ধ্যা নামতে তারা দক্ষিণমহারাণীর বসতিতে এসে পৌঁছলো।

দীনেশবাবুর পরিচিত একজন ওদের দেখে ঘরের মাচাং-এ নিয়ে গিয়ে বলে ওঠে—আপনারা বেঁচে আছেন?

জবাব দেবার মত অবস্থা তখন তাদের নেই। আহত শরৎদাসের

মুখ চোখ ফুলে উঠেছে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে সারা গা। দীনেশবাবু জানান—এখনও ওরা খুঁজছে আমাদের।

বিষ্ণু রিয়াং ও জানে কথাটা। একটু আগে সন্ধ্যার মুখে কিছু লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এখানে খুঁজে গেছে তাদের। তাই তারা দীনেশবাবুদের বেঁচে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়েছে।

অতিথিবৎসল জাত এরা। প্রাণ দিয়েও অতিথিকে রক্ষা করবে? তাই চুপে চুপে সাবধান হয়ে চারিদিকে নজর রেখেছে দক্ষিণমহারাণী বসতির কিছু লোক। যাতে দীনেশবাবুরা নিরাপদে থাকতে পারে।

…মহারাজা স্বয়ং এসেছেন, উদয়পুরের মানুষের মনে ফিরে এসেছে আশা আর উৎসাহ। ব্যারাকে আলো জ্বলে ওঠে। এবার তৈরী হচ্ছে সৈন্যদল। চরম আক্রমণ হানতে হবে।

ওদিকে আখাউড়া হয়ে বিলোনিয়াতেও পৌঁছে গেছে সৈন্যদল। তারাও সুরু করবে আক্রমণ। দুই দল ঢুকবে দুদিক থেকে।

মহারাজা ফিরছেন উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে। তাঁর এই অঞ্চলে আসার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। গ্রামবসতির সাধারণ মানুষও এবার যেন আশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এই অরাজকতা এই জুলুমকে তারা মাথা নীচু করে মেনে নেবে না।

বিশেষ করে রতনমণির কিছু শিষ্য নেতা সেজে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। এবার আর ধনী দরিদ্রের বিচারও করছে না তারা। অত্যাচার সুরু করেছে প্রতিটি মানুষের উপর।

রতনমণির কানেও কথাটা উঠেছে। তাঁর আদেশ না মেনে ওই দীনেশবাবুর দলকে নাকি দু' দুবার ধরে আনা হয়েছে। তাদের অপমানও করেছে, আর একজনকে ভীষণভাবে আহত করেছে শক্তি রায়ের লোকজন।

এছাড়াও ওরা বেশ কিছু গরীব মানুষের ধান-গরু-ছাগল লুট করে এনেছে, ফসল কেটে আনছে। অত্যাচারও চালাচ্ছে। রতনমণি খবরগুলো শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

তাই মন্ত্রীসভার বৈঠক ডেকেছেন, ডেকেছেন শক্তি রায়, সর্পজয়-কৃষ্ণরাম এদেরও। শান্তি-শৃঙ্খলার ভার এদের উপরে। তারাই সেটা ঠিক মত মেনে চলেনি, বরং ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।

রতনমণি বলেন—এ আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম সাধারণ মানুষের গায়ে হাত যেন না পড়ে। আজ তাই ঘটছে।

শক্তি রায়ও শুনেছে কথাগুলো।

তাইন্দা রায় জানায়—আমাদের কাজে বাধা দিলে হয়তো তেমন কিছু লোককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, জরিমানা করা হয়েছে। তা ছাড়া সাধারণ মানুষদের গায়ে হাত আমরা দিই নি।

শক্তি রায় জানে অভিযোগটা তার বিরুদ্ধেই। আর খবরটা দিয়েছে ওই চৌধুরীদের কেউ রতনমণির কাছে। সেই শক্তি রায় তাইন্দা রায়ের সমর্থন পেয়ে বলে—নিশ্চয়ই। নাহলে কোন গরীবের উপর, নির্দোষের উপর জুলুম করা হয় নাই।

রতনমণি ওদের কথাগুলো শুনছেন। লক্ষ্য করছেন ওদের কথায় একটা উত্তেজনার ভাব। তার ধারণাটা মিথ্যা নয়। ক্ষমতা হাতে পেলে মানুষ বদলে যায়। এরাও বদলাচ্ছে।

তাই তিনি এদের সাবধান করে দিতে চান। নাহলে এরা আদর্শ, নীতি সব ভুলে ক্ষমতালোভী এক একটা দানবে পরিণত হবে। আর তার আন্দোলনের সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তৈন্দুলও বসেছিল একপাশে। সে জানে অনেক বসতির গরীব চাষীদের উপর অত্যাচার হয়েছে, হচ্ছে। তাদের গোরু মোষ এরা লুট করে আনছে মিথ্যা অজুহাতে।

তৈন্দুল বলে ওঠে—কথাটা মিথ্যা নয় ঠাকুর।

শক্তি রায়ের দুচোখ দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। গর্জে ওঠে সর্পজয়। কোথায় কি হয়েছে বলতে হবে।

নয়ন্তী চমকে উঠেছে। জানে ওই সর্পজয়, শক্তি রায়ের দলকে।

আর তৈন্দুল তাদের নামে প্রকাশ্য সভায় নালিশ করেছে। ওরাও তাকে ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রীসভার সভ্যরাও বিপদে পড়েছেন। বিচার করতে হবে তাদের। এ সময় চারিদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। নিজেদের মধ্যে গোলমাল করা ঠিক হবে না।

রতনমণিও সেটা বুঝে বলেন—এসময় উত্তেজিত হয়ো না। হয়তো এতবড় ব্যাপারে কিছু ভুল হওয়া সম্ভব। তবে সাবধান হতে হবে তোমাদের।

শক্তি রায় সর্পজয়-এর দল উঠে গেল সভার শেষে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে খবর আসছে, জরুরী খবর। মহারাজার সৈন্যদল এবার এগিয়ে আসছে। আজকের সভায় ওরা যেন শক্তি রায়-এর দলবলের বিচার করতে বসেছিল।

শক্তি রায় বলে—জবাবদিহি করতে হবে আমাকে?

সর্পজয় বলে—ওই তৈন্দুল বলেছে কথাগুলো।

শক্তি রায়ও ভাবছে।

কিন্তু ভাববার সময় নেই। ওদের কাছে খবর এসেছে এবার দুদিক থেকে সৈন্যদল এগিয়ে আসছে। এতদিন ওরা বিনা বাধাতেই দলবদ্ধভাবে একে তাকে ধরে এনেছে। হাটে গিয়ে জুলুম করেছে। কিন্তু এবার ছবিটা বদলে যাচ্ছে।

সর্পজয়ও ভাবনায় পড়েছে সেই কারণে।

শক্তি রায় বলে—ওদের সৈন্যদের সব খবরই আনতে হবে। তারপর আমরাও জবাব দেব। আর খবর আনতে যাবে ওই তৈন্দুল রিয়াং। তারপর—

…শক্তি রায়-এর দলবল ওর রহস্যভরা ইঙ্গিতটা বোঝে। ওরা অনেককেই সরিয়ে দিয়েছে, দরকার হলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখার জন্য এমন বিদ্রোহীদেরও খতম করে দেবে।

নয়ন্তী চেনে ওদের।

আজ তৈন্দুল নিজেই একটা বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। তাই নয়ন্তীও ভাবনায় পড়েছে। সন্ধ্যা নেমেছে।

তৈন্দুল ওকে দেখে চাইল। নয়ন্তী জানে তারা কোথায় দুজনে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু ঘরের শান্তি তাদের নেই।

আজ চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগের অন্ধকার। ওরা সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। নয়ন্তী বলে।

—ওসব কথা কেন বলতে গেলি ঠাকুরের সামনে?

তৈন্দুল ওর দিকে চাইল। নয়ন্তীর কথায় শোনায়।

—ওই শক্তি রায়, সর্পজয়ের দল আজ গুরুদেবের কথা না মেনে নিজেরাই গায়ের জোরে নিজেদের দাপট কায়েম করতে চায়।

নয়ন্তীর ডাগর কালো চোখে ভয়ের ছায়া নেমেছে। বলে সে।

—কিন্তু ওদের চটিয়ে থাকতে পারবি এখানে?

তৈন্দুল বলে—মরতে ভয় পাই না।

নয়ন্তী ওর দিকে চেয়ে থাকে। আজ তার সারা মনে জাগে নীরব একটা আতঙ্ক। তৈন্দুল চলে গেল ওদিকে। নয়ন্তী কি ভাবছে।

হঠাৎ কাকে দেখে চাইল।

—ঠাকুর!

রতনমণি শুনেছেন ওদের কথাগুলো। জানেন তিনি ওদের সম্পর্কটা। আর মনে হয় তার এই বিদ্রোহের কাঠিন্যের মাঝেও মানুষ তাদের মনের সব আশা স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছে।

রতনমণি বলেন এত ভাবনা কিসের রে? নয়ন্তী জবাব দিল না।

ওর ডাগর চোখে তারার আলো ঝিকিমিকি তোলে।

রতনমণি বলেন—যা ঘরে যা।

নয়ন্তী চলে গেল।

রতনমণির মনে হয় অনেক ঘরই তিনি ভেঙ্গেছেন। তবু এরা স্বপ্ন দেখে শান্ত প্রকৃতির মাঝে ঘর বাঁধার। যেখানে অত্যাচার নেই, জুলুম নেই।

তিনি সেই প্রশান্তির সন্ধান দেবার জন্যই এই আন্দোলন গড়েছেন। জানেন না কবে আসবে সেই সার্থকতা।

রতনমণিও জানেন শক্তি রায়দের ব্যাপার। তাই তিনিই মনস্থির করেছেন। ওই তৈন্দুল নয়ন্তীকে এখান থেকে চলে যেতে বলবেন। ওরা তবু দূরে কোথাও শান্তিতে বসবাস করুক।

...হঠাৎ তৈন্দুলকে দেখে চাইলেন রতনমণি। ও কোথায় যাচ্ছে।

—তুমি! কোথায় চললে এ সময়?

তৈন্দুল বলে—আমি তুইনানী ক্যাম্পেই যাবো ঠাকুর।

রতনমণি ওর দিকে চাইলেন। খবর এসেছে তুইনানী ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে মহারাজার সৈন্যদল। ক্যাপ্টেন বি-এল দেববর্মার নির্দেশে লেফটেন্যান্ট নগেন্দ্র দেববর্মা এগিয়ে আসছেন ওই দিকে। আর সেখানে নিশ্চয়ই একটা সংঘাত বাধবেই। তাই রতনমণি ওকে নিজে থেকে তুইনানী ক্যাম্পে যাবার অনুমতি নিতে আসতে দেখে অবাক হন। তিনি বলেন।

—ওখানে যেতে চাইছো এসময়?

তৈন্দুল বলে—হ্যাঁ। বিপদকে এড়িয়ে থেকে বাঁচতে চাই না ঠাকুর। আর তাই ওইখানেই যেতে চাই।

রতনমণি ওর দিকে চাইলেন।

সর্পজয়ও এসব খবর শুনেও আসেনি। শক্তি রায় গেছে কোন বসতিতে দলবল নিয়ে। কিন্তু এগিয়ে এসেছে এই বিপদের সময় কঠিন শপথ নিয়ে ওই যুবকটি।

নয়ন্তীও এসে পড়ে।

মেয়েটি দেখেছে ওদের। নয়ন্তী বলে।

—আমরা ওখানেই যাবো ঠাকুর। তুমি অনুমতি দাও। দরকার হলে আমরাও লড়বো।

রতনমণি কি ভাবছেন। মনে হয় এখান থেকে ওদের যাওয়া হয়তো নিরাপদ। তবু বলেন তিনি।

—সাবধানে থেকো।

ওরা প্রণাম করে চলে গেল দুজনে।

তৈন্দুল বলে ওঠে বাইরে এসে—তুই কেন এলি?

নয়ন্তী ওর কথায় বলে—আমার খুশি।

হঠাৎ ওর ডাগর দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে শাওণধারার মত।

অবাক হয় তৈন্দুল—কাঁদছিস কেন রে?

নয়ন্তী জবাব দিল না। ওর দুচোখে জল নামে।

আজ মেয়েটা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, তাই তৈন্দুলের বুকে মাথা রেখে সে অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

বলে ওঠে নয়ন্তী।

—তোকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না তৈন্দুল। তোর সঙ্গেই যাবো।

তৈন্দুল অবাক হয়—তোর বাবা মা ঘর?

নয়ন্তী কান্নাভিজে ডাগর দুচোখ মেলে বলে।

—তুইই আমার সব। তাই তোর জন্য সব ছেড়ে এমনি আঁধারেই হারিয়ে যাবো তৈন্দুল।

তৈন্দুল-নয়ন্তী চলেছে দুজনে। তৈন্দুলের পিঠে একটা ক্যাপদার বন্দুক। কোমরে ঝোলানো টাঙ্গি। নয়ন্তী চলেছে ওর সঙ্গে। বৃষ্টি নেমেছে, এমনি দুর্যোগের রাতে এই অরণ্যপথে যেন সুরু হয়েছে ওদের অভিসার। ওদের জীবনে তবু রয়ে গেছে এতটুকু স্বপ্নের আশ্বাস।

…বৃষ্টির ঝাপটায় ওদের সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। ঘন বাঁশবনে ওঠে বাতাসের হাহাকার, অন্ধকারে টর্চ জ্বলছে। একফালি আলোয় অন্ধকার রহস্যময় হয়ে ওঠে। একদল সৈন্য চলেছে ওই রাতের আঁধারে।

লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী মার্চ করে চলেছে। ব্রহ্মছড়া পার হয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে তুইনানী ক্যাম্পের দিকে। ওদের লক্ষ্যস্থল রতনমণির তুইনানী ঘাঁটি।

তুইনানী ক্যাম্পে সেদিন জরুরী বৈঠক বসেছে। মন্ত্রীসভার কয়েকজন সভ্য এসেছেন ক্যাম্পে। তাংখ্যা রায়, হান্দাই সিং, কাঁঠাল রায়ও রয়েছে, হঠাৎ খবর আসে ভোরের অন্ধকার ফুটবার আগেই রাজার সৈন্যরা এসে টিলার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে।

চমকে ওঠে শিলারাম। সে ছিল ক্যাম্পের কর্মকর্তা।

হান্দাই সিং বলে—তুইছারবুহাতে খবর পাঠানো হয়েছে। শক্তি রায়ের দলবল নিয়ে আসার কথা। কিন্তু এসে পৌঁছল না কেন?

কাঁঠাল রায় জানে ইদানীং দলের মধ্যে বেশ সমালোচনা সুরু হয়েছে শক্তি রায়ের কাজ নিয়ে। তাই মনে হয় শক্তি রায় হয়তো ক্ষুব্ধ।

তবু বলেন তিনি—নিজেদেরই আক্রমণ ঠেকাতে হবে। আর বনের পথে দুজনকে পাঠিয়ে দাও তুইছারবুহাতে খবর দিতে।

শিলারাম সেই ব্যবস্থা করে নিজের লোকজন নিয়েই তৈরী হয় ক্যাম্পে আক্রমণ ঠেকা দিয়ে রাখবার জন্য।

—কতো লোক আছে? কাঁঠাল রায় শুধোন।

শিলারাম বলে—প্রায় চারশো লোক আছে। আর শতখানেক বন্দুক। ওদের নিয়েই লড়বো।

ক্যাম্পে দৌড়াদৌড়ি কলরব ওঠে।

এতদিন তারাই ছিল আক্রমণকারী, আজ তাদের উপর এসেছে

প্রথম আক্রমণ। তাই একটু ঘাবড়ে গেছে তারাও। আর রাজকীয় বাহিনীকে তারাও যেন ভয় করে।

কে বলে—ওদের কাছে কামানও আছে। কামান দিয়ে পাহাড়ই উড়িয়ে দিতে পারবে।

সাধারণ মানুষ ওরা। ঠিকমত যুদ্ধবিদ্যাও শেখেনি। তাই বিচলিত হয়ে ওঠে ওই সব শুনে। তবু কিছু লোককে শিলারাম সামনের জঙ্গলে তৈরী হতে বলে অন্যদিকের অবস্থাটাও দেখতে যায়।

চারিদিকে নিরব স্তব্ধতা নেমেছে।

শিলারাম রায় দেখছে ওই ধানক্ষেতের ওপাশে জামাতিয়া গ্রামের টিলাগুলোকে। চমকে ওঠে সে। দুচারজন খাঁকি পোষাকপরা সৈন্যকে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসতে দেখেছে সেও।

হঠাৎ পিছন দিক থেকে বন্দুকের শব্দ শুনে এরা চমকে ওঠে। তিনদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলছে সৈন্যদল। তুইনানী ক্যাম্পের উপর দিয়ে গুলি চলেছে।

চমকে ওঠে শিলারাম রায়। হাঁক দেয়—গুলি চালাও।

এদের বন্দুকও গর্জে ওঠে। কিন্তু চারিদিকের গুলির শব্দে এদের ক্যাপদার বন্দুকের শব্দ ডুবে যায়।

ওরা এগিয়ে আসছে। ক্যাম্প-এ বেশ কিছু পরিবারও আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের চীৎকার কান্নার শব্দ ওঠে।

তৈন্দুল ক্যাম্পের একপাশে একটা গর্জন গাছের আড়াল থেকে গুলি চালাচ্ছে, নয়ন্তীও মাটিতে শুয়ে পড়েছে, ওরা সবে এসে পৌঁছেছে তারপরই সুরু হয়েছে এই আক্রমণ। তৈন্দুল তবু রুখে দাঁড়িয়েছে। এদিকে সৈন্যরা এগোতে পারছে না, তার নির্ভুল নিশানাকে ওই সৈন্যদলও বুঝে নিয়ে সাবধান হয়েছে।

…শিলারাম অবাক হয় ওর সাহস দেখে।

তৈন্দুল বলে—ক্যাম্প থেকে মন্ত্রীদের বনের পথে চলে যেতে বলো শিলারাম। ওরা এগিয়ে আসছে।

হান্দাই রায়, কাঁঠাল রায়, তাইন্দা রার আরও অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এখান থেকে। তৈন্দুলের বন্দুকটা তেতে উঠেছে, তবু বিরামহীনভাবে সে স্থির লক্ষ্যে গুলি চালাচ্ছে। ওদের পালাবার পথ মুক্ত করতেই হবে তাকে।

নয়ন্তী বলে ওঠে---এখনও সময় আছে তৈন্দুল আমরাও চলে যাই এখান থেকে।

তৈন্দুল বলে ওঠে—ওদের ভয়ে পালাতে চাইনা নয়ন্তী, মন্ত্রীদের পথ করে দিতে হবে।

ওর চোখ মুখ বারুদের কালিতে কালো হয়ে গেছে, তবু সে গুলি করে চলেছে। কলরব-আর্তনাদ ওঠে ক্যাম্পে।

হঠাৎ একটা গুলি এসে বিঁধেছে তৈন্দুলের বুকে, ছিটকে পড়ে সে। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নয়ন্তী। তৈন্দুলের বুক থেকে বের হচ্ছে তাজা রক্ত। মাটি ভিজে যায়। নয়ন্তী ওর দেহটাকে জড়িয়ে ধরেছে—তৈন্দুল।

তৈন্দুল আজ ওর ডাকে সাড়া দিতে পারে না। তার পথ কোন উজ্জ্বল নীলাভ আলোর জগতে হারিয়ে গেছে, সেই পথে চলেছে সে। তৈন্দুলকে যেন কে ডাকছে, দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যায় সেই ব্যাকুল সুর।

নয়ন্তীর ডাকে আজ সাড়া মেলে না। দুচোখ বেয়ে জল নামে ওর। অসহায় ব্যর্থ কান্নায় লুটিয়ে পড়ে মেয়েটা।

তখন সৈন্যবাহিনী দলে দলে তুইনানী ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছে।

লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মার সৈন্য দল বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে তুইনানী ক্যাম্পে ঢুকে মন্ত্রীদের কাউকে পায় না। শিলারাম রায় তখনও শেষ বারের মত বাধা দেবার চেষ্টা করছে। তাকেই বন্দী করেছে তারা।

আর ক্যাম্পের বেশ কিছু ছেলে মেয়ে আর প্রায় তিনশো জন জোয়ানকে বন্দী করেছে। রাজ্যরক্ষী বাহিনীর পলাতক কিছু

হলেদের বন্দুক সমেতই ধরেছে এরা। তাছাড়া তরোয়াল-টাক্কাল-বর্শা-দা কাচি অনেক কিছুই হাতে আসে এদের।

ক্লান্ত রাজ সৈন্যবাহিনীর এই জয়ের সংবাদ হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

এবার এখানে ওদের ঘাঁটি গেড়ে তারা এগিয়ে যাবে তুইছারবুহার দিকে, রতনমণির প্রধান ঘাঁটি ওই তুইছারবুহা। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা সেখানেও হানা দেবে।

…লেফটেনেণ্ট হরেন্দ্র দেববর্মাও সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিলোনিয়ায় হাজির হয়েছেন।

…রতনমণির ক্যাম্পে সে খবর পৌঁছে গেছে। আর সেদিন জরুরী বৈঠকে স্থির হয়ে যায় এদের কর্মপন্থা। শক্তি রায় গর্জে ওঠে।

—ওই খগেন রায়ের জন্যেই বিলোনিয়ার দিক থেকে সৈন্যরা ঢুকছে বগাফার দিকে। তার মূল চ্যালা মার্থাতা চৌধুরী আর কান্তলাল চৌধুরী।

সর্পজয় বলে—ওদের নিকেশ করে দিতে হবে। আর বগাফার খগেনরায়ের বাড়ি আজ ছাই করে দোব আমরা।

….তাই রাতের অন্ধকারে ওরা এগিয়ে যায়।

ছোট্ট বসতি নিয়ে বগাফা। শক্তি রায়ের দলের লোকজন আজ মত্ত উল্লাসে প্রথমে গেছে বগাফায়। খগেন রায়ের বাড়িটা জ্বলে ওঠে।

হঠাৎ বনের দিক থেকে ভেসে আসে সংকেতের শব্দ। চমকে ওঠে ওরা। রাতের নির্জনতা ভেদ করে কানে আসে রাজকীয় সৈন্যদলের রাইফেলের তীক্ষ্ণ শব্দ।

সর্পজয় বলে—মিলিটারী এসে গেছে শক্তি রায়।

শক্তিরায় আজ যেন মুখোমুখি লড়তে চায়। তাই বলে—আমরাও গুলি চালাবো।

সর্পজয় সাবধানী লোক। সে বলে—কোন আড়াল নেই। ঘিরে

ফেলে শেষ করে দেবে আমাদের। এখন চলো এখান থেকে। মৌকা পেলে তখন দেখা যাবে।

দলবলও বেশী নেই। তাই বাধ্য হয়েই সরে এল ওরা অন্ধকার বনের মধ্যে। লেঃ হরেন্দ্র দেববর্মার সৈন্যদল যখন এসে পড়েছে তখন চারিদিকে আগুণ জ্বলছে বগাফায়। লোকজনের কলরব ওঠে।

কে বলে—সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

লেঃ দেববর্মা চুপকরে ভাবছেন ওই আগুণ যা ওরা জ্বেলেছে, মনে হয় সেই আগুণে ওদেরও ঘরবাড়ি সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তাই যেন লেঃ দেববর্মা হুকুম দেন—ওদের ফলো করো। ধরতেই হবে ওদের।

সৈন্যবাহিনীও অরণ্যপথ দিয়ে চলেছে ওদের পিছু পিছু।

খগেন রায়ের লোকও সঙ্গে ছিল। তারা জানে ওই সৈন্যদল পথের মাঝে মার্থাহা চৌধুরীর বসতিতেও যেতে পারে। তাই তারাও চলেছে বাইখোরার দিকে। বেলা গড়িয়ে পড়েছে।

লেঃ হরেন্দ্র দেববর্মার সৈন্যদলের সঙ্গে চলেছে বেশকিছু রিয়াং, চৌধুরীদের লোকজন। তারাও সশস্ত্র।

হঠাৎ বাইখোরার ওপাশে বনের মধ্যে ওরা কিসের শব্দ শুনে থামলো। দূর থেকে দেখা যায় ঘন বনের বাইরের টিলায় মার্থাহা চৌধুরীর বসতি থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর অনেক লোকজনও রয়েছে সেখানে। লেঃ দেববর্মা সৈন্যদলকে থামতে বলে কি ভাবছেন।

শক্তি রায়ের দলবল এখানেই এসে থানা গেড়েছে টিলার উপর। চারিদিকে ধান ক্ষেত—তারপরে বনঢাকা টিলাগুলো উঠে গেছে।

মার্থাহা চৌধুরী ওদের দেখে চমকে ওঠে। সর্পজয় এর মধ্যে কান্তলা চৌধুরীর গোয়াল থেকে মেষ এনে বলে—নে, কাট এটাকে। মাংস বানা। আর চাল নিয়ে আয় টংঘর থেকে।

কান্তলা চৌধুরীর কি প্রতিবাদ করতে যায়। ধমকে ওঠে সর্পজয়।

—কোন কথা বলবে না। তাহলে তোমাকেই কেটে ফেলা হবে রান্নার আয়োজন চলেছে। শক্তি রায় এর মধ্যে মার্থাহা চৌধুরীবে ডাকিয়ে এনে হুকুম করে।

—রতনমণির হুকুম না মেনে তুমি খগেন রায়ের কথায় চলছো তোমাকে গুরুদেবের কাছে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। আ জরিমানা করা হোল একশো টাকা। ওটা এক্ষুনিই দিতে হবে।

মার্থাহা চৌধুরী জানে ওদের স্বরূপ। তাই বাধ্য হয়েই টাকাট এনে দিয়ে অনুনয় বিনয় করে—ওসব বাজে খবর। আমি গুরুদেবেরই ভক্ত।

শক্তি রায় জবাব দেয় না।

খাবার তৈরী হয়ে আসছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ওরা বের হবে ক্যাম্পের দিকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে মোষের শিঙ্গা বেজে ওঠে পরপর তিনবার। এই সংকেতের গুরুত্ব জানে শক্তিরায়। সর্পজয়ও চমকে উঠেছে।

হঠাৎ দেখা যায় ওদিকের বন থেকে রাজার সৈন্যদল বের হয়ে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে ছুটে আসছে।

গর্জে ওঠে শক্তিরায়—গুলি চালাও।

একঝাঁক গুলির শব্দে থমকে দাঁড়ায় সৈন্যবাহিনী। শক্তি রায়ের সৈন্যরা ততক্ষণে তৈরী হয়েছে। আজ শক্তিরায় যেন ক্ষেপে উঠেছে। ওর চীৎকারে রায়জীর সৈন্যদল বন্দুক-খড়গ-দা-বল্লম নিয়েই টিলা থেকে নেমে দৌড়ে আসছে রাজকীয় সৈন্যদের দিকে। আজ শক্তি রায় ওদের শেষ করে দেবে। মত্ত হুঙ্কারে শক্তিরায় গর্জে চলেছে—জয়গুরু। গুলি চালাও।

রাজার সৈন্যদলও তৈরী হয়েছে। ওদের সামনে ধাবমান জনতা, ওদের অধিকাংশ লোকের হাতে দা-খড়গ-টাঙ্গাল-বর্শা সামান্য কিছু বন্দুকও আছে। ওদের ফাঁকা মাঠে এমনি অবস্থায় পাবে ভাবেনি তারা।

নিতাই বেশ কিছু দিন রক্ষীদলে কাজ করেছে। ও জানে ওই রাজার সৈন্যদের হাতের রাইফেলের জোর। তাই সামনাসামনি ওই আক্রমণে সে না গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে ক্ষেতের ফসল পাহারা দেবার টংঘরেই উঠে পড়েছে বন্দুক হাতে।

সে সুযোগ বুঝে গুলি চালাতে থাকে।

কিন্তু ওই শক্তিরায়ের বাহিনী তখন নেমে চলেছে আক্রমণ করতে।

লেঃ হরেন্দ্র দেববর্মাও এমনি ধারা আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে ছিলেন। তাই তার সৈন্য বাহিনীর অর্দ্ধেককে রেখে এসেছিলেন পিছনের দিক থেকে আক্রমণের জন্যে।

স্বদেশীদল টিলা থেকে নেমে আসছে, লেঃ দেববর্মা অর্ডার দেন —চার্জ উইথ বেয়োনেট।

সঙ্গীনগুলো রোদে ঝক ঝক করে, এরা এগিয়ে যায়, কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয় স্বদেশী দলের গুলি বর্ষণের সামনে। এরাও গুলি চালাতে থাকে। এদের গুলির যোগান অনেক, তাই অনবরত গুলি বর্ষণ করে চলেছে রাজকীয় সৈন্যদল, স্বদেশীদলও থমকে দাঁড়িয়েছে। ওই গুলিবৃষ্টির মাঝে শক্তিরায় ডাক দেয়—আগে বাড়ো। গুলি চালাও।

হঠাৎ পিছন দিককার টিলার উপর থেকে সৈন্যবাহিনীর অন্যদল এসে পড়ে এবার নোতুন করে গুলি বৃষ্টি সুরু করেছে।

দুদিক থেকে ঘিরে ফেলছে শক্তি রায়ের দলকে। বন্দুকের গুলিতে ছিটকে পড়ল একজন, অন্যজন একটু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরছে।

...শক্তি রায়ও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব। তাই সেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এত সহজে এমনিভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়বে তারা একথা সে ভাবেনি।

পালাচ্ছে তার দলের লোকজন, ওদের পালানো ছাড়া পথ নেই। ওই নীচেকার সৈন্যদল এগিয়ে আসছে ঝড়ের বেগে। শুক্‌নো পাতার মত শক্তি রায়ের দল কোন শূন্যে মিশিয়ে যায়।

পড়ে থাকে আহত কয়েকজন, ওদের আর্তনাদ ওঠে। কার রক্তাক্ত দেহটা স্তব্ধ হয়ে আসে ধানক্ষেতের ধারে। এই প্রথম মুক্তি যুদ্ধে প্রাণ দিল কোন অপরিচিত একটি যুবক।

তখন শক্তি রায়ের পরাজিত বিপর্য্যস্ত ছত্রভঙ্গ বাহিনী চলেছে বনের পথ দিয়ে তুইছারবুহা ক্যাম্পের দিকে।

অবশ্য লেঃ দেববর্মার বিজয়ী বাহিনীও এই অরণ্যপর্বতে থাকেনি, ওরা সেই রাতেই বিলোনিয়ায় ফিরে আসে আহত বন্দীদের নিয়ে।

ওদের বিজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। স্বদেশীদলকে ওরা বিপর্যস্ত করে দিয়েছে প্রথম আক্রমণেই।

তুইছারবুহা ক্যাম্পে খবর পৌঁছে গেছে, তুইনানী ক্যাম্প থেকে পলাতক লোকজন এসে পড়েছে। লক্ষ্মীছড়া ক্যাম্পেও হানা দিয়েছে রাজকীয় বাহিনী, আর এমন সময় এসে পড়ে শক্তিরায়। ওর সব তেজ যেন মিইয়ে গেছে ওই প্রচণ্ড পরাজয়ে। জঙ্গী সভার জরুরী বৈঠক বসেছে।

সারা ক্যাম্পে নেমেছে স্তব্ধতা। আজ ওদের সামনে এসেছে কঠিন অগ্নি পরীক্ষার মূহূর্ত।

শক্তিরায় বলে চলেছে বাইঘোরার সেই বেদনাময় স্মৃতির কাহিনী।

সর্পজয় বলে—আবার এর জবাব দেব আমরা।

তৈন্দুল নেই। ওদের সৈন্যদলের গুলি-বারুদও ফুরিয়ে আসছে। এবার তাদের ওপর সর্বশক্তি নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই রাজার সৈন্যবাহিনী।

…হঠাৎ অন্ধকার টিলাগুলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আগুনের শিখায়। বসতিতে আগুণ দিয়ে চলেছে সৈন্যবাহিনী। পেট্রল ঢেলে ওরা নিমেষের মধ্যে জ্বালিয়ে দিচ্ছে গ্রাম বসত। অন্ধকার রাতে ভেসে আসে অসহায় মানুষের আর্তনাদ।

তাইন্দা বলে—ওরা গ্রামের পর গ্রামে আগুণ দিচ্ছে। টিনবন্দী পেট্রল ঢেলে আগুণ জ্বালাচ্ছে এই বৃষ্টির মধ্যে।

কে বলে—রিয়াংরা আমাদের দলে, তাই ওদের সব পুড়িয়ে দিচ্ছে ওরা।

শক্তিরায় বলে—আমরাও ওদের পুড়িয়ে মারবো। আবার যুদ্ধ করবো আমরা।

রতনমণি স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তিনি শুনেছেন সব খবর। কিন্তু দেখেছেন তার আন্দোলনের মূল অর্থকে এরা বিকৃতই করেনি বরং ভুল পথই ধরেছে। তিনি এই সংঘাত কোনদিনই চাননি। তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন অত্যাচারী সমাজ শাসকদের বিরুদ্ধে, তাদের সমাজ জীবনে সুখ-শান্তি আনতে। কিন্তু এদের নীতিহীন বাড়াবাড়ি রাজশক্তিকেও আঘাত করেছে বোকার মত নিজেদের তৈরী না করেই।

আজ ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরীহ অসহায় মানুষগুলোর উপর। তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেবে, তাদের গৃহহারা, সর্বহারা করে দেবে। এর বিহিত করার সাধ্য রতনমণির নেই।

তাই তিনি কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন, এই সংঘাত এড়িয়ে যাবেন। আপাততঃ, যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার জন্যই এখন সরে থাকতে হবে।

তিনি বলেন—আর এখন আমরা ওদের মুখোমুখি লড়াই করবো না শক্তিরায়। সামনাসামনি লড়াই-এ অনর্থক রক্তই ঝরবে, আমরা শেষ হয়ে যাবো।

. শক্তিরায় বলে—তাই বলে হেরে পিছিয়ে যাবো?

রতনমণি বলেন—পশ্চাৎ অপসারণও যুদ্ধেরই কৌশল। আমাদের এখন সরে যেতে হবে শক্তি রায়। এখনও তৈরী হতে হবে, তাই এই আত্মগোপনের দরকার আছে। তোমরা কি বলো?...

মন্ত্রীসভার সভ্যদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে। ওরাও

ভেবে দেখছে এখন পিছু হটাই সঙ্গত—তাইন্দা রায় বলে—আমিও এই মতকে সমর্থন করি।

শক্তি রায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

রতনমণি আজ নিজের ঘরে ফিরে চলেছেন। মেঘ ঢাকা আকাশ কোলে ঘন মেঘের আনাগোনা, দমকা বাতাসে হাহাকার ওঠে। আজ রতনমণির মনে হয় এতবড় আন্দোলন যে কোন কারণেই হোক ব্যর্থ হয়ে গেল। তুইছারবুহা ক্যাম্পে আজ তাঁর জীবনের শেষ রাত্রি।

সব স্বপ্ন হারিয়ে গেছে ঘন তমসার অতলে। আজ তাকে খুঁজে ফিরছে ওই সৈন্যদল, এক জীবন থেকে অন্য এক অনিশ্চিত জীবনে ছন্নছাড়া ধূমকেতুর মত ঘুরতে হবে তাঁকে।

…মনে হয় এও যেন জীবন দেবতারই নির্দেশ।

কিন্তু তাঁর ব্রত অপূর্ণই রয়ে গেল। আজ ওই বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণের জন্যই তাঁকেও হারিয়ে যেতে হচ্ছে অন্ধকারে। ইতিহাস হয়তো কোনদিন লেখা হবে। সেই ইতিহাস রতনমণিকে কি চোখে দেখবে তা জানেন না।

তবু মনে হয় তার সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল—হয়তো কোথাও ভুল করেছিলেন তিনিও। এত ত্যাগ এত রক্তক্ষয় দিয়েও স্বাধীনতার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে পারেননি তিনি।

…সারা মনে কি অসহায় জ্বালা। রতনমণি স্তব্ধ চাহনি মেলে তাঁর নিজের ব্যর্থ স্বপ্নের মতই রাতের অন্ধকারে হারানো তুইছারবুহা ক্যাম্পের দিকে চেয়ে থাকেন।

লেঃ নগেন্দ্র দেববর্মা বিজয়ীর মত এগিয়ে আসছেন তুইনানী থেকে তুইছারবুহার দিকে। জানেন এইটাই ওদের শক্ত ঘাঁটি। এখানেই তারা গড়েছে কঠিন প্রতিরোধ। তাই সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত।

বৈকালের ম্লান আলো পড়েছে ক্যাম্পের টিলার উপর, দুদিকে বড় বড় ঘর, টং ঘর। পাহারাদারের মাচাং। সৈন্যদের গুলির শব্দ স্তব্ধ অপরাহ্ণে টিলায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই।

রাজসৈন্যদের বন্দুক গর্জে ওঠে। তবু ওই টিলাগুলো থেকে ওরা গুলি চালায় না। রহস্যময় স্তব্ধতা ঘিরে রয়েছে ওই টিলাকে।

হঠাৎ কে বলে ওঠে—ওসব ফাঁকা হয়ে গেছে স্যার। কেউ নেই ওখানে।

চমকে ওঠেন লেঃ দেববর্মা।

…ততক্ষণে সৈন্যদল জয়ধ্বনি করে ঢুকে পড়েছে ক্যাম্পে। বিরাট ঘরগুলো সব ফাঁকা, জনমানব অবধি নেই। চাল খাবার দাবার ও সব নিয়ে গেছে ওরা।

…তবু পরিত্যক্ত ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মত। সৈন্যদের জয়ের আনন্দটা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই রুদ্ধ আক্রোশে কে বলে—জ্বালিয়ে দে ব্যাটাদের আস্তানা।

টিনবন্দী পেট্রল সঙ্গে রয়েছে তাদের। উদয়পুরের সরকারী গুদাম থেকে এনেছে ওরা টিন টিন পেট্রল, ওই অগ্নিবন্যা বইয়ে দেবার জন্যই। দেখতে দেখতে বিরাট বড় বড় ঘরগুলোয় আগুন জ্বলে ওঠে। বাঁশের গিরে ফাটছে, আর সাজানো ঘর টিলার ক্যাম্প টং ঘর, সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ওরা একটি আন্দোলনের শেষ চিহ্নকেও মাটির বুক থেকে মুছে দিল, পড়ে রইল মাত্র ছাই আর পোড়া বাঁশের স্তূপ।

•

লেঃ দেববর্মা তবু থামেননি। এবার খোঁজার পালা। পলাতক ওই আসামীদের সন্ধানে চলেছে সৈন্যদল। নোতুনবাজার পার হয়ে ওরা ঝাড়িমুড়া পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে ডম্বুরতীর্থের দিকে চলেছে ওদের সন্ধানে।

খুশীকৃষ্ণকেও খোঁজ করছে তারা।

কিন্তু তারও পাত্তা নেই। খুশীকৃষ্ণ গুরুর নির্দেশে লুসাই রওনা হয়ে গেছে। তাকে না পেয়ে ওরা তার বাড়িতেই আগুন দেয়। কিন্তু সকলেই যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। সারা অঞ্চলের রিয়াং বসতিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে ওরা। অনেককে অত্যাচার করেও কোন খবরই পাওয়া যায় না।

ওরা সকলেই কেথায় হারিয়ে গেছে বনপাহাড়ের জগতে।

...ত্রিপুরারাজ্যের সীমান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন। রতনমণি চলেছেন ওই বনপর্বত এলাকায় আশ্রয়ের সন্ধানে। দুর্গমপথ, বয়সও হয়েছে তখন প্রায় ষাট বছর। দেহমনের সেই শক্তি উৎসাহ কিছুই নেই। তাঁর এত দিনের সাধনা-স্বপ্ন-পরিকল্পনা সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ঘন বন, বাঁশ-শাল-গর্জন নাগেশ্বরের অরণ্যভূমি। দিনের আলো সেখানে ঢোকে না। ভিজে ভিজে বেতবন। রতনমণি একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলেছেন। সঙ্গে চলেছে মুকুন্দ, কান্ত রায়-দাবা রায়-সর্পজয়-তবিয়া আরও ক'জন বিশ্বস্ত অনুচর।

দাবা রায় বলে—একটু বিশ্রাম নেবেন না ঠাকুর?

—বিশ্রাম!

হাসলেন রতনমণি। আজ তাকে শিকারী কুকুরের মত খুঁজছে ওরা। তাই বলেন তিনি—এরাজ্য পার হয়ে যেতে হবে দাবা রায়, আর একদিনের পথ রাঙ্গামাটি এলাকা। বিশ্রামের সময় এখন আর নেই।

রাঙ্গামাটির বনাঞ্চলে ছোট বসতি রামসিরা। ওদিকে টিলার নীচে চাকমা বাজার অঞ্চল। ওই দিকের দুটো বিভিন্ন ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন রতনমণি সদলবলে।

মুকুন্দ, চৈত্র সেন, কান্ত রায়, তবিয়া রয়েছে এদিকের বাড়িতে।

রতনমণি কয়েকজন অনুচর নিয়ে রয়েছেন দূরের একটা নোতুন ঘরে। চারিদিকে ঘন বন। ঘরটা সহজে চোখে পড়ে না। অনেকদিন পর আজ তিনি ফিরেছেন নিজের গ্রামের মাটিতে! মনেহয় একটা অধ্যায়ের শেষ হয়ে গেল। অতীতের সব পরিশ্রম-চেষ্টা- ব্যর্থতার গ্লানিতেই বিকৃত হয়ে গেছে। আজ যেন তাঁর করার কিছুই নেই।

মনে হয় এও সেই জীবনদেবতারই নির্দেশ। নিজেকে নোতুন করে আবার তৈরী করার সাধনায় মত্ত হবেন তিনি। একবারের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, এবারের আন্দোলন, সাধনা ব্যর্থ হবে না।

নিভৃতে চলবে তারই প্রস্তুতি।

আবার ছত্রভঙ্গ দলকে নোতুন করে গড়ে তুলবেন, যোগাযোগ করার চেষ্টাই করবেন আবার।

মুকুন্দ বলে—নিশ্চয়ই পারবো ঠাকুর।

কান্ত রায় ও স্বপ্ন দেখে, ওদের ঘরের ঠিকানা নেই। একমাত্র মেয়ে নয়ন্তীও সেই তুইনানী ক্যাম্পে প্রাণ দিয়েছে লড়তে গিয়ে। ওরাই দেখিয়ে দিয়েছে প্রাণ দিয়েও স্বাধীনতার সংগ্রামকে তারা বরণ করে নিয়েছে।

কান্ত রায় থামবে না। তাই বলে।

—আরও ব্যাপক ভাবেই এবার আন্দোলন গড়ে তুলবো ঠাকুর। চাকমা-মগ--কুকি-রিয়াং-ত্রিপুরী সকলকে নিয়ে এবার কাজ শুরু হবে আমাদের।

ওরা নোতুন উৎসাহ নিয়ে কাজ সুরু করেছে।

...সারা ত্রিপুরা তছনছ করে রাজদরবার নেতাদের সন্ধান করছে। কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেছে আগরতলা শহরে। আর বনপর্বতের বসতিতে চলেছে বহ্ন্যুৎসব আর বেপরোয়া অত্যাচার। সৈন্যবাহিনী আজ রতনমণির সব প্রতিরোধ চূর্ণ করে দিয়েছে। আর গৃহহারা আশ্রয়হারা গরীব আদিবাসীরা বনে পর্বতে ঘুরছে সব হারিয়ে।

তবু ওদের অনুসন্ধান থামেনি। ওরা যেন শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলেছে। আর ওদের সামিল হয়েছে ইংরেজ শাসকরা, একই স্বার্থ ওদের। স্বাধীনতার সব আন্দোলনকে ওরা পিষে মেরে ফেলতে চায়।

আজ তাই রতনমণিকে তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। যেখানে থাকুক তাকে দরকার। যাতে আর কোনও আন্দোলন কোথাও দানা বাঁধতে না পারে।

রাত্রি নেমেছে রামসিরা চাকমা বাজার বসতিতে। রাতের স্তব্ধতা ছাপিয়ে হাওয়া কাঁপে। বাঁশবনে ওঠে হাহাকার, ক'টি মানুষ আজও স্বপ্ন দেখে, নোতুন একটি জীবনের স্বপ্ন।

হঠাৎ কিসের শব্দে মুকুন্দের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ওপাশে শুয়ে আছে টং এর ঘরে দাবা রায়, চৈত্র সেন, কান্ত রায়, তবিয়া। ওরাও জেগে উঠেছে।

বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে চাঁদের আলোয় ওরা বাইরের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে।

—পুলিশ!

চৈত্র সেন লাফ দিয়ে পড়ে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চায়, দাবা রায়ও টাক্কাল হাতে চলেছে পিছু পিছু। হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ ওঠে। রাতের স্তব্ধতা খানখান হয়ে যায়। ছিটকে পড়ে চৈত্র সেন। থ্রি নট থ্রি রাইফেলের গুলিটা ওর বুকেই বিঁধেছে, দাবা রায়ের হাতটা অবশ হয়ে যায়।

...গুলিটা ওর হাত ফুঁড়ে বের হয়ে গেছে।

পুলিশবাহিনী এবার সদলবলে টং ঘরটায় ঢুকে পড়ে। মুকুন্দ রায়কে কে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আঘাত করেছে। ছিটকে পড়ে সে। ওরা সেই অবসরে তাদের বেঁধে ফেলে এদিক ওদিকে দেখছে। কে গর্জে ওঠে—রতনমণি কাঁহা? জবাব দেও এ্যাই উল্লুককা বাচ্চে?

মুকুন্দ দেখছে ওদের

কে একটা থাপ্পড় কসে গর্জে ওঠে—জবাব দেও! বহরা হ্যায় তুম?

মুকুন্দ বলে—জানি না।

ওরা সারা এলাকা রাতের অন্ধকারেই ঘিরে ফেলেছে। খুঁজছে হন্যে হয়ে।

রতনমণিও খবর পেয়েই বের হয়ে পড়েন।

এখানেও আর নিরাপত্তা নেই। তাই ত্রিপুরা—চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে বর্মার দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে।

…পথ নেই। বেতবন—লতার বেষ্টনী কেটে চলেছেন তারা। রাতের তারার দেখা মেলে না। এ রাতের যেন শেষ নেই।

…দূরে দেখা যায় পাহাড় সীমা, বর্মার সীমারেখা। ওরা চলেছেন সেই দিকে। ওখানের অরণ্যভূমিতে আছে মুক্তির আশ্বাস। ইংরেজকে সরে আসতে হবে ওখান থেকে। সেই স্বাধীন দেশের মাটিতেই তবু আশ্রয় পাবেন এক রাজদ্রোহী।

—হল্ট!

অন্ধকার কাঁপিয়ে কাদের গর্জন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এক ঝলক জোরালো টর্চের আলো পড়েছে রতনমণির মুখে। কয়েকটা আলো জ্বলে ওঠে।

—ডোণ্ট মুভ! হ্যাণ্ডস্ আপ্। হাত উঠাও।

ওদের রাইফেল এর নলগুলো তার দিকেই ফেরানো। ওরা ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলেছে রতনমণির দলকে। …আলো ফেলে দেখছে ওরা রতনমণিকে। মাথায় দীর্ঘ জটা, পরনে গেরুয়া বাস।

কে একজন বলে ওঠে—দেন ইউ আর রতনমণি! ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট।

বজ্র নির্ঘোষে ওদের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

এত দিন পর ইংরেজ সরকার হাতে পেয়েছে একজন রাজদ্রোহী বিপ্লবীকে যে সারা রাজ্যের অরণ্য পর্বতে প্রজ্জ্বলিত করেছিল দাবানলের বহ্নিশিখা।

রাজধানী আগরতলায় এসেছে নোতুন কর্ম ব্যস্ততা। বিপ্লবীদের এবার ধীরে ধীরে এখানে আনাচ্ছে বন পর্বত থেকে। বিতাড়িত গৃহহারা রিয়াংদের অনেকেই বাধ্য হয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করে চলেছে।

আর তাদের ধীরে ধীরে এনে হাজির করছে এখানে।

বিদ্রোহীদের বিচারের ভার পড়েছে লেঃ ঠাকুর জিতেন্দ্র মোহন দেববর্মা আর মেজর কুমার ব্রজলাল দেববর্মার উপর।

আসল আসামীদের তখনও হদিস মেলেনি। তাই এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হতাশই হন তাঁরা। তেমন কিছু খবর ওই অসহায় মানুষগুলোর জানা নাই।

...জিতেন ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বলেন—এগুলোকে নিয়ে কি হবে? পালের গোদাগুলোই বেপাত্তা। কয়েকটাকে ধরে রেখে এদের ছেড়ে দাও। আর যেন এসব পথে ওরা না যায়।

অবশ্য তার জন্য ধর্মভীরু অসহায় লোকদের ধরে ধরে মাথা ন্যাড়া করে রাজার গুরুবংশের প্রধানদের মন্দিরে এনে হাজির করা হল। তাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে অহিংসার মন্ত্র পড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

...হঠাৎ এমনি দিনে খবর আসে রতনমণি ধরা পড়েছে। সঙ্গে ছিল কান্ত রায়, দাবা রায়, চৈত্র সেন মুকুন্দ—তাবিয়া আরও কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে চৈত্র সেন সেই রাতেই মারা যায়, আর দাবা রায় চট্টগ্রামের হাসপাতালে মারা গেছে।

তবু ওই মূল আসামী রতনমণিকে বিচারের জন্য আনতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। এখানেই তার বিচার করা হবে। এ রাজ্যের কর্তৃপক্ষ তাই ইংরেজ সরকারকেই জানান তাঁদের অনুরোধটা।

আগরতলায় তখন বন্দীকরে আনা হয়েছে প্রায় দু' তিন হাজার আদিবাসীকে। তাদের মধ্যে সামান্য কিছু নেতৃস্থানীয় লোকদের রেখে বাকী সকলকেই ছেড়ে দিয়ে ওরা রতনমণির বিচারের আয়োজন করে চলেছেন। তখন অন্য আসামীদের মধ্যে ধরা পড়ে গেছে প্রায় সব নেতাই।

তাইন্দা রিয়াং, শ্রীকান্ত রিয়াং, তবিরাম, শিলা রায়, সেনাপতি শক্তি রায় রিয়াং, মাংছল রিয়াং, হান্দাই সিং, বাম রায়, বাহাদুর রায়, সকলকেই ওরা ধরে ফেলেছে। রতনমণি প্রায় ছমাস কাল পলাতক থাকার পর এবার ধরা পড়েছেন ইংরেজের হাতে।

…শীতের কনকনে হাওয়া বইছে। পাহাড় বনে এসেছে ঝরাপাতার দিন। এমনি শীতের রাতে রতনমণি চট্টগ্রামের কারাগারে রয়েছেন। আজ তিনি বন্দী। সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ দাবা রায় নেই, হাসপাতালে মারা গেছে চট্টগ্রামে, চৈত্র সেন প্রাণ দিয়েছে পুলিশের গুলিতে। সেই স্নিগ্ধ মেয়েটা নয়ন্তী মরেছে তাদের গুলিতে, তৈন্দুলের ঘর বাঁধার স্বপ্ন মিশিয়ে গেছে রক্তাক্ত মাটির বুকে। রতনমণি যে আশা নিয়ে আন্দোলন সুরু করেছিলেন আজ সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তিনিও ভাবতে পারেননি এভাবে তিনি হারিয়ে যাবেন।

আজ মনে হয় সন্ন্যাস জীবনে তিনি সাধনা করেছিলেন নিজের একক মুক্তির, আর এই আন্দোলনের মধ্যে চেয়েছিলেন বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ, কিন্তু স্বার্থপর একটা শ্রেণীর চক্রান্তে সেই সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেলেও এর অস্তিত্ব কোনদিনই মিথ্যা হয়ে যাবে না। একদিন এই আরব্ধ কাজ অন্য কেউ তুলে নেবে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আসবে সেই স্বাধীনতার সাড়া।

কারা প্রাচীরের আড়ালে তবু ভেসে আসে ইংরেজ শাসিত ভারতের জনসমুদ্রের কলকল্লোল। গান্ধীজি-ডাক দিয়েছেন।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

সারা ভারতবর্ষ তাই জেগে উঠেছে। কারা প্রাচীরের মাঝে বন্দীদের জয়ধ্বনি ওঠে—বন্দেমাতরম্। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

বিস্মিত বন্দী রতনমণি যেন আজ তাঁর ওই মৃত্যুপণ আন্দোলনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই নবজাগরণের মন্ত্রের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন ওই আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী বিস্তৃত ভারত জোড়া স্বাধীনতার আন্দোলনে।

ওর সারা মনে জাগে একটি তৃপ্তির আশ্বাস। তিনি ব্যর্থ হন নি। এই আন্দোলন ত্রিপুরার অরণ্য গহণে একটি স্ফুলিঙ্গের মত ফুরিয়ে যাবে না। উত্তরকালে এই একটি সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মত দিক দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হবে, রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। সে দিনের আর দেরী নেই।

হঠাৎ ভারি বুটের শব্দে চাইলেন রতনমণি।

সেন্ট্রি এসে দরজা খুলছে। শিকলের ঝন ঝন শব্দ ওঠে। ভারি গলার হুকুম শোনা যায়—তৈরী হয়ে নাও। এই রাতেই বের হতে হবে।

রতনমণি চাইলেন সেন্ট্রির দিকে। শুধান।

—কোথায় যেতে হবে?

কোন জবাব মেলে না। হয়তো গন্তব্যস্থল ওদেরও অজানা। না হয় জবাব দেবার হুকুম নেই। ভারি দরজাটা বন্ধ করে সে চলে গেল তার হুকুম শুনিয়ে।

…হয়তো রাতের অন্ধকারে তাকে শেষ করে দেবে। রতনমণি আজ শুনেছেন আঁধার ছাপানো ওই জন সমুদ্রের গর্জন। তিনি আজ মনে মনে তৈরী হয়েছেন। আজীবন ধর্ম পথে রয়েছেন, সংসারে মোহ নেই। বিষয়ে আসক্তি নেই। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হয় নি।

তাই জীবন দেবতার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। এই সবুজ স্নিগ্ধ ধরিত্রী তাকে দিয়েছে অনেক প্রীতি, ভালোবাসা। সব কিছু আজ তিনি

মনের সব আঁধার আলোকিত করে তুলেছে।

গীতার শ্লোকটা আবৃত্তি করেন।

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্ত মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্॥"

আজ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁর সর্ব কর্ম তাঁর জীবন দেবতার পায়ে অর্পণ করে—সেই উজ্জ্বল অস্তিত্বের ধ্যানমগ্ন হতে পারেন। তাই সমর্পিত চিত্ত মানুষটি আজ মৃত্যু সংসার সমুদ্র থেকে মুক্তির আশ্বাস পান।

...শীতের সকাল বেলায় তাঁরা উঠেছেন ট্রেনে।

....মুকুন্দ, কান্ত রায়—তবিয়া চলেছে তাঁর সঙ্গে। চারিদিকে কড়া পুলিশ পাহারা। ট্রেনটা চলেছে মন্থর গতিতে। পথের ধারে গঞ্জে থানায় ইংরেজ সরকারের বাড়িগুলোয় কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে সাবধানতা।

...বিয়াল্লিশের বিপ্লবের স্বাক্ষর ছড়ানো পথ,...ওরা চলেছে। রতনমণির মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন।

—তাহলে ঘরে ফিরলে মুকুন্দ? ওরা বোধহয় আগরতলাতেই নিয়ে যাবে আমাদের।

ঘরে ফেরার তৃপ্তি সব দুঃখ গ্লানি ছাপিয়ে ওদের মনে জেগে ওঠে। ...কান্ত রায় বলে—জেলে থাকতে হবে সেখানে?

হাসেন রতনমণি—মন থেকে সব ভয় মুছে ফেল কান্ত রায়। বিপ্লবীদের মনে ভয় বলে কিছু থাকতে নেই। মৃত্যু তাদের নিত্যসঙ্গী।

ট্রেনটা ঢুকছে আখাউড়া ষ্টেশনে। তখন শীতের সন্ধ্যা নেমেছে কুয়াসার চাদর জড়ানো চারিদিক।

•ওদের এবার আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হল। ওদের বিচার করবে ত্রিপুরা রাজ্য। সদাশয় ইংরেজ ন্যায় নীতির সব ধারাগুলোই মেনে চলে। তাই ওদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল এদের হাতে।

...এতদিনপর ত্রিপুরার কর্তৃপক্ষ হাতে পেয়েছে রতনমণিকে। ...মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরও রাজধানীতে নেই। সুতরাং কর্তৃপক্ষই এখন সর্বেসর্বা।

আখাউড়া ষ্টেশন থেকে আগরতলা শহর মাইল চারেক পথ। রাতের অন্ধকারে ওরা রতনমণিদের নিয়ে চলেছে। মুকুন্দ—তবিয়া কান্ত রায়কে তুলেছে অন্য গাড়িতে আর রতনমণিকে নেওয়া হয়েছে আলাদা একটা গাড়িতে।

রাতের অন্ধকারে নির্জন শীতের কুয়াশা ঢাকা পথ দিয়ে বেগে ছুটে চলেছে জীপটা। হঠাৎ মুকুন্দ চমকে ওঠে। হয়তো চোখের ভুল। সত্য নাও হতে পারে। সে তবু আর্তস্বরে চীৎকার করে ওঠে।...কিন্তু তেমন কিছুই দেখা গেল না, কুয়াশাভরা পথ দিয়ে তাদের গাড়িটা বেগে বের হয়ে গেল।

মুকুন্দের চোখের সামনে একটা নির্মম ছবি চকিতের জন্য ভেসে ওঠে। ...ও যেন দেখছিল একটা জিপের পেছনে বেঁধে কাকে ওই পথ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে কারা নিয়ে চলেছে রাতের অন্ধকারে।

....মুকুন্দ, কান্তরায়—তবিয়া ওদের সকলকে আটকে রেখেছে জেলগেটে। কাল রক্ষীবাহিনীর অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হবে তাদের।

তার আগেই অবশ্য কয়েকজন ওদের জেরা করে

—আর কে কে ছিল দলে? বাইরে থেকে কি সাহায্য পেয়েছিলে। মুকুন্দ জবাব দেয় আমার জানা নেই।

অতর্কিত আঘাতে ছিটকে পড়ে মুকুন্দ। ওকে কে একজন প্রচণ্ড লাথি কষেছে।

প্রচণ্ড আঘাতে মুকুন্দের সারা শরীর কেঁপে ওঠে। তবু মনে পড়ে রতনমণির কথা, বিপ্লবীদের মনে ভয় থাকতে নেই।

মুখ বুজে সব অত্যাচারই সহ্য করে যায় তারা।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ কারারক্ষীর দপ্তরে কেমন কর্মব্যস্ততা আর একটা চাপা খবরের ফিস্ ফিসানি শোনা যায়। চমকে ওঠে মুকুন্দ খবরটা শুনে।

—রতনমণি আর নেই। কাল রাত্রেই তিনি মারা গেছেন। তবিয়াও গুরুতর আহত।

ওর নীরব যন্ত্রণাকাতর মুখে ফুটে ওঠে বেদনার ছায়া। দু'চোখ বেয়ে জল নামে।

একটি আন্দোলনকে ওরা এমনি করে ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু সত্যকে কোনদিনই বিনাশ করা যায় না। রতনমণি নেই কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হয়নি। উত্তরকালের মানুষ তাঁরই সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে পেয়েছে মহান একটি উত্তরাধিকার, স্বাধীনতার অধিকার। কোন মরণোত্তর তাম্রপত্রের স্বীকৃতি নাই বা থাকলো।

তবু ত্রিপুরার নির্জন অরণ্য মর্মরে আজও ভেসে ওঠে কোন আদিবাসীর গান

জগনি গুরু সে—অব
মানিয়া মুন্নছে
রতনগুরু সে অব

ডম্বুরুর তীর্থমুখে আজও ওরা স্মরণ করে সেই পুণ্যনাম। রতনমণি আজও সেখানে বেঁচে আছেন—বহু মনের উজ্জ্বল স্মৃতিতে জীবন দেবতার পদ প্রান্তে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর নমস্কারের বিনম্রতায়।

———